হাসির ফোয়ারা
শিবরাম চক্রবর্তী

হাসির ফোয়ারা
শিবরাম চক্রবর্তী
দেব সাহিত্য কুটীর
কলিকাতা

সূচীপত্র

চিত্রসূচী

● তিন রঙ ছবি ●

বিষয়

১। **হর্ষবর্ধনের অঙ্কলাভ—**
গিন্নি তোমার চোখে জল কেন গো?

২। **বিনির এক কাণ্ড—**
বিনির কলেজের বান্ধবীদের নিয়েই বেধেছে ফ্যাসাদ।

৩। **রাম ডাক্তারের ব্যায়রাম—**
করাতের অভাব ছিল না। এনে দিলেন একখানা।

৪। **হর্ষবর্ধনের ওপর টেক্কা—**
'ওহে—দামটা দিয়ে গেলে না?' বাধা দেন হর্ষবর্ধন।

● দুই রঙ ছবি ●

১। **জীবনকেষ্টর জীবননাট্য—**
জয় মা কালী! মাকালদের বলি দিচ্ছি মা কিছু মনে করিসনে।

২। **বাজিকরের ডিগবাজি—**
বলতে না বলতে মলয় বাগানময় দৌড়তে লাগলো চার পা তুলে।

৩। **শিবরামের ছেরাদ্দ—**
তারপর পাতায় পাতায় বসে গেল সব একে একে।

৪। **প্রাণকেষ্টর কীর্তি—**
প্রাণকেষ্ট আর অধিক বাক্য ব্যয় না করে...পাঠিয়ে দেয়।

● এক রঙ ছবি ●

১। **হর্ষবর্ধনের হজম হয় না—**
এর পর তো গঙ্গা যমুনা...অতিকায় কইমাছ এসে পড়লো পাতে।

২। **ভোজন দক্ষিণা—**
নাও, হাঁ করো! বলেই এক চামচ চিনি আমার মুখগহবরে ঢেলে দিলেন তিনি।
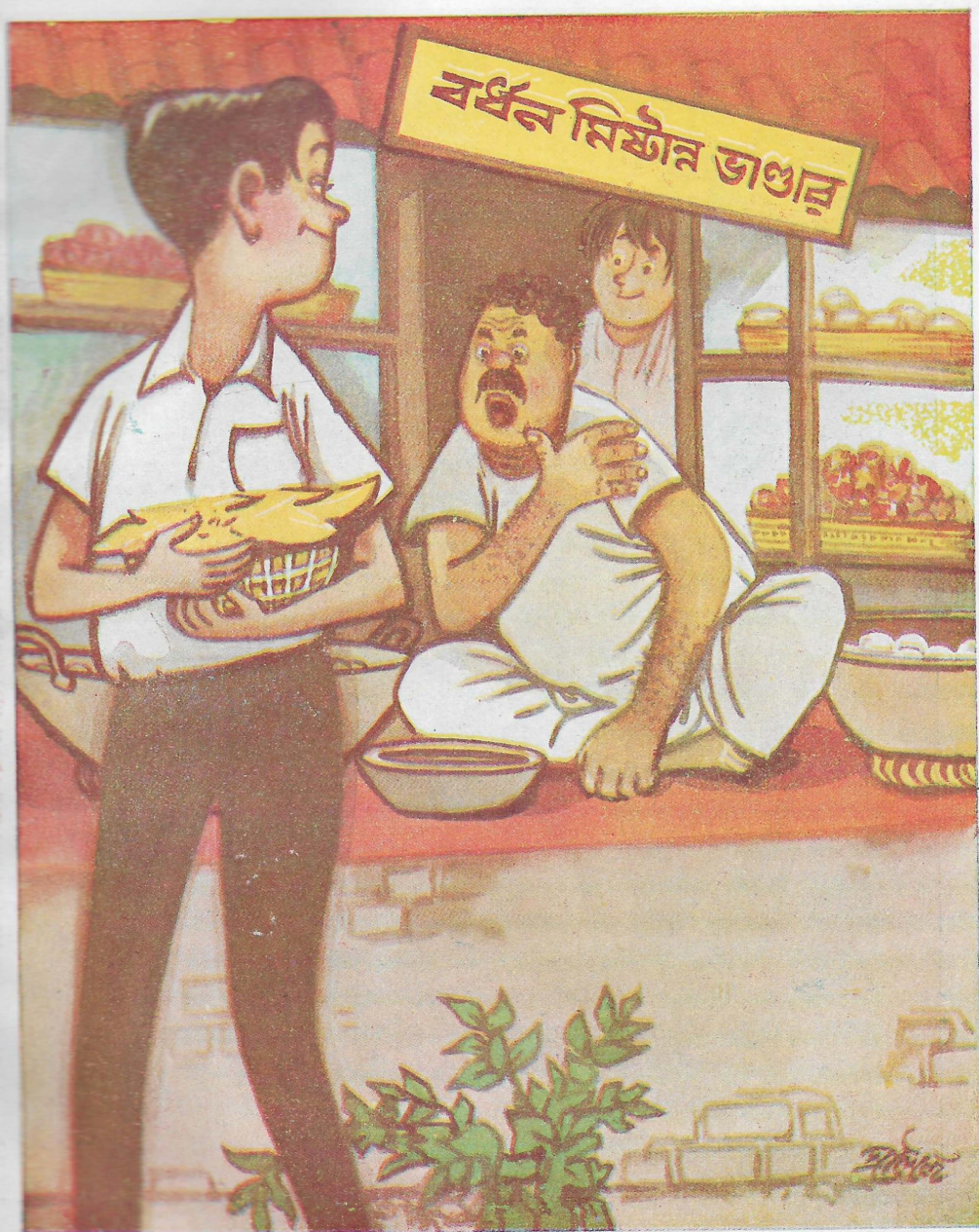
ওহে — দামটা দিয়ে গেলে না?, বাধা দেন হর্ষবর্ধন।

করাতের অভাব ছিল না এনে দিলেন একখানা।

ঘুম থেকে উঠেই হর্ষবর্ধনের আমন্ত্রণটা পেলাম। কিন্তু তেমন হৃষ্ট হতে পারলাম না যেন। কেননা কানাঘুষায় শুনেছিলাম যে......

গোবর্ধনই এসেছিল নেমন্তন্ন নিয়ে—

'ব্যাপার কি হে? তোমাদের কারো জন্মদিনটিন নাকি আজ?' জিগ্যেস করলাম।

'না মশাই।'

'তবে কি বৌদির বিয়ের নাকি?'

'সে আবার কি?' সে অবাক হয়ঃ 'বৌদির বিয়ে ত কবেই হয়ে গেছে! দাদার সঙ্গেই হয়েছে ত!'

'আহাহা! সে কথা বলছি কি!' আমি শুধরে নিই কথাটা—'তা কি আমি আর জানিনে! দিদিজ আর বর্ণ্, বাট বৌদিজ মেড্।—' বলে আমার মেড্ইজি বার করি—'জন্ম সূত্রেই আমরা দিদিদের পাই, কিন্তু বৌদি পেতে হলে দাদার বিয়ে দিতে হয়। দাদা বিয়ে করলে তবেই না আমাদের বৌদি মেলে। আমি তা বলিনি, আমি বলেছি যে বৌদির বিয়ের

হাসির ফোয়ারা

...মানে, তোমার বৌদির বিবাহতিথির উৎসব না কি আজ, তাই আমি জানতে চাইছিলাম—অবশ্যি সেটাকে তোমার দাদারও বিয়ের দিনের পরব বলা যায়।'

'না, তেমন কিছু কান্ড নয়।' সে জানায়, 'এমনি আপনাকে খেতে ডেকেছেন দাদা। দুপুরের খাওয়াটা আমাদের ওখানেই সারবেন আজকে।'

'তা বেশ!' আমি বললাম। আর ভাবলাম, আরো বেশ হল, সকালের খাওয়াটা না খেলেই চলবে আজ। পয়সাটাও বেঁচে গেল আর খিদেটাকেও বেশ চাগিয়ে তোলা যাবে। দুপুরেই ভূরিভোজের ডবল ডোজে সুদে আসলে উসুল হয়ে যাবে সব।

'তা, কী বাজার হয়েছে বলত? বাজারে গেছল কে আজ? তুমি না তোমার দাদা?

ভূরিভোজের গোড়াগুড়ির থেকে এগুনোই আমার অভিলাষ।

'বাজার কিসের! বাজারে কেউ যায়ই না আজকাল। বাজারমুখোই হয় না কেউ।' ব্যাজার মুখ করে সে জানায়।

'বল কি হে? কারণ?'

'কারণ দাদার কিছুই আর হজম হয়না আজকাল। কবরেজ কিন্তু বলছে যে অগ্নিমান্দ্য। তা সে গরহজম বা অগ্নিমান্দ্য যাই হোক না, কিচ্ছু খেতে দিচ্ছেনা দাদাকে এখন। না কবরেজ, না বৌদি। কেবল ভাস্করলবণ খেয়ে খেয়ে রয়েছে আমার দাদা। আর কী একটা যেন হজমীগুলি।'

'অ্যাঁ?' শুনে আমায় চমকাতে হয়। তাহলে গুজবটা যা শুনেছি নেহাৎ মিথ্যে নয়।

'হ্যাঁ। কবরেজ বলেছে যে গন্ডে-পিন্ডে গিলে গিলেই—নানারকম খাদ্যাখাদ্য খেয়েই নাকি এই শক্ত ব্যামোটা দাঁড়িয়েছে। এখন সব খাওয়া দাওয়া বন্ধ তাই।'

'তাহলে আমি......' একটু ইতস্ততঃ করে বলি—'তোমার দাদা কিচ্ছুটি খাবেন না। আর আমি তাহলে......এমতাবস্থায়...ভেবে দ্যাখো। যাওয়াটা কি খুব ঠিক হবে? মানে, গিয়ে খাওয়াটা? তারপর বলছো যে বাজার টাজারও বিশেষ কিছু হয়নিকো......'

'না না! বৌদি নিশ্চয়ই আপনার জন্যে কিছু আনাবেন। আলাদা করে বানাবেন নিশ্চয় কিছু।'

'কিন্তু তাহলেও......।' বলতে গিয়েও বলতে আমার বাধে।

তাহলেও দৃশ্যটা তেমন হর্ষজনক নয়। হর্ষবর্ধন কিছুটি খাবেন না, আর আমি তাঁর সামনে বসে মাছ মাংস দই রাবড়ি পায়েস পিস্টক ইত্যাদির ইস্টক ক্লিয়ার করব—বসে বসে গিলতে থাকব, দেখতে তেমন যেন সুচারু নয়। হর্ষবর্ধক তো নয়ই।

আরও খারাপ লাগল এই ভেবে, যে-হর্ষবর্ধন খাওয়ার ব্যাপারে সবচেয়ে সহর্ষ—নিজে

যেমন খেতে চান নানান রকম, তেমনি খাওয়াতে চান অপরকে—সেই তিনি নাকি দাঁতে কুটোটি না দিয়ে পড়ে রয়েছেন! এর চেয়ে রোমহর্ষক আর কিছু হতেই পারে না।

কিন্তু কিন্তু করেও গেলাম শেষ পর্যন্ত।

আমাকে দেখেই উল্লসিত হয়ে উঠলেন হর্ষবর্ধন। খেয়ো লোককে দেখলে কোন্ খাইয়ের না আনন্দ হয়।—'এই যে আপনি এসেছেন! এসে গেছেন ঠিক সময়েই! বললেন তিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে।

'বৌদির সঙ্গে একটু কথা কয়ে আসি।' বলে আমি সটান রান্নাঘরের দিকে পা বাড়াই। ছিঁচকাঁদুনের ঝোঁক যেমন কান্নার দিকে, চোরের মন বোঁচকার দিকে, তেমনি আমায় টানে স্বভাবতই রান্নাঘরের পানে খাবারের খোঁজ-খবরে।

হর্ষবর্ধনও এলেন আমার পিছু পিছু।

'কী রেঁধেছেন বৌদি আজ?' আমার সোৎসুক জিজ্ঞাসা।

'কী আর রাঁধবো ঠাকুরপো, উনি তো গাঁদাল পাতার ঝোল আর পুরোনো চালের চারটি ভাত ছাড়া কিছু খান না—কবরেজের নিয়ম সেই রকম। তাই রেঁধেছি আজ ডবোল করে।'

'ডবোল করে? ডবল করে কেন? ও, গোবরাও তাই খাচ্ছে বুঝি—দাদার পদাঙ্ক অনুসরণ করে? পেটের অসুখ না হলেও খাচ্ছে?'

'খেলে তো বাঁচতুম। তাহলে কোনদিন আর পেটের অসুখ করত না ওর—পেটের অসুখ হলে খাওয়ার চাইতে না হতেই তাই খাওয়াটা কি আরো ভালো নয় ভাই? ওকে তো বোঝাচ্ছি এত করে। তোর দাদার মতন বাইরে গিলে ব্যারাম বাধাবি কোন্দিন—কিন্তু শুনছে কি? ও একদম বাড়িতে খায় না আজকাল। বাইরে কোথায় কোন হোটেল টোটেল থেকে খেয়ে আসে নাকি।

'আর আপনি? আপনি তো এই গাঁদাল—'

'না, আমি দিদির বাড়ি খাই গিয়ে। যেদিন থেকে ওঁর অসুখ করেছে দিদি বলেছেন আমার বাড়িতেই খেয়ে যাবি—যা হয় চারটি খাবি এসে।'

'তাহলে ডবোল রেঁধেছেন কেন?'

'কেন আবার! ওঁর আর আপনার দুজনের জন্যেই রেঁধেছি তো!'

শুনে আমার মাথায় যেন বাজ পড়ে।—'কিন্তু আমার তো কোন পেটের অসুখ করেনি বৌদি। কক্ষনো করে না—কস্মিন কালেও নয়।'

'ব্যারাম হবার আগেই সারানো ভালো নয় কি ভাই? রোগ হলে ত হয়েই গেল, যাতে না হয় তার চেষ্টা করাই কি উচিত নয় আমাদের? কবরেজের ব্যবস্থাটা তো বেশ ভালো বলেই বোধ হচ্ছে আমার......।'

হাসির ফোয়ারা

'তা তো হবেই।' ক্ষোভে যেন ফেটে পড়েন হর্ষবর্ধন—'এক গাদা রাঁধতে হচ্ছে না তোমায়—আর এদিকে এক গাঁদাল পাতার ঝোল আর ভাত গিলে গিলে হাড়গিলে চেহারা হয়ে গেল আমার।'

'সত্যি, হাড়ে বাতাস লেগেছে আমার।' হাঁপ ছেড়ে বলেন বৌদি : 'রাতদিন রান্নাঘরের হাঁড়ি ঠেলা আর নানান খানা রান্নার হাঙগামা মিটে গেছে সব। ভালোই হয়েছে একরকম। আর বলতে

'গাঁদাল পাতার ঝোল চাপিয়েছি।'

কি, বলতে নেই, চেয়ে দ্যাখো ওঁর দিকে—এই খেয়ে চেহারাটা কি কিছু খারাপ হয়েছে তোমার দাদার?'

চেয়ে দেখি—সত্যিই! শ্রী ফিরে গেছে শ্রীহর্ষের। দিনের পর দিন—মাসের পর মাস গাঁদাল পাতার ঝোল ভাত খেয়ে খাসা রয়েছেন দিব্যি! চাকচিক্য যেন বেড়েছে আরো চেহারার।

তারপর মনে হল, ওঁর টাকা যেমন অগাধ, শরীরের পুঁজিও তেমনি গাদা খানেক! ওই

পুঞ্জীভূত দেহের থেকে, ও'র ব্যাঙ্ক ব্যালেন্সের মতই, অল্পবিস্তর খসে গেলেও টের পাবার যো নেই কিছু। সমুদ্র থেকে দু কলসি জল তুললেই কি আর তাতে ফেললেই বা কী!

'চলুন, একটু ঘুরে ফিরে আসা যাক।' বললেন আমায় হর্ষবর্ধন ঃ 'খিদেটা একটু চাগিয়ে আনিগে। খিদেটাকে চাগাড় দিয়ে আনা যাক। এসেই ত সেই এক গাদা গাঁদাল পাতার ঝোল নিয়ে বসতে হবে। চলুন খানিক ময়দানের হাওয়া খেয়ে আসি।'

পথে যেতে যেতে সুর ভাঁজতে লাগলেন তিনি। আওয়াজটা স্পষ্ট হতে টের পেলাম, না, গান না, কান্নাই বলা যায় একরকম। খিদের জ্বালায় বুঝি মহাকাব্য ফেঁদেছেন হর্ষবর্ধন।

তিনি আওড়াচ্ছেন, স্পষ্ট আমি শুনলাম—

'পেটের বড় জ্বালা...দুই হাত পা লটর পটর...কর্ণে ধরে তালা!' উৎকর্ণ হয়ে আমি শুনলাম। তারপর তাঁকে শুধালাম—'তার মানে?'

'তার মানে, চলুন না আপনি, টের পাবেন এক্ষুনি।' তিনি জানান—'আপনাকে কেমন লটর পটর খাওয়াব।'

'সে আবার কি?' আমি থম্‌কে দাঁড়াই—'না, কোথাও গিয়ে লটপটানি খেতে—লটপট করতে আমি রাজি নই।'

'করতে না মশাই, খেতে হয়। লটপট একরকমের খাবার। এক পাইস হোটেলে খাইয়ে থাকে। সেইখানেই যাচ্ছি আমরা।'

অলিগলি পেরিয়ে আমাকে নিয়ে উঠলেন তিনি গিয়ে এক পাইস হোটেলে।

বললেন, 'নামেই পাইস হোটেল মশাই, কিন্তু পয়সায় কিছু মেলে না আর আজকাল। টাকার কারবার সব। মাছের টুকরোই বলুন আর মাংসের টুকরোই বলুন, সব এক টাকা করে দাম। কোন্‌কালে কেবল পাইসে মিলত খোদাই জানেন! পুরো একপ্লেট ভাতের দামও এখানে একটাকা।'

দুজনে ভেতরে গিয়ে বসলাম একধারের লম্বা টেবিলে—একাধারে টেবিলবেঞ্চিও বলা যায় এটাকে—ঠিক ইস্কুলে যেমনটি থাকে।

'চেয়ে দেখুন না খাদ্য তালিকার দিকে—ঐতো টাঙানো রয়েছে সামনেই।' তিনি দেখালেন।

দেখলাম—সত্যিই! মাছভাজা, মাছের ঝোল, মাছের কালিয়া, দমকারি, মাংসের প্লেট, রকমারি খাদ্যাখাদ্য—থরে থরে সাজানো—চক্‌খড়ির দামে কেউ একটাকার কম যায় না।

আরো দেখলাম, কলকাতায় বাজারে মাছের তাল না পাওয়া গেলেও এখানে তাদের বিরাট সম্মিলনী। পাবতা মাছ, টেংরা মাছ, রুই মাছ, কাতলা মাছ, ভেটকি মাছ, ইলিশ মাছ, গলদা চিংড়ি, আড় মাছ—আরো কত কী মাছ—তার ইয়ত্তা হয় না। ঝাল ঝোল কালিয়া কোর্মা কোপ্তা কাবাব সব মিলিয়ে এক পেল্লায় ভোজন পর্ব। ভোজ্যপর্বতও বলা যায়।

হাসির ফোয়ারা

'পয়সায় কুলোয় না মশাই! পয়সা দিয়ে কিছু মেলে না এখানে। রুপিয়া ফেলে খেতে হয় সব কিছু। ঐ যে লোকটি দেখছেন বসে আছেন কাউণ্টারে—উনিই এই হোটেলের মালিক। অনেক টাকার মালিক মশাই। দেখলে চেনবার যো-টি নেই, বসে বসে রুপিয়া গুনছেন খালি।'

'বহু-Rupee বলুন তাহলে!' আমি বললাম।

'পয়সায় কুলোবে না বলে একশ টাকার নোটখানা এনেছি।' দেখালেন তিনি—'সব টাকাটাই উড়িয়ে দিয়ে যাব। তার কমে ভাল খাওয়া হয়না আজকের দিনে।'

বলে কি লোকটা? এর না অগ্নিমান্দ্য? কিচ্ছুটি নাকি হজম হয় নাকো। খালি গাঁদালপাতার ঝোল আর ভাত বরাদ্দ? না খেয়ে খেয়ে মাথা খারাপ হয়ে গেছে নিশ্চয়। তাই হন্যে হয়ে পাগলের মতন এই খাদ্যের অরণ্যে এসে ঢুকেছে......

ভেবেছিলাম খাবারের লিস্‌ট্‌ দেখে ঘ্রাণেন অর্ধভোজন সেরে হৃষ্ট হয়ে ফিরে যাবে, কিন্তু না, পরক্ষণেই ভুল ভাঙলো আমার। দুম করে তিনি হুকুম দিয়ে বসলেন—

'দু থালা ভাত। সব চেয়ে সরেস চালের। আর যত রকমের ভাজাভুজি আছে সব। সেই সঙ্গে দুপিস করে মাছ ভাজা, পোনা মাছ, ইলিশ মাছ, ভেটকি মাছ প্রত্যেকটার ভাজা। আরো যা যা মাছ ভাজা আছে দিতে পারেন। ভাতের সঙ্গে মাখন চাই এবং পাতি নেবু দুপিস্‌ করে।'

এসে গেল সব একে একে। বসে গেলাম খেতে। আলু পটল বেগুন উচ্ছে ইত্যাদির ভাজাভুজির সহযোগে মাখন মাখানো গরম ভাত মাছভাজাগুলির সঙ্গে খেতে যা খাসা লাগলো! দুজনে মিলে সাবাড় করতে লাগা গেল।

একটু না এগুতেই হর্ষবর্ধনের ফরমাস আবার—'নিয়ে আসুন, রুই মাছের কালিয়া, চিংড়ি মাছের মালাইকারি আর মাগুর মাছের ঝোল। ডবোল ডবোল।'

এসে গেল চাইতে না চাইতেই। খানিক বাদেই হাঁকলেন উনি আবার—'দই মিষ্টি সব রেডি আছে ত? কথায় বলে মধুরেন সমাপয়েৎ!'

কর্ণারের লোকটি কান নাড়ল—'আজ্ঞে হ্যাঁ—সমাপয়েৎ আছে বইকি আপনার।'

'এরপর তো গঙ্গাযমুনা? এর পরেরটা কই?' ও'র তলব সব ডবল ডবল।

অতিকায় কই মাছ এসে পড়লো পাতে। তার এক পিঠ ঝাল অপর পিঠ অম্বল। সেই গঙ্গাযমুনা বেশিক্ষণ প্রবাহিত হতে পেল না। উঠে গেল পাতে পড়তে না পড়তেই।

'এইবার আনুন সেই ইলিশ মাছের ইলাহী।'

'ইলাহী? ইলাহী কী আবার?' ইলাহীর মানে আমার যৎসামান্য বিদ্যায় কুলিয়ে উঠতে না পেরে বাধ্য হয়ে শুধাতে হল ওনাকে।

'ইলাহী কারবার।' জানালেন উনিঃ 'ওরা জানে। ওর মানে হচ্ছে সাত প্রস্থের ইলিশ মাছ—সাত রকমের সাতখানা। সপ্তরথী।'

হাসির ফোয়ারা

'এক প্রস্থ ত হয়েই গেছে—ইলিশ মাছ ভাজা ত পেয়েই গেছি গোড়ায়।' আমি প্রকাশ করিঃ 'আর ছ প্রস্থ বলুন তাহলে।'

'ছয় নয়।' উনি বলেন, 'আরো সাত রকমের বাকী আছে এখনো।'

'যথা?'

'যথা, ইলিশ মাছের ঝোল, ইলিশ মাছের ঝাল, ইলিশ মাছের কালিয়া, ইলিশ ভাতে, সর্ষে ইলিশ, দই ইলিশ, ইলিশ মাছের রোস্ট এই সাত এবং পুনশ্চ......।'

পুনশ্চ! আমি হাঁ হয়ে গেছলাম।—'পুনশ্চ আবার?'

'দেখতেই পাবেন। এগুলো খেয়ে শেষ করুন ত আগে।' শেষ না হতেই তিনি হাঁকলেন ফের—'এবার আনুন আপনাদের সেই লটরপটর। এবার আমরা লটরপটর খাব দুজনায়।'

'লটর পটর নয়, লটপটি।' জানালো সেই কোণঠাসা লোকটা—'আমাদের ইলিশ মাছের লটপটি, ত্রিভুবন বিখ্যাত।'

লটপটি খেয়ে ঢেঁকুর তুলে হর্ষবর্ধন বললেন—'এবার সেই আপনাদের শেষ বেশ। ইলিশ মাছের অম্বল।'

'এর পর আবার অম্বল?' না বলে আমি পারি না—'যা খাওয়া হয়েছে এতেই অম্বল হবে এমনিতেই; না হয়ে যায় না। এর পরও আবার অম্বল আরো?'

'ইলিশ মাছের অম্বল। সেটা মাছের মধ্যে ধর্তব্য নয়, ইলিশ মাছের মাথা আর কাঁটা ফাঁটা দিয়ে। কিন্তু খেতে যা খাসা!' তিনি অম্বলের ঝোলের সঙ্গে নিজের জিভের ঝোল টানলেন।

'ইলিশ মাছের একেবারে নয় ছয় বলুন না! কিন্তু আপনার না অগ্নিমান্দ্য? কিছুই নাকি হজম হয় না আপনার—বলছিল যে আপনার ভাই?'

'হয়ই নাত। বার্লিটুকুও সহ্য হয় না আমার পেটে। মিথ্যে নয় মশাই।'

'তাহলে এসব, এত......সব?'

'ঐ হতভাগা কবরেজটার জন্যই। এমন এক বিদঘুটে দাবাই দিয়েছে আমায়'...বলে পকেট থেকে একটা কৌটো তিনি বার করলেন—'এই ওষুধের জন্যেই তো।'

'তার মানে?' আমি তো আরো অবাক।

'কবরেজি ওষুধ খাবার বিধি ব্যবস্থা জানেন কিছু? সব ওষুধের সঙ্গে একটা করে লেজুড় থাকে—তার নাম অনুপান। সেটা ওষুধের সঙ্গে খেতে হয়। তা না হলে তেমন নাকি ফল হয় না। এরও একটা অনুপান গোছের ছিল।'

'তা তো থাকবেই।' আমি ঘাড় নাড়ি—কিছু না জেনেও অনুমান করে নিই।

'সেই অনুপানটা আরো বিদঘুটে। কী সব শেকড় মাকড় রোজ বাজার থেকে কিনে আনো। তারপর চার সের জলে চার ঘণ্টা ধরে সেদ্ধ করে চার ছটাক থাকতে নামাও, তারপরে চারঘণ্টা ধরে ঠাণ্ডা করে ওষুধের সঙ্গে গেলো। শেকড় মাকড়ের নাম শুনেই মনে হয়েছিল সে খেলে

আর বলতে হবে না, খাবারদাবার সব গুলিয়ে উঠে এই গুলির সঙ্গেই বিলকুল বেরিয়ে আসবে তক্ষুনি। তাই আমি ভাবলাম, পানীয়ের বদলে খাদ্যেই যাই না কেন? অনুপানের বদলে অনুখাদ্যে।'

'এই কি আপনার অনুখাদ্য? এই খাদ্যকে কি অণুপরিমাণ বলা চলে? বরং আণবিক—মানে, আণবিক বোমার মতই দানবিক ডোজের ভোজ বলতে হয়।' বলতে আমি বাধ্য হই।

'করব কি মশাই! মোক্ষম দাওয়াই যে। না যদি কিছু খাই তো সঙ্গে সঙ্গে মোক্ষলাভ—সাক্ষাৎ মৃত্যু তখুনি......'

'অ্যাঁ? এমন ওষুধ?'

'তবে আর বলছি কি!'

অবাক হয়ে শুনতে হয় আমায়—

'কবরেজি ওষুধ কথা কয়, কথায় বলে নাকি! এই গুলি-গুলিও কম কথক নয় মশাই। খাবার সঙ্গে সঙ্গে সব হজম। আবার সেই চোঁ চোঁ খিদে। আবার কসে সাঁটান আবার খান গুলি। আবার এক গুলিতে সব সাবাড়। আবার খিদে......আবার খাবার......আবার গুলি...... আবার......'

'থামুন! থামুন! আমার সব গুলিয়ে যাচ্ছে কেমন! মাথা ভোঁ ভোঁ করছে।'......ইলিশ মাছের পাথারে সাঁতার কাটতে কাটতে বলি। মাথা গুলিয়ে যায়!

'দুবেলায় পুরো একশ টাকার খেতে হয় আমায়। এই এক টাকার গুলির জন্যে মশাই! যদি এত এত না খাই তাহলে আমার পেটের নাড়িভুঁড়ি সব হজম হয়ে মারা পড়বো আমি নির্ঘাৎ। এই একগুলিতেই আমার খতম্।'

'কিন্তু গোবরা বলছিল আপনার নাকি হজম হয় না।'

'হয়ই নাতো। সাবু দানাটি পর্যন্ত হজম হয়না। বলেছে ঠিকই। কিন্তু কী করব, এতসব না খেয়েও আমার উপায় নেইকো। যা অব্যর্থ আমার কবিরাজ! এই যে হজমিগুলি দিয়েছেন আমাকে—আপনিও খান না একটা—' বলে আমায় একটা গুলি দিয়ে নিজেও তিনি একখানা গিললেন।

'এ খেলে নাড়িভুঁড়ি পর্যন্ত হজম হয়ে যায়। এই গুলি রোজ তিনটে করে খেতে হবে আমার—এই ব্যবস্থা। পাছে নিজের নাড়িভুঁড়ি অব্দি হজম করে না বসি সেই ভয়ে বাধ্য হয়েই এত এত খেতে হচ্ছে আমায়। কি করব?'

———

এটা হাসির গল্প নয়। করুণ গল্পও না, তোমাদের কাছে নয় অন্ততঃ। করুণ যদি কারো কাছে হয় তো কেবল তা আমার কাছেই।

খুব সম্ভব এটা ভূতের গল্প। এবং এই গল্পের এক ভূত বোধ হয় আমি। আর অপর ভূতটি—সেও হয়ত আমিই স্বয়ং। দশচক্রে নয়, নিছক নিজের চক্রান্তে!

সেদিনের সেই ঘটনার পরে সশরীরে আমি টিকে আছি একথা ভাবতে পারি না। মরে গিয়ে ভূত হয়ে এই নশ্বর জগতে বিচরণ করছি বলেই আমার সন্দেহ হয়। অবশ্যি, আলোয় আমার ছায়া আর আয়নায় প্রতিচ্ছায়া পড়তে দেখা গেছে কিন্তু তাহলেও এখনো আমার ঐ দ্বিধা দূর হয় নি।

এবং মারা যাবার আগে হয়ত বা হবে না। তবে—আমি—কি আবার মারা যাবো? হয় আমি কবে মরে গেছি নয় তো আমি অমরদের মধ্যেই গণ্য হয়ে রয়েছি। মারা যাবার পরে প্রায় সবাই তো অমর? কজন আর বেঁচে উঠে পুনরায় মরবার সুযোগ পায় বলো?

এখন আসল কথায় আসা যাক্—সেদিনের ঘটনাটা বলি।

বেশ কিছুদিন আগের কথাই। কলকাতার বড় ডাকঘরের কাছে একবার একটা সুড়ঙ্গ বেরিয়েছিল, তার খবর কি তোমরা কেউ রাখো? তোমাদের মধ্যে যারা বেশ বড়ো হয়েছো আর

হাসির ফোয়ারা

খুব ছোট বেলাতেও কাগজ পড়তে অভ্যস্ত ছিলে তাদের কারো কারো হয়ত মনে পড়তে পারে। সেই সুড়ঙ্গ নিয়ে সেই সময়ে ভারী শোরগোল পড়েছিল।

জি-পি-ওর দিকে মুখোমুখি দাঁড়ালে ওর ডান পাশের যে কাস্টম হাউস্‌টা নজরে পড়ে সেইখানে আগে পুরানো কেল্লা বাড়িটা ছিল নাকি। সিরাজদ্দৌলার আমলের বাড়ি। সেই বাড়ি ভেঙে এই কাস্‌টম্‌ হাউস্‌ গড়বার কালেই এই সুড়ঙ্গটা বেরিয়ে পড়েছিল! মিস্ত্রী মজুররা শাবল-গাঁইতি দিয়ে গভীর করে ভিৎ খুঁড়তে খুঁড়তে সুড়ঙ্গটাকে বার করে ফ্যালে হঠাৎ।

প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌রা বলছিলেন যে উক্ত সুড়ঙ্গের ঐ গুপ্ত পথেই নবাবের বেগমরা গঙ্গাস্নানে যেতেন—ওর আরেক মুখ আছে নাকি গঙ্গার দিকে। হয়ত বা গঙ্গাগর্ভেই এখন। যে সময়ে এই সব নিয়ে কাগজে কাগজে হট্টগোল চলছিল তখন কে ভেবেছে যে নবাবের বেগম না হয়েও আমাকেও ঐ পথে অচিরে গঙ্গাযাত্রায় যেতে হবে। আমিই কি ভেবেছিলাম!

দুয়েকদিনের মধ্যেই অবিশ্যি ঐ সুড়ঙ্গ বুজিয়ে ফেলা হয়, কিন্তু সেটা আমি চিরকালের মত চোখ বুঁজবার পরেই! ঐ সুড়ঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে আমিও যে কাস্টম হাউসের কুক্ষিগত হয়ে গেলাম—কবরস্থ হয়ে রইলাম—সেকথা কি তখন কারো খেয়াল হয়েছে? কোনো কাগজে কি বেরিয়েছিল সে খবর? হায়, কেউই তা জানে না; অদ্য তারিখের আগে আমার এই মরণবৃত্তান্ত প্রকাশের পূর্বে এই চরাচরের কেউ সেকথা জানতে পায়নি।

উল্লিখিত সুড়ঙ্গের আবিষ্কারের খবরটা তার আগের দিনের কাগজে পড়েছিলাম। সেদিনের সংবাদপত্র খুলে সর্বপ্রথমে তারই এক ছবি দেখা গেল—চমৎকার এক সুড়ঙ্গীন ছবি। ঠিক এই সময়টাতেই আমার টেলিফোনের ঘণ্টা বেজে উঠল—ক্রিং ক্রিং ক্রিং—

টেবিলের ওপাশের রিসিভারটাকে হাত বাড়িয়ে কানে টানলাম—"হ্যালো!"

উত্তর এল—"হ্যালো!" অবিকল আমার গলায়!

আওয়াজ শুনে চমকে যেতে হোলো। কানের গলদ মনে করে গলা ছাড়লাম আবার—"হ্যালো, কে তুমি?"

"আমি শিব্রাম্‌।" একেবারে আমার গলায় যেন আমারই জবাব।

বন্ধুবান্ধব হয়ত কেউ ছদ্মগলায় রসিকতা করছে ভেবে আমার হাসি পেল।

"শিব্রাম্‌ তো বুঝলাম, কিন্তু বলছ কোথ্‌থেকে?" প্রশ্ন করলাম আমি।

"ভারী বিপদে পড়েছি ভাই! সিরাজদ্দৌলার সুড়ঙ্গের ভেতর থেকে কথা বলছি এখন।"

তখন আর আমার বুঝতে বাকী রইল না যে কণ্ঠকুশলী কোনো বন্ধুর নিতান্তই এটা সুড়ঙ্গ-রস। অকারণ আমার উৎকণ্ঠা-সৃজনের অপচেষ্টা।

"তা ওখানে মরতে গেছ কেন? মরবার কি আর কোনো জায়গা ছিল না কোথাও?" জবাব দিলুম আমি।—"আর গেলেই বা কি করে ওখানে?"

● নিজের ভুত নিজে দেখা!

"ঠাট্টার সময় নয় ভাই, আমার মৃত্যু আসন্ন!" অত্যন্ত কাতরকণ্ঠে জানালো শিব্রাম। সেই শিব্রাম। আমার মত স্বরে হুবহু আমার ব্যঞ্জনা দিয়ে বলল।

কারো মৃত্যু আসন্ন জানলে মনে ঘা লাগে। কান্না পায়। তা নিজেরই কি আর পরেরই কি! বিশ্বাস না হলেও জিগ্যেস করলাম ঃ "সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বলো দেখি, কিছুই আমি ঠিক ঠাওর করতে পারছি না।" একটু কৌতূহলও যে না হয়েছিল তা নয়।

"সে সব কথা পরে বলব, অনেক বৃত্তান্ত, আমাকে বাঁচাও আগে এখন। সুড়ঙ্গে আমি আট্‌কা পড়েছি। বেরোবার পথ পাচ্ছিনে। আমার টর্চের আলোও নিভে আসছে। সুড়ঙ্গের মুখ বুজিয়ে দিয়েছে কি না কে জানে! আমাকে যদি বাঁচাতে চাও তো আর এক মুহূর্তও দেরি কোরো না—ঐ যা! নিভে গেল টর্চটা! চারধারে অন্ধকারের ঘুটঘুট্টি... ওঃ! কে যেন আমার গলা চাপছে ...আমার গলা...এই অন্ধকার—ইস্‌!"

ভারী বিপদে পড়েছি ভাই! [পৃঃ ১০

বলতে বলতে আমার সেই নামান্তর—বিকল্প-আমার আর্তস্বর থেমে গেল হঠাৎ। তার টর্চের সঙ্গে সঙ্গে তার এবং আমার torture এক সঙ্গে গেল। তার হাত থেকে রেহাই পেলাম।

ব্যক্তিটি যেই হোক সে বেশ কলাকুশলী, চমৎকার পিলে-চমকানো অভিনয় করতে পারে তার আর ভুল নেই! তার ওস্তাদিকে বাহবা দিতে হয়!...আমার মৃত্যু আসন্ন জেনে আমার

হাসির ফোয়ারা

নিজেরই হাসি পেল এমন! আরে, আমি জলজ্যান্ত এখানে বর্তমান, আজকের খবরের কাগজের সামনে, আমি আবার কি করে অনাত্র খরচ হয়ে যেতে পারি? জিন্দাবাদ আর মুর্দাবাদ কি একসঙ্গে হয়?

যাই হোক, সুড়ঙ্গটা আমার মনে বেশ কৌতূহল জাগিয়েছিল; কালকের কাগজে বার্তাটা পাবার পর থেকেই ওটা দেখবার আমার লালসা জেগেছে। আজকের ওর চিত্ররূপ দেখে অবধি আমি আর আত্মসংবরণ করতে পারছিনে। গ্রহ কিনা কে জানে, কিন্তু আমার আগ্রহ বেড়ে গেছে দশগুণ। দেখেই আসা যাক্ না কেমন সুড়ঙ্গটা!

এক্ষুণি গিয়ে দেখলেই হয়। কত লোকই তো যাচ্ছে। যাচ্ছে না কি?

সে কথা সত্যি। গিয়ে দেখলাম বেজায় ভীড়। বিস্তর লোক সুড়ঙ্গের বাইরে দাঁড়িয়ে উঁকি ঝুঁকি মেরে ভেতরের রহস্য চক্ষুগোচরের চেষ্টা করছিল। একটু ভেতরে গিয়ে দেখা যায় না। এই একটুখানি কয়েক হাত অন্ততঃ?

পাহারোলা কিন্তু ছাড়বার পাত্র নয়। কিছুতেই সে যেতে দেবে না। এক পাও নয়। কিছুতেই সে যেতে দেবে না। এক পাও নয়। রবীন্দ্রনাথের মেয়েটির মত 'যেতে নাহি দিব' মেজাজ। সে বলল, আজ এটা বুজিয়ে ফেলা হবে। আর একটু বাদেই। আমি বললাম, আমি কি তোমার ভেতরে যাচ্ছি? এতই বোকা কি আমি? এই সামনে থেকেই—একটু উঁকি ঝুঁকি মেরে চলে আসব এক্ষুণি। অনেক বলে কয়ে পাহারোলাকে খুসি করে তো ঢোকা গেল সুড়ঙ্গে।

একজন অ্যাংলো ইন্ডিয়ান্ বাচ্চার হাতে একটা টর্চ ছিল—নগদ মূল্য দিয়ে সেটা কিনে নিলাম। আলো না হলে পথ দেখব কি করে? কয়েক পা এগিয়ে কিন্তু দেখলাম, বেশ পরিষ্কার পথ। রসাতলের পথ বলে আদৌ সন্দেহ হয় না। ধুয়ে মুছে সাফ করা হয়েছে। হয়ত নবাবী আমলের ধনরত্নলাভের দুরাশায় সরকারপক্ষ থেকেই পরিষ্কাররূপে এটা পরীক্ষা করা হয়েছিল। ইতিমধ্যেই এর গর্ভে টেলিফোনের লাইনও পাতা হয়েছে দেখলাম। আরো ভেতর পর্যন্ত চলে গেছে টেলিফোনের তার।

তবে আবার ভয় কিসের? মানুষ তো গেছে এর ভেতরে। সরকারী লোকরাই গিয়েছে। গেছে এবং ফিরেও এসেছে ফের। আমারই বা শেষ পর্যন্ত দেখে শুনে ফেরৎ আসতে দোষ কি? সিরাজদ্দৌলার সময়ে আমি সজীব ছিলাম কি না কে জানে, কেবল ত্রিকালজ্ঞরাই তা বলতে পারেন, কিন্তু এখন নিজের নাগালে সিরাজদ্দৌলার কীর্তি পেয়ে, হাতে নাতে পেয়ে, বাজিয়ে না দেখে ছেড়ে দেব কেন?

আস্তে আস্তে টর্চ হাতে এগুনো গেল।

এঁকে বেঁকে কিছুদূর গিয়ে একটা ঘরের মতন দেখতে পেলাম। চোর কুঠরির মতন অনেকটা। সুড়ঙ্গটা সেইখানেই এসে শেষ হয়েছে, আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়। টেলিফোনের লাইনটাকে সেখান পর্যন্ত টেনে আনা হয়েছিল।

● নিজের ভূত নিজে দেখা!

হাসির ফোয়ারা

কুঠ্‌রিটায় অদ্ভুত একটা কী গন্ধ, একটু ক্ষণেই নেশা ধরিয়ে দেয় যেন। অনেক দিন—মাস—বছর...যুগযুগান্ত কোনো এক জায়গায় এসে জমাট্‌ বেঁধে গেলে এম্‌নি গন্ধ ছাড়ে বোধহয়। ঘরের মাঝখানে মর্মরের বেদীর মতো বাঁধানো, তার একধারে আমি বসলাম।

বসতে বসতেই কেমন ঘুম পেতে লাগল। কি রকম ক্লান্তি বোধ করতে লাগলাম। কোনো লোক যদি কয়েক শতাব্দী ধরে ক্রমাগত বেঁচে থাকে—অবশ্য, থাকে না কেউ—তাহলে সে যেমন সর্বাঙ্গে ভীষণ একটা অবসাদ বোধ করে—বিষাদ আর অবসাদ যুগপৎ—সেই রকমের আশ্চর্য এক অনুভূতি ধীরে ধীরে আমাকে আচ্ছন্ন করতে লাগল।

কতক্ষণ ঐ ভাবে ছিলাম জানিনা। হঠাৎ চমক ভাঙতেই দেখলাম আমার টর্চ প্রায় নিবু নিবু।

উঠতে গিয়ে দেখি শরীর অবশ, তবুও উঠলাম কোনোগতিকে। কিন্তু পথ কোথায়? সুড়ঙ্গের বহির্মুখটা কোন্‌ দিকে ছিল মনে পড়ছে না। টর্চের ক্ষীণ আলোয় চারধারই তো বন্ধ দেখছি। তবে কি—তবে কি এর মধ্যেই সুড়ঙ্গের মুখ ওরা বুজিয়ে দিয়ে চলে গেছে নাকি?

ভাবতেই আমার বুক কেঁপে উঠল। কী সর্বনাশ! য়্যাঁ—?

কিন্তু এখনো বোধ হয় সম্পূর্ণ সর্বনাশ হয়নি। টেলিফোনের যন্ত্রটা তো এখনো রয়ে গেছে দেখছি—হাতের কাছেই তো আছে। টেলিফোনে হাঁক ডাক ছাড়া যাক্‌...খবর পাঠাই বাইরে...নিজের বাড়িরই কাউকে ডাকি না হয়...এখনই হাল ছেড়ে দিয়ে ভয় পাবার কি আছে? ...এখনই কি?...এই বিংশ শতাব্দীর এহেন সভ্যযুগে এত সহজে এমন অবলীলায় কখনো কারো জীবন্ত সমাধি হতে পারে না।

যতদূর সম্ভব শান্তভাবে রিসিভারটা হাতে নিয়ে নিজের বাড়ির নম্বর চাইলাম...হ্যালো...

ডাকতে ডাকতেই সাড়া এসে গেল...হ্যালো...

যাক্‌, সাড়া পেয়েছি যখন, তবে আর কি? বেঁচে গেছি তাহলে। এবারের মত বাঁচলাম! কিন্তু হঠাৎ আমার খট্‌কা লাগে। জবাবের আওয়াজটা ঠিক আমার নিজের গলার মতো নয় কি?

কানের ভ্রম হবে বোধ হয়।...এবারে ওধার থেকে প্রশ্ন এল—

"হ্যালো, কে তুমি?" প্রশ্নটা অবিকল আমার গলায়।

"আমি—আমি শিব্রাম।" জবাব দিলাম আমি। নিজের সম্বন্ধে আমার কেমন দ্বিধা ছিল, বরাবরই ছিল, কিন্তু এতটা দ্বিধাগ্রস্ত আমি হইনি কখনো।

"শিব্রাম্‌ তো বুঝলাম, কিন্তু বলছ কোথ্‌থেকে?" টেলিফোনের ওধার হতে জিজ্ঞাসা এল এধারে।

আমার ঘরে বসে কে এমন করে আমার সঙ্গে ছলনা করছে? মৃত্যুমুখে দাঁড়িয়ে এই দুঃসময়ে এমন রসিকতা ভালো লাগে না। সত্যি বলতে, আমার কান্না পেতে থাকে।

হাসির ফোয়ারা

আর্ত স্বরে আমি বললাম ঃ "ভারী বিপদে পড়েছি ভাই! সিরাজদ্দৌলার সুড়ঙ্গের ভেতর থেকে কথা বলছি আমি।"

হঠাৎ আমার মনে হোলো, সমস্তটাই মায়া নয়তো? আমি যদি এখানে তাহলে আমার বাড়িতে বসে আমার মতই ও কে তবে? ওখানেই ওই-আমি যদি সত্যিই আমি হই—তাহলে এখানকার এই-আমি কে আবার? ভারী গোলমালে পড়ে গেলাম।

যথার্থই যদি উর্ধ্ব জগতে একজন আমি এখন বজায় থেকে থাকি তাহলে এখানে রসাতল-গর্ভে এই আমি গোল্লায় গেলেই বা কী হয়? কিসের ক্ষতি? একজন আমি তো বেঁচেই রইলাম! আমাদের একজনই তো যথেষ্ট! আরো বেশি আমাকে পাবার মায়া বাড়ানোর লাভ কি?

কিন্তু আমার মন না না করে উঠল। আমার সমস্ত অস্তিত্ব—যার কোনোখানেই মায়া নেই—চিমটি কাটলে সবখানেই যার লাগে—একথা ভাবতেই হাহাকার করে উঠল। হাঁ হাঁ করে উঠল যেন। না—না, আমাকে বাঁচতে হবে—এই আমাকেও। ওপরের ঐ আমি টি‘কে থাকা এ আমার কোনই সান্ত্বনা নয়, ও যদি সত্যিই আমি হই, তবুও। আমার নিজের মতে, এই আমিটাই সত্য। পুরোপুরি আসল। এ ছাড়া আর কোন আমির অন্য কোন অস্তিত্ব আর কোথাও আমার থাকতে পারে না।

ফের আমার মনে হয়, বেশ, উর্ধ্বলোকের আমি যদি সত্যিই আমি হই, অন্ততঃ নিকটাত্মীয়ও হই, তাহলে সে কেন এখানে এসে এখন এই মৃত্যুগহ্বর থেকে আমাকে উদ্ধার করুক না! বাধা কি তার? নিজের সঙ্গে সাক্ষাৎলাভে সুখীই হওয়া যাবে। পরস্পরের মুখোমুখি হতে চক্ষুলজ্জা কিসের?

এদিকে আমার টর্চের আলো নিভে আসতে থাকে। আর কয়েক মুহূর্তেই হয়ত...! তারপর আর আমার পাত্তা পাওয়া যাবে না—ও-ও পাবে না, আমিও না। আমি পরিত্রাহি ডাক ছাড়ি... হ্যালো...হ্যালো...বাঁচাও আমাকে। শীগগির এসো। সুড়ঙ্গে আমি আটকা পড়েছি...বেরুবার পথ পাচ্ছি না।...আমার টর্চের আলোও নিভে আসছে......কী অন্ধকার...আর পারি না...উঃ...
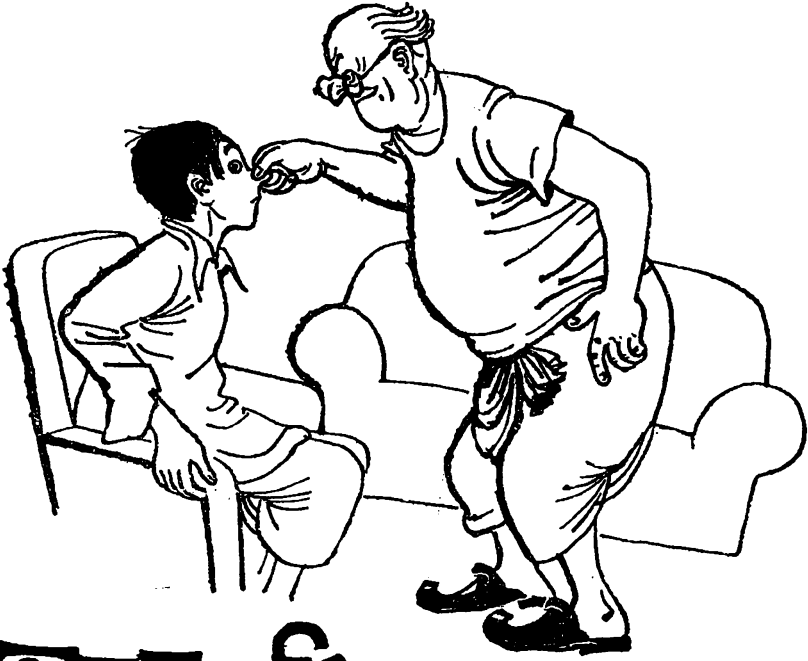
ভোজন দক্ষিণা

আমাদের বাসতুত ভাই এন্ড কোম্পানি প্রাঃ লিঃ ডকে উঠবার পর, কিছুদিন পরেই আবার আমাদের মাথায় ব্যবসার ফন্দি গজিয়ে উঠল।

এবারকার বুদ্ধিটা ভোলানাথের। কিন্তু এ-রকম বেয়াক্কেলে বুদ্ধি আর হয় না, বলতে আমি বাধ্য। সেই বাসের কারবারের চেয়েও ঢের বেশি অবাস্তব।

আমি বললাম, 'ব্যবসা তো করবি, কিন্তু তার মূলধন কৈ? টাকাকড়ি সব তো সেই বাসের ব্যবসাতেই খোয়াতে হয়েছে আমাদের।'

'আমাদের-এক মাস্তুতো ঠাকুর্দা......' বলছিল ভোলানাথ।

'কী বললি? কী রকমের ঠাকুর্দা?' জিজ্ঞেস করল শৈলেশ।

'আমার মাসির বাবা আর কী!' জানাল সে।

'সে তো তোর মারও বাবা রে। দাদামশাই বল!'

'ওই হ'ল। তা, তিনি বার্মা মুলুকে টিকের ব্যবসাতে বিস্তর টাকা কামিয়ে সম্প্রতি দেশে

ফিরেছেন। দেশে মানে এই কলকাতাতেই। আহিরীটোলায় তাঁর পৈতৃক বাড়ি আছে, সেখানেই উঠেছেন তিনি।'

'টিকের ব্যবসায় বড়লোক?' অবাক হয় শৈলেশ।

'ঠিক বলছিস!' আমিও কম অবাক হইনে।

'সত্যি না তো কী! বার্মায় গিয়ে টিকের ব্যবসায় বহুৎ লোক ধন কুবের হয়ে গেছে—কে না জানে!'

'ব্যবসায় টিকে থাকাই শক্ত ব্যাপার।' আমি বললাম—'দেখলি না, টেকা দূরে থাক্, দাঁড়াতেই পারলাম না আমরা।'

'এ বাস্-এর ব্যবসা নয় রে ভাই, টিকের ব্যবসা—বলছিনে?' বলল ভোলানাথ।

'টিকে-তামাকের ব্যবসায় বড়লোক?' আমার বিশ্বাস হতে চায় না, 'তবে হ্যাঁ, ব্যবসায় টিকে থাকতে পারলে হতে পারে। সব ব্যবসাতেই হওয়া যায় হয়তো।' বলে আমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলি—'কিন্তু টিকতেই দেয় না যে!'

'আরে দূর।' বলল সে, 'তামাক টিকের ব্যবসা কেন হবে! যে-টিকে দিয়ে হামবসন্ত আটকায় তাও না। আর পণ্ডিতমশাই শ্লোক ঝেড়ে 'টিকা লিখহ' ব'লে যে ব্যাখ্যা করতে দেন তার কথাও আমি বলছি না। এ হচ্ছে আসল টিকের ব্যবসা।'

'আসলটি-কে ব্যক্ত করহ, বৎস!' আমি বললাম, 'কিম্ভূত বিবরণ সহ।'

'টিক হচ্ছে একরকমের কাঠ—বার্মামুলুকে মেলে খালি।'

'কাঠ! তাই বল! তা' আকাঠের মতন অমন টিক টিক করছিস কেন তখন থেকে?' আমি বললাম।

'ঠিক ঠিকই বলছি।' বলল ভোলানাথ—'আর এটাও জানি যে তার থেকে দামী দামী আসবাবপত্র বানায়—টিক-উড্-এর ফার্নিচারের দাম সব চেয়ে বেশি। টিক্-এর জিনিস ঢের বেশি দিন টিকে থাকে বলেই ওই কাঠের নাম টিক হয়েছে কি না তা আমি বলতে পারব না।'

'তা তোর দাদুর টিকের সঙ্গে তামাকের সম্পর্ক নেই তা বুঝলাম, কিন্তু আমাদের কী সম্পর্ক তা তো সঠিক বুঝতে পারছি না, দাদা!' বলল শৈলেশ।

'দাদুর নিজের ছেলেপুলে বলতে কেউ নেই, আছে কেবল অগাধ টাকা, লোকটা কী ধরনের জানিস? সেই যে, মারা গেলে কাগজে ছবি ছেপে বেরোয়—আর লেখা থাকে—ও'র খুব দান-ধ্যান ছিল, যেমন পরোপকারী তেমনি দাতা, দেশহিতৈষী মহাপুরুষ, কত লোককে—কত পরিবারকে গোপনে তিনি নিয়মিত অর্থসাহায্য করতেন—ইত্যাদি লেখে না?'

'সে মারা যাবার পর জানা যায়, জ্যান্ত থাকতে টের পায় না কেউ!' আমি প্রকাশ করি।

'এখানে জ্যান্ত থাকতেই জানা যাচ্ছে। জলজ্যান্ত দৃষ্টান্ত আমার দাদু। তিনি চান বাঙালীর ছেলেরা ব্যবসা-বাণিজ্য ক'রে নিজের পায়ে খাড়া হোক সবাই, তিনি নিজে যেমনটি

দাঁড়িয়েছেন। সেইজন্যে কেউ গিয়ে ব্যবসার জন্য তাঁর কাছে টাকা চাইলে তক্ষুনি তিনি মূলধন দিয়ে সাহায্য করেন—এমনিতেই।'

'বলিস কীরে?'

'তবে আর বলছি কী! আমার এক মামাত ভাই ব্যবসা করবে বলে বেশ কিছু টাকা বাগিয়ে এনেছে তাঁর কাছ থেকে।'

'কাঠের ব্যবসা?'

'না, কাঠ নয়, কাটলেটের। বলছে যে বিক্রি না-হয় নাই হবে, নিজেই খেয়ে কাটিয়ে দেবে সব। পয়সা দিয়ে এজন্মে আর কাটলেট কিনে খেতে হবে না তাকে। ব্যবসাটা মন্দ নয় কিন্তু।' বলল ভোলানাথ।

'সে বুঝি কাটলেট খায় খুব?' জানতে চায় শৈলেশ। 'কাটলেট খেয়েই কাটায়?'

'কাটলেটের ব্যবসা করেছে বুঝি?' সঙ্গে সঙ্গেই আমার সোৎসাহ প্রশ্ন। 'কোথায় করেছে? তার সেই দোকানটা কোথায় রে?'

'কাটলেট না কচু! সিনেমা দেখেই ফুঁকে দিচ্ছে টাকাটা। কেবল রোজ চারটে করে দিলখোস কেবিনের কাটলেট কিনে নিজের দোকানের ব'লে পাঠিয়ে দেয় দাদুকে। দাদু ভারী খুশী। বলছে যে কলকাতায় ভিন্ন-ভিন্ন জায়গায় ব্র্যাঞ্চ খুলতে আরো আরো টাকা সাহায্য করবে তাকে।'

'ভারী কাটথ্রোট তো!' আমি বলি 'না না, তোর দাদুকে বলছি না—তোর ঐ মাস্তুতো ভাইটা।'

'মাস্তুতো নয়, মামাত ভাই। মাস্তুতো বলে অপমান করছিস আমায়?' ভোলানাথের গোসা হয়।

'ওই হোলো। মাসীর গোঁফ বেরুলেই তো মামা।' আমি এই বলে ওকে সান্ত্বনা দিই।

'তাহলে তুই যাচ্ছিস নে কেন?' শুধায় শৈলেশ ঃ 'তুই গেলে তো অনেক বেশী টাকা পাবি। তোর দাদু যখন বলছিস।'

'না, আমি গেলে হবে না। আমি তার আপন খুড়তত মেয়ের ছেলে যে, বলছি না যে লোকটা ভারী পরোপকারী? পরের উপকার করে, নিজের লোকের জন্যে কিছু করে না।'

'নাতিরা বৃহৎ হোক চান না বুঝি?' আমি বলি, 'তাদের নাতিবৃহৎ থাকাটাই তিনি পছন্দ করেন?'

'তুই বরং যা।' বাতলায় সে আমায়, 'তুই তো দাদুর কেউ নোস—যাকে বলে কাকস্য পরিবেদনা। তুই গেলে দেবে ঠিক।'

'কিন্তু কী ব্যবসার কথা বলব, বল্ তো?'

'যা মাথায় খেলে, যা মনে আসে তখন। ব্যবসার নাম শুনলেই দাদু অজ্ঞান। টাকা তো

দেয়ই, খাওয়ায় আবার। খুব খাওয়ায়, বলল আমার মামাতো ভাই। কেউ কিছু খেলে খুব খুশী হয় নাকি। খুশী হয়ে টাকা দেয় তখন।'

"বলিস্ কী রে?" বলে জিভের জল টানি।

'বলিস্ কী রে?' বলে জিভের জল টানি, 'সে কথা বলতে হয় আগে।'

সেদিন বিকেলেই বেরিয়ে পড়লাম ভোলানাথের দাদুর দিশায়। ততটা টাকার লোভে নয়, যতটা ভালোমন্দ চাখার লালসায়। সত্যি বলতে চমচম, ছানার গজা, ল্যাংচা, পান্তুয়া, লেডিকেনি, দরবেশ, শোনপাপড়ি, সন্দেশ, রাজভোগ, মতিচুর তারাই আমায় মুক্তারামের মুক্ত আরাম ছেড়ে অতিদূরে আহিরীটোলায় টেনে নিয়ে গেল কান ধরে হিড়হিড় করে। নাম্বার খুঁজে বাড়ি বার করতেও দেরি হল না খুব।

বিরাট বাড়ি। অবারিত দ্বার। সোজা উপরে উঠে গেলাম। দোতলার সামনের ঘরেই সৌম্যদর্শন বয়স্ক এক ভদ্রলোককে সোফায় বসে থাকতে দেখলাম। আমাকে দেখে তিনি শুধালেন, 'কে তুমি?'

'আজ্ঞে, আমি ভোলানাথের মামাতো ভাই।' জবাব দিলাম, 'আপনার নাতি শ্রীমান ভোলানাথ।'

'ও!...তা, ভোলানাথ তো ঠিক আমার আপন নাতি নয়।...মানে, আমি বলছিলাম কি যে ঠিক পৈতৃক নাতি নয় আমার।'

'পৈতৃক নাতি!' আমার বিস্মিত কণ্ঠ থেকে বেরয়। পৈতৃক সম্পত্তি হয় আমি জানতাম। পৈতৃক নাতি হয় আমার জানা ছিল না।

'পৈতৃক নাতি, মানে, বাবা আমার বিয়ে দিয়ে গেলে নিজের বৌয়ের মেয়ের ছেলে হলে যাকে বলা যেত। আমি তো বে থা না করেই

রেঙ্গুনে পালিয়ে গেছলাম যৌবনে—ব্যবসা ফাঁদতে। ভোলানাথ হচ্ছে আমার খুড়তত ভাইয়ের শালীর ছেলে।'

'তাহলে অবশ্যি তাকে সহোদর নাতি বলা যায় না সত্যি।'

সায় দিতে হয় আমায়।

'তাই বলছিলাম তুমি ভোলানাথের কী রকমের মামাতো ভাই?'

'আমি...আমি...আমি...' আমতা আমতা করি। আমার আমিত্ব আমায় ছাপিয়ে উঠে আত্মপ্রকাশের বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

'সেদিন ভোলানাথের এক মামাতো ভাই এসেছিল কি না, রাখহরি না কী যেন নাম। বলল যে সে-ই ভোলানাথের একমাত্র মামাতো ভাই, আবার তুমিও বলছ...'

'আজ্ঞে, একটু ভুল হয়েছে,' শুধরে নিই আমি, 'আমি নই, ভোলানাথই হচ্ছে আমার মামাতো ভাই। গুলিয়ে ফেলেছিলাম আমি। আমি হচ্ছি ওর পিসতুত ভাই।'

'তাই বলো!' শুনে তিনি ঠাণ্ডা হন—যেন মনের শান্তি খুঁজে পেলেন তিনি। 'তোমার নামটি কী?'

'আজ্ঞে আমার নাম থাকহরি।'

মামাতো আর পিসতুতো দুই ভাইয়ের নামের দুটো পিস মিলিয়ে আমি বিশ্বাসযোগ্য করে দিই।

'আমার খুড়তুতোরা আশ্চর্য! তা, ভাইয়ের বংশে তো দেখছি হরিনামের ছড়াছড়ি! তার নামও ছিল আবার রামহরি।' বলে তিনি আরামের নিঃশ্বাস ফেললেন, 'তা তুমি কি কিছু খেয়ে টেয়ে বেরিয়েছ বিকেলে?'

'আজ্ঞে...' বলে আমি চুপ করে থাকি। এ-কথার আর কী জবাব দেব? সত্যি বললে বলতে হয় যে এখানে এসে বেশ করে সাটাবো বলে সেই সকাল থেকে দাঁতে কুটোটি দিয়ে পড়ে আছি। কিন্তু ভোলানাথের কথাটা দেখছি মিথ্যে নয় নেহাত। টাকার কথাটা না পাড়তেই তিনি খাবার কথাটা পেড়ে বসেছেন।

আহিরীটোলার বিখ্যাত সন্দেশের আশায় উল্লসিত হয়ে উঠেছি। তিনি এসে আমার নাকের ডগা টিপে ধরলেন।

এ কী! খাবার নাম করে হঠাৎ আমার এই নাকমলা কেন? চমকে উঠতে হয়। এরপর আবার কানমলা খেতে হবে নাকি?

তারপর ঠোঁটে হাত ঠেকিয়ে বললেনঃ 'ঠাণ্ডা!...দেখি, তোমার হাত দেখি।'

আমার হাতটা নিজের হাতে নিয়ে বললেন, 'হাতও ঠাণ্ডা দেখছি। ভাল কথা নয়। রক্তের চাপ কমে গেছে খুব।'

তারপর তিনি আমার পায়ে হাত দিতে এগুচ্ছেন দেখে আমি তিন পা পিছিয়ে এলাম,

'এ কী! আপনি আমার বাপের বয়সী হয়ে আমার পায়ের ধুলো নেবেন সে কি হয়? আমি একটা পুঁচকে ছেলে!'

'তোমার পায়ের ধুলো নিতে যাব কেন হে! আঙুলের ডগাগুলো ঠান্ডা কিনা দেখছিলাম তাই!...দেখলাম যে একেবারে কিছুটি না খেয়ে রয়েছ! অনেকক্ষণ থেকে তোমার পেটে কিছু পড়েনি। চার পাঁচ ঘণ্টা না খেয়ে থাকলে রক্তের চাপ কমে যায় কিনা। দেহের প্রান্তসীমাগুলো ঠান্ডা মেরে আসে, হাতপার আঙুল, ঠোঁট সব হিমশীতল হয়ে যায়। কিছু খেলেই ফের রক্তের চাপ বেড়ে গিয়ে তক্ষুনি সব গরম হয়ে ওঠে আবার। দাঁড়াও, তোমাকে আগে কিছু খাবার দিই —খাও আগে।'

বলে তিনি থার্মোফ্লাস্ক থেকে একটা গেলাসে গরম জল ঢাললেন, তারপর একটা কৌটোর থেকে সাদা গুঁড়ো মতন কী একটা জিনিস ঢাউস চামচের বড় বড় তিন চামচ নিয়ে গুললেন সেই জলে। তারপর গেলাসটা এগিয়ে বললেন—'নাও, খেয়ে ফ্যালো ঢক করে।'

সুবোধ বালকের মতন ঢক ঢক করে গিলে ফেললাম কোনরকমে।

'কী রকম খেতে?'

'বিচ্ছিরি! তেতো! আমার তো কোনো অসুখ করেনি, ওষুধ খেতে দিলেন কেন আমায়?'

'ওষুধ নয়, প্রোটিনেক্স্ এর নাম। প্রোটিন কাকে বলে জানো? মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, ছানা—এই সব হচ্ছে প্রোটিন। সেইসব প্রোটিনের সারভাগ বৈজ্ঞানিক উপায়ে নিষ্কাষিত করে বিচূর্ণিত অবস্থায় কৌটায় সংরক্ষিত। নেমন্তন্ন বাড়ি গিয়ে মানুষ যত মাছ, মাংস, ডিম, আর সন্দেশ সাঁটতে পারে, পুরো তিন চামচে তুমি তার সারাংশটা সব খেলে এখন।'

'একটা পুরো ডোজ খেলাম? বলেন কি?' চোখের ওপর ভোজবাজি দেখে আমার তাক লেগে যায়।

'হুবহু। তবে জিনিসটা দুধে মিশিয়ে খাওয়াই দস্তুর। কিন্তু দুধ এখন পাচ্ছি কোথায়? হরলিক্স্ দিয়ে খেলেও হত। কিন্তু গোয়ালিনী মার্কা জমাট দুধের কৌটোও খালি, হরলিক্স্ও নেই। তাই গরম জলে বানিয়ে দিলাম। তবে একটুখানি চিনি মিশিয়ে দিলে হত হয়তো। নাও, হাঁ করো।' বলে এক চামচ চিনি আমার মুখগহ্বরে ঢেলে দিলেন তিনি।

'চিনি খেলে এনার্জি হয়। গ্লুকোজ খেলে আরও বেশি হয় অবশ্যি। গ্লুকোজ হচ্ছে চিনির সাব্স্ট্যান্স। এইবার, ভিটামিন বাড়ি খাওয়ানো যাক গোটাকতক। খাবার পরেই খেতে হয় কি না ওসব! খালি পেটে খাওয়ার নিয়ম নয় তো।'

এরপর তিনি একটা ছোটো শিশির ভিতর থেকে লাল লাল দুটি কী যেন বের করলেন

—'এ হচ্ছে অ্যাডক্সলিন। ভিটামিন এ আর ডি। এ খেলে চোখ ভালো থাকে। হাড়ের শক্তি বাড়ে। কব্জি মোটা হয়, দাঁত শক্ত হয়। নাও, খেয়ে ফ্যালো টুক করে।'

চিনি খাবার পর আমার এনার্জি হয়েছিল সত্যিই। বাধা দিয়ে বললাম, 'আমার চোখ এমনিই বেশ ভালো। দাঁতও খুব শক্ত।'

'এখন আছে—এর পর বয়েস হলে নড়বড় করবে তো! কিন্তু তুমি যদি যাবজ্জীবন ভিটামিন এ আর ডি খেয়ে যাও তো বয়েস হলেও তোমার দাঁত কক্ষনো নড়বে না। চোখেও ছানি পড়বে না। এই দ্যাখো না, অষ্টাশী বছর বয়স, আমার দাঁত দ্যাখো।' বলে তিনি তাঁর দাঁতের দুপাটি বিকশিত করলেন।

তাঁর দন্তবিকাশ দেখেও আমার তেমন উৎসাহ হল না। বললাম, 'প্রোটিন তো খেলাম আবার কেন? ওতেই হবে।'

'তা কি হয়? প্রোটিনে তো খালি মাংসপেশী গজায়। পেশীর তন্তুরা গড়ে ওঠে। হাড় কি তাতে হবার? হাড় হয় ডি-ভিটামিনে। আর এ-ভিটামিনে হয় চোখ তাজা। দুধে আছে ঐ দুই ভিটামিন। এক পিপে দুধ খেলে যতটা এ-ডি পাওয়া যায়, দুটি ক্যাপসুলে তুমি তাই পাবে। এই নাও, দেরি কোরো না, গিলে ফ্যালো চট করে'। সঙ্গে সঙ্গে খাবার নিয়ম।' বলে বড়ি দুটো একরকম জোর করে তিনি আমার মুখের মধ্যে গুঁজে দিলেন।

দুধের পিপাসা আমার কোনদিনই ছিল না, পাছে আবার এক পিপা তাই এসে হাজির হয় সেই ভয়ে মুখ বুজে গুলি দুটো গিললাম।

'এবার হজম করার পালা। এইসব হজম করার জন্য বি-ভিটামিনের দরকার পড়ে। বি-কম্প্লেক্স খাওয়াই তোমায় এবার...।'

হজম করার পালা শুনেই আমার পিলে চমকে গিয়েছিল, পালার জায়গায় আমি যেন ঠ্যালা শুনলাম। খাবার ঠ্যালার পরে এখন হজম করার ঠ্যালা! তাড়াতাড়ি বললাম—'ওষুধের কোন দরকার নেই আমার। এমনিতেই বেশ হজম হয়!'

'বললেই হল—এমনিতেই কিছু হয় না। দাঁড়াও, তোমায় হজম করাই। হজম করা কি সহজ ব্যাপার হে! এই যে বি-কম্প্লেক্সের বড়ি দেখছ—কম্প্লেক্স্ বি-ফোর্ট্! কম্প্লেক্স্ মানে একটা গ্রুপ, বি-ভিটামিনের সম্প্রদায়। এর ভেতর আছে একাধিক বি-ভিটামিন—বিভিন্ন কাজ এদের। বি-ওয়ান্ হচ্ছে বেরিবেরির ওষুধ, বাতও তাতে আটকায়।'

বাধা দিয়ে বলি, 'আমার বেরিবেরি হয় নি। বাত কখনো হয় না।'

'হয় না, কিন্তু হতে কতক্ষণ? বাত হলেই তোমায় চিৎ করে ফেলবে, বিছানা থেকে উঠতে দেবে না। তারপর আর কোন বাতচিৎ নেই, কাজেই তার আগেই...প্রিভেনসন্ ইজ বেটার দ্যান কিওর......বলে থাকে শোনোনি? তারপর, বি-টু-ফোর এদেরও নানান গুণাগুণ আছে তার বিশদ

ব্যাখ্যানের দরকার নেই, তবে তোমাদের এখন ছাত্রজীবন—বি-সিকস—মানে, পাইরোডিক্‌সিন—এটা খাওয়া তোমাদের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। এতে মেমরি বাড়ায়। বি-টুয়েলভ হচ্ছে রক্তবর্ধক।'

রক্তের জন্য আমার কোনো জিঘাংসা ছিল না, তবে মেমরিতে বড্ডোই কাঁচা—তাই একটু প্রলুব্ধ হয়ে হাত বাড়ালাম, 'দিন তাহলে, দুটো বড়ি দিন, খাই। কিংবা গোটা চারেক দিন না হয়। মেমরিটা আমার চট্‌পট্‌ বাড়াতে চাই।'

'বাঃ, এই তো বেশ! লক্ষ্মী ছেলের মতন কথা। চারটে কেন, ছটা খাও! এনতার আছে। পুরো এক শিশি দিয়ে দেব তোমাকে।'

বি-ভিটামিন খাইয়ে তিনি বললেন—'এইবার সি-ভিটামিনটা খেলেই সম্পূর্ণ হয়ে যায়! এ-ডি আগেই খেয়েছ, বি-ও খেলে, এবার সি। ৫০০ মিলিগ্রামের এক বড়ি রোজ একটা খেলেই যথেষ্ট।'

এত গুলো বড়ি খেয়ে কান আমার ঝাঁ ঝাঁ করছিল—তারপর ৫০০ মিলিগ্রামের সি-য়ে আমি হাবুডুবু খেতে লাগলাম আর তিনি বলে চললেন, 'আরো সব ভিটামিন রয়েছে, ই, কে, ইত্যাদি—সে সব খাবার তোমার দরকার নেই। প্রোটিন হল, কার্বোহাইড্রেট হয়েছে। এবার কিছু ফ্যাট। তাহলেই হয়ে যায়। তোমার খাওয়াটা কমপ্লিট হয়।' ফ্যাট বলে না ফট্‌ করে দেরাজ থেকে তিনি একটা পেল্লায় বোতল বার করলেন—'এই হচ্ছে ফ্যাটের সেরা ফ্যাট। খাঁটী কডলিভার তেল।'

কডলিভার শুনেই না আমি চমকে উঠেছি! ভোজের পারাবার পার না হলে আর টাকার কথাটা পাড়া যাবে না। তাই হাবুডুবু খেয়েও কোনোরকমে সাঁতরেছি, এবার আবার কডলিভারের কথায় কাতরে উঠলাম।

তিনি বলছিলেন, 'এই কডলিভারের তিন চামচ, আর তার সঙ্গে গ্রেন দুই কুইনিন—মিশিয়ে খেলেই, কডলিভার প্লাস কুইনিন—যেমন খাদ্য তেমনি একটা বলকর টনিক।'

টনিক-এর নাম শুনেই আমি টন্‌কো হয়ে উঠলাম। গা বমি বমি করতে লাগল আমার। পাছে ভোলানাথের দাদুর গায়েই বমি করে বসি—তাই সেই বমিবিং-শুরু হবার আগেই তিন লাফে সিঁড়ি টপকে ফুটপাথে নেমেই আমার ওয়াক্‌!

সেই ওয়াক্‌-এর সঙ্গে সঙ্গে যাবতীয় প্রোটিন ভিটামিন ইত্যাদি, এমন কি যে কডলিভার খাইনি তারও খানিকটা বেরিয়ে গেল আমার। অন্নপ্রাশনের পরমান্ন সহ।

তারপর সেখান থেকে সটান আমার ওয়াকিং শুরু। উঠলাম এসে সোজা ভোলানাথের আস্তানায়।

'এই তো দাদু! এমনি সে খাওয়ায়? খাইয়ে নাকি খুশী হয় আবার। খুশী হয়ে টাকা দিয়ে থাকে! তোর দাদুর নিকুচি করেছে...ধেৎ ধেৎ!'

আমি তাকে মারতে বাকী রাখি কেবল।

আগাগোড়া সব সে কান দিয়ে শোনে, তারপর মাথা নাড়েঃ 'রাখহরি কি তাহলে মিছে বলেছে? মিথ্যে কথা বলার ছেলেই নয় সে। পাক্কা বিজনেস ম্যান।'

'রাখহরির কথা রাখ্।' যা রাগ হয় আমার রাখহরির ওপর।

'সব কটা খাবার সে মুখ বুজে খেয়েছিল। প্রত্যেকটা আইটেম চেয়ে চেয়ে নিয়েছে আবার। চেখে চেখে তারিয়ে তারিয়ে খেয়েছে। কডলিভার প্রায় দশ চামচ গিলেছিল—বিশ গ্রেন কুইনিন তার ওপর। চামচটা অব্দি চেটেপুটে খেয়েছে। তবে না খুশী হয়েছে আমার দাদু! তখন না দিয়েছে টাকা। বলেছে যে আবার এসে খাবে—যখন খুশী—যত খুশী—যা তোমার প্রাণ চায়। ফের ফের টাকা দেব তোমায়। আর তুই খেলিই না তো কী হবে! ভোজন করলে তারপর তো দক্ষিণার কথা—তখন তো তোর ভোজন-দক্ষিণা!'

গজগজ করে ভোলানাথ গঞ্জনা দেয় আমাকে।

বাজিকরের ডিগবাজি!

মলয়-কাহিনীও বলা যায়, প্রলয়-কাহিনীও বলা যায়—মলয়ের জীবনে সে এক প্রলয়কাণ্ড! অদ্ভুত এক অভিজ্ঞতা।

মধুপুর শহর ছাড়িয়ে তার বাগানবাড়িটা—গাঁয়ের গায়ে গায়ে। এধারের গেঁয়ো লোকেরা জায়গাটাকে বলে দেহাত। তা, সে এখানে আছেও বড় কম দিন না। আর, যতোদিন আছে পাশের পোড়ো বাড়িটাকে ঠিক ওই রকমই দেখে আসছে।

পাশের বাড়িটাও বাগানবাড়ি। তার নিজের বাগানের সঙ্গে মাঝখানে একটা বেড়ার মাত্র ফারাক। কিন্তু ওই বাড়িটার যেমন বিশ্রী দশা, বাগানের হালও তাই। নোংরামির কোথাও কিছু কমতি নেই। সারা জমিনভরা ভাঙা বোতল আর ছেঁড়া জুতোর ছড়াছড়ি—আর যতো রাজ্যের চামচিকের আড্ডা বাড়িটায়।

মলয়ের হচ্ছে সবজি বাগান। তার শাকসবজির শখ। বাগানের পেছনে সে যথেষ্ট ব্যয় করে, ব্যায়ামও কিছু কম করে না। ফুলকপি আর বাঁধাকপি, ওলকপি আর গোল আলু, বিলিতী বেগুন আর স্বদেশী পটল—সবই ফলে তার বাগানে। আর তাই ফলিয়েই তার ফলাও কারবার।

পাশের বাড়িটার গেটে একটা নামের ফলক আছে, আসতে যেতে তার নজরে পড়ে। সেই

ফলক থেকে বাড়িটা যে কার তা আবিষ্কার করার সে চেষ্টা করেছে, কোন ফল হয়নি। সময়ের অত্যাচারে তার অক্ষরগুলো ধুয়ে মুছে গেছে, মালিকের নাম বোঝার উপায় রাখেনি! তবুও কয়েকটা হরফ হয়তো পড়া যায় ঃ যা ×××গ××গে××—ছাড়াছাড়ি আড়াআড়ি-ভাবে সাজানো। এইতো নামের দশা! তার দশটা অক্ষরের মধ্যে সাতটাই উপে গেছে, তিনটি মাত্র উপস্থিত—কিন্তু তার থেকে আড়ালের উপেন্দ্রনাথের পাত্তা পাবার উপায় নেই। পাবার চেষ্টাও করেনি সে——'যা-গ-গে' বলে ছেড়ে দিয়েছে।

কিন্তু সেদিন বেড়িয়ে ফিরবার মুখে সে অবাক হয়ে দেখল, নতুন নামের ফলক ঝুলছে বাড়িটায়। সাবেক নামাবলীর জায়গায় ঝকঝকে অক্ষরে জ্বলজ্বল করছে—নতুন শিলালিপি! যাদুকর গণেশ গোস্বামী! বাড়িটারও আগের সেই বেহাল নেই, বেশ তকতকে নয়া চেহারা। পুরোনো মালিক ফিরেছেন তাহলে এতদিনে!

এতদিনে একটা পড়শি এসে জুটলো! কিন্তু মলয় খুব খুশী হতে পারল না। স্বভাবতই সে একটু অমিশুক, সেইজন্যেই শহরের লোকজনের আওতা থেকে দূরে এই দেহাতে এসে আস্তানা গেড়েছে। প্রতিবেশীদের প্রতি বেশি উৎসাহ তার কোনদিনই নেই। মানুষের চেয়ে সে এইসব নিরীহ নির্জীব শাকসবজিদের বেশী পছন্দ করে। মানুষের সঙ্গে মিশতে গেলে বড্ডো কচকচি, তার চেয়ে এই কচু ঘেঁচুর সঙ্গই ভালো। মানুষ মোটেই 'বড়িয়া' নয়, তাদের 'থোরাই আচ্ছা'—বেশীর ভাগই খারাপ। তার চেয়ে এই থোর বড়ি খাড়া—ঢের উমদা, উপাদেয়। চোখে দেখতেও আর চেখে দেখতেও।

কিন্তু পড়শী আলাপী হলে আত্মরক্ষা করা দায়। বিকেলের দিকে জমি কোপাচ্ছে মলয়, এমন সময় বেড়ার ওধার থেকে সাড়া এলোঃ "নমস্কার! আমার নাম শ্রীগণেশ গোঁসাই। মশায়ের নামটি কি জানতে পারি?"

"মলয়।" সংক্ষেপেই সে সারলো। বেশি বাহুল্য না করে।

"মলয়? বাঃ, বেশ নাম তো! বেশ মিষ্টি নাম। খাসা নাম বলতে হয়!" তারিফ করলেন গোঁসাই ঠাকুরঃ "এরকম নাম হলে নামজাদা হওয়া মোটেই শক্ত না।"

পাছে আলাপ জমে যায় সেই ভয়ে মলয় আর কথা বাড়ালো না। নিজের মনে আপনার বাগানের কাজে লেগে রইলো। গণেশবাবুও সেদিন ওর বেশি আর এগুলেন না।

পরদিন সকালে মলয় বাঁধাকপিদের তদারক করছে, ঘাড়ের পিছন থেকে শুনতে পেলোঃ "এই যে, প্রাতঃ প্রণাম!"

"প্রণাম।" বল্লো মলয়। বলেই তার মনে হোলো জবাবটা যেন একটু খাটো হয়ে গেল, গণেশবাবু হয়তো কিছু মনে করতে পারেন। এই ভেবে একটু অমায়িক হাসি মুখে নিয়ে সে ফিরে তাকিয়েছে, কিন্তু কই, বেড়ার ওধারে তো উনি নেই! এধারে ওধারে কোনো ধারেই না! এই কথা কয়ে আবার ফের গেলেন কোথায়!

কিন্তু দেখা না পেলেও তাঁর আওয়াজ মিললোঃ "আহা, আজকের সকালটি কি চমৎকার! বেশ ঠান্ডা ঠান্ডা, কী বলেন?"

"হ্যাঁ, বেশ ঠান্ডা। কিন্তু আপনি কোথায়? আপনাকে দেখতে পাচ্ছিনে তো।"

"এই যে! আপনার নাকের সামনেই রয়েছি তো!"

মলয় চমকে উঠে তিন হাত পিছিয়ে যায়—তাই তো! তার নাকের এক হাতের মধ্যেই গণেশ গোঁসাই দাঁড়িয়ে। তার নিজের নাকের মতই সমান খাড়া! এই বয়সেই কি চোখের দোষ ধরলো, চশমা নিতে হবে নাকি—মলয় ভাবতে থাকে।

"মাঝে মাঝে আমি এমনি গা ঢাকা দিই, কিছু মনে করবেন না। বহুৎ দিনের বদ অভ্যাস চেষ্টা করেও সারাতে পারিনে।" গণেশ গোস্বামী ত্রুটি-স্বীকারের সুরে জানান।

"বাঃ, বাঁধাকপিগুলো তো খাসা। আপনার হাতে সোনা ফলে দেখছি।" গোঁসাই মশাই কথায় কথায় বলেন।

মলয় বিস্মিত হয়ে দ্যাখে, সত্যিই! যথার্থই তার হাতে সোনা ফলেছে। বাঁধাকপিগুলো যেন চকিতের মধ্যেই সবুজ রঙ পালটে সোনার তাল হয়ে দাঁড়ায়। এমনকি, তার নিজের আঙুল-গুলো অব্দি সোনালী বলে মনে হতে থাকে। মলয় অস্বস্তি বোধ করে। ভারী বিচ্ছিরি লাগে তার।

"এই দেখুন, আর এক ফ্যাসাদ! নাঃ, এবার থেকে আমায় হুঁশিয়ার হতে হবে। কথা-বার্তায় কড়া নজর রাখবো—না, মশাই না, আপনার হাতে সোনা ফলে না। তাছাড়া আপনার আঙুলগুলিও কিছু আপনার নিজের হাতের ফল নয়। ওগুলি কেন সোনার হতে যাবে বলুন, কোন দুঃখে?"

সঙ্গে সঙ্গে মলয়ের আঙুলেরা আগের চেহারায় ফেরত আসে—কপিগুলিও সবুজ রঙ ফিরে পায় ফের। মলয় হাঁফ ছাড়ে।

"আমার ঠাকুরদাও ঠিক এমন কান্ড বাধাতেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভার যাদুকর ছিলেন তিনি, তাঁর কাছেই আমার এই ভেলকি শেখা তো! একদিন তিনি কী করেছিলেন বলি তাহলে। কৃষ্ণচন্দ্রের গোপাল বলে এক মোসায়েব ছিলো, একদিন সে আমার ঠাকুর্দাকে বললো, ঠাকুর মশাই, আমাকে রাজার ভাঁড়ার করে দিতে পারেন? ধনরত্নের আন্ডিল হয়ে যাই, কোনো আর দুঃখু থাকে না আমার! শুনে আমার ঠাকুর্দা স্বর্গীয় শ্রীশ্রীমুকুন্দ গোঁসাই বল্লেন, তথাস্তু। তুমি রাজার ভাঁড় হয়ে যাও। অমনি গোপাল মহারাজের সামনে একটা মাটির ভাঁড় হয়ে গেল। রাজা বল্লেন, মুকুন্দ ঠাকুর, তুমি করলে কী! ঠাকুর্দা কন, করব কী মহারাজ, মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল—কী করি? কী বলতে কী বলে ফেলেছি! ভাঁড়ার বলতে ভাঁড় বলে ফেল্লাম, কী হবে! চেয়েছিলো ঐশ্বর্যের ভাঁড়ার হতে—হয়ে গেল ভাঁড়ে ভবানী। সবই অদেষ্ট হুজুর! এই বল্লেন ঠাকুর্দা। রাজা বল্লেন, তা তো হোলো, এখন আমার গোপালকে মানুষ করতে হলে—কী উপায়?

ঠাকুর্দা ঘাড় নাড়েন, বামুনের বাক্যি কি বিফল হবার? নড়চড় হবার জো কী? তাঁরা আবার ছিলেন সে যুগের বামুন! তাঁদের কথার কোনো অন্যথা হবার যো ছিল না। এখন সেই সভায় ছিলেন আরেক পণ্ডিত লোক, নাম তাঁর ভারতচন্দর। তিনি অভিধান ঘেঁটে ঘুটে বল্লেন, ভাঁড় মানে রসিক ব্যক্তিও বুঝিয়ে থাকে, গোপাল কেন তাই হয়ে যাক না! ঠাকুর্দা তখন বললেন, গোপাল, তাহলে তুমি সেই ভাঁড় হও। তখন আবার গোপাল নিজের কলেবর ফিরে পায়। কিন্তু পেলে কি হবে, তার ভাঁড়ত্ব গেলেও, ভাঁড়ামি তো গেল না। সেই গোপালভাঁড় হয়েই থাকতে হোলো তারপর।"

কী সব আবোল তাবোল বকছে গণেশ? একটা বর্ণও যদি তার মাথায় ঢোকে। কিন্তু নাই ঢুকুক, সমস্ত ব্যাপারটাই ভারী বিদঘুটে লাগে তার। এ সব কী? সোনার মত কান্তি অনেকে পছন্দ করে বটে, মারীচ সাধ করে স্বর্ণমৃগ হতে গেছল, কিন্তু নিজের স্বহস্তে সেই Richness পেয়েও, এই মারীচিকা, আদৌ তার ভালো লাগে না—উলটে আরো রাগ হয়।

"বলুন তো এসব কী?" সে দাবী করে বসে ঃ "মানে কী এর? বলা নেই, কওয়া নেই, আমার অবোধ বাঁধাকপিদের সোনা বানিয়ে দেয়া, আমার হাত পা নিয়ে এই ভাবে খেলা করা, এরকম যা তা রঙ ফলানো—এর মানে? সোনা দামি জিনিস তা জানি, হাতে পেলে খুশী হবো তাও মানি, কিন্তু এধরনের ইয়ারকি আমার ভালো লাগে না। আর এইসব লুকোচুরি—এই আড়ালে, এই নাকের গোড়ায়—এতে আমার পিলে চমকে যায়।"

মলয় আরো বেশী বকতে যাচ্ছিলো, কিন্তু গণেশচন্দ্র বাধা দিলেন ঃ "আমার হঠকারিতা হয়ে গেছে। কিছু মনে কোরো না ভায়া! এবার থেকে আমি সাবধান হবো।"

"সাবধান হবো! আপনি কি আমাকে গাধা পেয়েছেন যে আমাকে নিয়ে যা খুশী তাই করবেন? মাথার ঘাম পায়ে ফেলা কতো কষ্টের আমার যতো শাকসবজি—যা ইচ্ছে তাই বানাবেন তাদের? কেন, ওরা কী করেছে আপনার? কী দোষ করেছে?" এই বলে রেগে-মেগে সে একটা পটল ছুড়ে লাগায় গণেশকে।

পটলটা গণেশের সামনে এসে পড়ে। "হাঃ হাঃ হাঃ, তুমি ভেবেছো যে তোমার প্রলোভনে আমি ভুলবো? প্রলুব্ধ হয়ে পটল তুলবো আমি?" তিনি হাসতে থাকেনঃ "মোটেই না। পটল আমি অনেকদিন আগেই তুলেছি। বলতে গেলে, পরলোক থেকে ডিগবাজি খেয়েই এই মরলোকে এলাম তো! আর, পটল হচ্ছে এমন জিনিস যা দুবার তোলা যায় না! পুনঃ পুনঃ তুলনীয় নয়।"

"আমার কাছে ওসব আজেবাজে বকবেন না। আমায় গোরু পাননি যে যা খুশী বুঝিয়ে দেবেন। আমার ব্যক্তিস্বাধীনতা বলে একটা বস্তু আছে। আমি গাধা নই যে আপনার ওই আহাম্মুকি—"

"গাধা নও! বটে! কিন্তু হতে কতক্ষণ?" গণেশের ভ্রূ কুঞ্চিত হয়।

অবাক কাণ্ড! বলতে না বলতে মলয় বাগানময় দৌড়তে শুরু করলো—চার পা তুলে!

লেজের জয়ধ্বজা উড়িয়ে—আস্ত গাধা একেবারে! তার ব্যক্তিস্বাধীনতা শিকেয় তুলে রেখে, সাধের শাক-সবজিদের দলিত মথিত করে মলয়ের সে এক প্রলয়কাণ্ড। ইলাহী ব্যাপার!

খটাখট্ খটাখট্ খটাখট্ খটাখট্! ফুলকপিদের মূলোচ্ছেদ করে, বাঁধাকপির বাঁধ ভেঙে, মুলোদের নির্মূল করে—সারা বাগান তার কী দাপাদাপি! নিজের ক্ষেত সে যেন নতুন করে চষতে থাকে! তার উদ্দাম আবেগের মুখে কুমড়োরা পটাশ করে ভেঙে পড়ে, লাউমাচায় আটকে তার ল্যাজটা ছিঁড়ে যায়। নিজের ল্যাজ। কিন্তু লজ্জস্বিতায় খাটো হলেও তেজস্বিতা তার একটুও কমে না।

সারাদিন ধরে সে নিজের বাগানে ঘোরে—নিজের বাঁধাকপিদের চিবিয়ে। আর চিবুতে চিবুতে ভাবে—"কী ছিলাম, আর কী হলাম। আস্ত বাঁধাকপি আসেদ্ধ খাবো, খেয়ে হজম করতে পারবো কোনদিন কি ভাবতে পেরেছি? আমার যে আবার ল্যাজ গজাবে, তাও আমার ধারণা ছিল না!"

যতই সে নিজের লেজার্ধ নাড়ে ততই সে ভাবিত হয়। দিনভর সে ঘাস চিবুলো আর ভাবলো তবু ভালো যে গাধা হতে পেরেছি! বলতেও তো পারতো লোকটা—মলয়, তুমি সমীরণ হয়ে যাও! তাহলে তো হাওয়া হতে হতো এতক্ষণ—কোথায় মিলিয়ে যেতাম কে জানে। গাধা হয়ে একটা দুঃখু আছে বটে, কিন্তু তাহলেও ভেবে দেখলে তেমন দুঃখু নেই—গাধা হয়েও জ্যান্ত আছি তো। বেঁচে বর্তেই আছি বেশ। মানুষের মতই আছি কতকটা। কিন্তু হাওয়া হলে? মলয় সমীরণের ন্যায় প্রবাহিত হয়ে গেলে? বয়ে যেতে হোতো এই বয়সেই। উচ্ছন্নে যেতে হোতো একেবারে। হোতো না কি?"

নিজেকেই সে জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু কোনো জবাব দিতে পারে না। গাধারা কি কোনো প্রশ্নের উত্তর জানে? না জানুক, তার উৎসাহ তাতে বাধা মানে না—দুঃখেই হোক আর ফুর্তিতেই হোক, মাঝে মাঝে সে আকাশভাঙা ডাক ছাড়ে—"হুকা-হু! হুকা—কাহু! হুয়া-কা—কা-হুয়া!!"

তার হাঁকডাকে সারা দেহাত কাঁপতে থাকে। অবশেষে চোখ মুছতে মুছতে গণেশ গোস্বামী নিজের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন—"ভালো আপদ হোলো তো! চোখের পাতা বুজতে দিচ্ছে না একদম। একটু আরাম করে যে দিবানিদ্রা দেবো তারও যো নেই। ওহে বাপু গর্দভচন্দ্র, তোমার সাধা গলার সা-রে-গা-মা আর সইতে পারছি না বাপ্! দোহাই, তোমার গাধাগিরি ফলিয়ে আর কাজ নাই। পুনর্মূষিকো ভব।"

চক্ষের পলকে মলয়ের গাধার থেকে ইন্দুরপ্রাপ্তি—একেবারে আস্ত একটা মূষিক! ইঁদুর হয়ে গর্তের খোঁজে ছুট মারছে, গণেশ গোঁসাই আর স্থির থাকতে পারেন না, আর্তনাদ করে ওঠেন, "এই রে! প্লেগ আনলে আবার! যা ভয় করেছি তাই। ধাড়ি ইঁদুরটা আবার আমার বাড়ির দিকেই তেড়ে যায় যে রে বাবা!"

"কিচ্ কিচ্ কিচ্!" জবাব আসে ইঁদুরের কাছ থেকে।

হাসির ফোয়ারা

"ওই রোগেই যে মরেছি একবার!" গোঁসাই মশায়ের পূর্বজন্মের (কিংবা পূর্বমৃত্যুর) কথা মনে পড়ে। ইঁদুর যতই গণেশের বাহন হোক, আর গণেশ যত বড়ই বরদাতা হোন না, বেহারী ইঁদুর 'বাংগালী' গণেশকে মোটেই বরদাস্ত করেনি—সোজা যমালয়েই বহন করে নিয়ে গেছে। স্মরণ করতেই গাল-গলাফোলা আগের মরণদশা গণেশের মনে পড়ে। অতীতের সেই ভোগান্তি উজ্জ্বল হয়ে মানসপটে ভাসতে থাকে। আতঙ্ক জাগায় আবার!

"বাবা মলয়, রক্ষে করো! আর তোমার ইঁদুর সেজে কাজ নেই বাপ্! খুব হয়েছে, এবার মানুষ হও! মানুষ হয়ে বাঁচাও বাবা!" তাড়াতাড়ি তিনি চেঁচিয়ে ওঠেন।—"সব আগে যে দুপেয়ে জানোয়ার ছিলে তাই হও বাপ্!" মলয় ততক্ষণে গর্তের মধ্যে গিয়ে সেঁধিয়েছিল, মানুষ হয়ে তাকে মাটি ফুঁড়ে উঠতে হোলো। উঠেই সটাং সে নিজের বাড়ির দিকে দৌড়ল। গণেশ গোঁসাই অবাক হয়ে ভুঁইফোড় মলয়ের কাণ্ড দ্যাখেন।

"এই রে প্লেগ আনলে রে!"

মলয় নিজের ঘরে ঢুকেই যোয়ানের নির্যাস গোটা একটা বোতল ফাঁক করে। একমুঠো সোডিবাইকার্ব একরাশ পাতি নেবুর রসে গুলে ঢক্‌ঢক্ করে খায়। তার প্রাণ তখন আইঢাই করছে—চোঁয়া ঢেঁকুর মারছে এনতার। দিনভর শালগম আর গাজোর গিলে পেট ফুলে জয়ঢাক হয়েছিলো। আস্ত আস্ত কাঁচা বাঁধাকপি হজম হবে কেন—হোলোই বা ভিটামিন? অত ভিটামিন কি ভালো? সেগুলো তার পেটে গিয়ে গজ্‌গজ্ করছিলো। গাজোরগুলো গায়ের জোর ফলাচ্ছিল কম না। আর বাঁধাকপির গোড়াগুলো—মোটা মোটা বোঁটা গুলোই তার—বিশেষ করে খোঁটা দিচ্ছিলো আরো।

হজমি খেয়ে তারপর মলয় বিছানা নিলো। সাতদিন বেহুঁশ থেকে বিছানা ছেড়ে উঠলো সে। উঠেই বাগানে হাওয়া খেতে বেরুলো। এর মধ্যে তার সবজি বাগান কারা এসে তছনছ করে গেছে—দেহাতের যত দস্যি ছেলেরাই হবে—ভাবলো সে। তাহলে কি তার ঐ অভিজ্ঞতা একেবারেই ভুয়ো—নিতান্তই দুঃস্বপ্ন? নিছক অসুখের ঘোর? তাই হবে হয়তো। কেননা

হাসির ফোয়ারা

পাশের পোড়োবাড়িটা ঠিক আগের চেহারায় দেখা দিয়েছে আবার—সদরের সাইনবোর্ডে আদ্যিকালের ঘুনধরা নামধুন—সেই যা × × × গ × × গে × × ! বেড়ার ওধারে যতো বোতলের ভাঙচুর আর ছেঁড়া জুতোর ছত্রাকার আর চারধারে চামচিকেদের চাঞ্চল্য সেইরকম! যাদুকর গণেশ গোস্বামীর চিহ্নও নেই! বাজিকর বুঝি আবার ডিগবাজি মেরেছেন—ভোজবাজি দেখিয়েছেন আবার!

যাগ্‌গে—বলে ফিরে আসতেই লাউয়ের মাচাটার দিকে নজর পড়লো! একী! গাধার এই আধা ল্যাজ এলো কোত্থেকে? আমার এখানে? এই আধখানা যে—বলতে নেই, তারই আপনার জিনিস!

একী! গাধার এই আধা ল্যাজ এলো কোত্থেকে?

ল্যাজটাকে কুড়িয়ে সে ঘরের মধ্যে নিয়ে এলো। কলমদানিতে আটকে সযত্নে সে সাজিয়ে রাখলো টেবিলের ওপর।

তার স্বোপার্জিত সম্পত্তি—নিজের ল্যাজ!

ষড়্‌ চক্রান্ত

আমার নশ্বর জীবনের ওপর দিয়ে অনেক ঝড়-ঝাপটা গেছে, তার মধ্যে অশ্বত্থামা হচ্ছে এক নম্বর। ঝড়-ঝাপটা যেমন থামানো যায় না তেমনি অশ্বত্থামাকেও কায়দায় আনা শক্ত। আবার, ঝড়-ঝাপটা শেষ পর্যন্ত আপনার থেকেই থেমে গেলেও অশ্বত্থামা কিন্তু কিছুতেই সহজে থামবার নয়।

ওকে বন্ধুরূপে লাভ করা আমার জীবনের দুর্ভাগ্যই বলতে হবে। কিন্তু যতই আমি ওকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করি, ততই যেন সে আমার চারধার থেকে তেড়ে ঘন হয়ে আসে। পদ্মার বুকে মেঘমল্লারের ন্যায় অকস্মাৎ ঘনীভূত হবার ওর আশ্চর্য ক্ষমতা।

সেদিন আপন মনে চলেছি। হঠাৎ যেন সে মাটি ফুঁড়ে গজিয়ে উঠলো সামনে। "এই যে হে!"

"বলি যাওয়া হচ্ছে কোথায়?" বলে আমি ওর পাশ কাটিয়ে যেতে চাই।

"দাঁড়াও, তোমাকে অবাক করে দিচ্ছি!" ও বলল। আমিও ঠিক এই ভয়টিই করছিলাম!—"কী কান নাচাতে শিখেছো বুঝি—কানের নাচ দেখাবে, এই তো?" আমি বললাম।

হাসির ফোয়ারা

"কান? কান কেন?" ও অবাক হয়ে যায়, "কানের আবার নাচানাচি কি? না কান নয়, কানের কোনো কথাই নয়।"

"কানের কোনো একজিবিশন্ নয় তো? ঠিক বলছো? তাহলে বলো শুনি।" আমি কান খাড়া করলাম একটু আশ্বস্ত হয়েই। বলতে কি! সেদিন একটা ছেলের আধঘণ্টা ধরে কান নাড়া দেখে—তার মতে কানের সার্কাস—আমার মাথা ধরে গেছল। এক কানের দোকানে দুবার যেতে আমার ভাল লাগে না। উৎসাহ পাই না মোটেই।

"আমি মৌমাছির চাষ করছি।" অশ্বত্থামা বলল। বেশ গুরুগম্ভীর সুরে।

ওর কথায় আমি ধাক্কা খেলাম।

"অর্থাৎ, এবার বুঝি তোমার মৌমাছি-কাণ্ড?" সামলে নিয়ে আমি বলি।

"কাণ্ড নয় কারখানা।" অশ্বত্থামা শুধরে দেয়ঃ "মৌমাছির কারখানা। তা'হলে আর বললাম কি তোমায়?" এই বলে সে উপরন্তু আরো বলেঃ "অনেকগুলো মৌমাছির কাণ্ড এক হলে মৌচাক ইত্যাদি হয়ে প্রকাণ্ড একটা কারখানা হয়। বুঝলে?" সে আমাকে বিশদ করে দেয়।

"বুঝলাম।" আমি মাথা নাড়িঃ "কিন্তু দুনিয়ায় এতো রকমারি থাকতে মৌমাছির কারখানা কেন আবার?"

"বঁড়শিকে চেনো? চমৎকার ছেলে। তার বাবার আছে মৌমাছির কারখানা। অনেকগুলো গাছে তাদের চাষ আবাদ, তারই একটা গাছ—"

"তোমাকে গছিয়ে দিতে চায়?"

"হ্যাঁ, বেচারার কিছু টাকার দরকার পড়েছে। বাবা বলেছে, যা মৌচাক বেচে নে গে। আর আমিও ভাবছিলাম কি করি কি করি! কাজ-কারবার করাটা কি মন্দ কিছু?"

"না, না, মন্দ কি!"

"চলেছি বঁড়শির কারখানায়। তুমিও এসো না আমার সঙ্গে। মৌচাকগুলো কেমন দেখবে। দেখলে বুঝতে পারবে—তুমি তো একজন সমঝদার লোক।"

সমঝদার কিনা জানি না, তবে মৌচাকের সঙ্গে আমারও একটু সম্পর্ক ছিলো বটে! মাঝে মাঝে তাতে লিখে থাকি। কাজেই কৃতজ্ঞতা সূত্রে যাওয়াটা দরকার বোধ করলাম।

শহরের বাইরে কারখানাটা। কারখানা মানে বাগান। বাগানের কাছাকাছি বঁড়শিকে পাওয়া গেল। গুলতি দিয়ে পাখি মারার তালে ঘুরছিল। অশ্বত্থামা বলল, "এসো তোমাদের আলাপ করিয়ে দিই। এই হচ্ছে—"

"আমি বঁড়শি।" বাধা দিয়ে ছেলেটি নিজের থেকেই বলে।

"আমি জানি।"

"মৌচাক দেখবেন, না-কি আগে মধু দেখবেন?" বঁড়শি জানতে চায়।

হাসির ফোয়ারা

"মধু? মধু কে? তোমার কোনো বন্ধু বুঝি?" বলে অশ্বত্থামা আমার দিকে তাকালোঃ "তা দেখতে শুনতে যদি মন্দ না হয় আপত্তি কি?"

"সে মধু নয়। সেই মধু যা নাকি মৌমাছিরা দিয়ে থাকে।" বঁড়শি জানায়।

"অ্যাঁ, মধু কি মৌমাছিরা দেয়! তাই নাকি?" অশ্বত্থামা অবাক্ হয়ে যায়, "জানতাম না তো। আমার ধারণা ছিলো মৌমাছির থেকে মৌচাক, আর মৌচাকের থেকে আমরা মোম পেয়ে

মৌচাক দেখবেন, না-কি আগে মধু দেখবেন? [পৃঃ ৩২

থাকি। আর সেই মোমের থেকে মোমবাতি হয়। আর তাই থেকেই মৌমাছির কারখানার লাভ। এই আমি জানতাম।"

"হ্যাঁ, সে লাভ তো আছেই। মধু হচ্ছে তাছাড়াও একটা বাড়তি জিনিস। আর খুব

খারাপ জিনিস নয়।" বঁড়শি একটু কিন্তু কিন্তু হয়ে মৌমাছিদের পক্ষে সাফাই গাইতে চেষ্টা করে।—"সেটাকে উপরি লাভ বলে ধরতে পারেন।"

"খারাপ? খারাপ কে বল্লে? মধু হচ্ছে খাবার জিনিস! মোমের সঙ্গে মধুও পাওয়া যাবে, তুমি বলো কি হে?" অশ্বত্থামা এবারে উল্লসিত হয়ে উঠলোঃ "এই নাও তোমার টাকা। কারখানার দাম। চলো আগে তোমার মৌচাক দেখি। তারপর মধু দেখবো। মধু তো চোখে দেখে তৃপ্ত হবার বস্তু নয়, চেখে দেখবার জিনিস।" বঁড়শির সাথে সাথে অশ্বত্থামা মৌচাকের দিকে এগুতে লাগলো। আমিও সঙ্গে রইলাম। কিন্তু সত্যি বলতে কি, প্রতি পদক্ষেপেই মনে হচ্ছিল কাজটা খুব হঠকারিতা হচ্ছে। যতই মধু থাক, মৌচাকের ত্রিসীমানায় থাকা আমার বিবেচনায় কোনো মতেই বাঞ্ছনীয় নয়।

"ওঃ এই বুঝি তোমার মৌচাক? একেই বলে মৌমাছির কারখানা? এর মধ্যেই বুঝি মোম হয়? মোমবাতি মধু ইত্যাদি যাবতীয় জিনিস এর মধ্যেই! আশ্চর্য!" অশ্বত্থামা বলে আর হাঁ করে তাকিয়ে থাকে।

"মোমবাতি আপাততঃ এর মধ্যে নেই, তবে মধু—হ্যাঁ, যা বলেছেন! মধু দেদার। এর ফোকরে ফোকরে মধু।" বলতে গিয়ে বঁড়শির সারা মুখ যেন সমেদুর হয়ে ওঠে।

"এর ফোকরে ফোকরে মধু? বলো কিহে?" বলতে বলতে অশ্বত্থামার জিভ দিয়ে জল গড়ায়, "তাহলে তো কেমন মধু দেখতে হচ্ছে।"

এই না বলে অশ্বত্থামা আমি বাধা দেওয়ার আগেই মধুর লালসায় মৌচাকে এক খাবলা মেরে বসেছে। ব্যস, আর যাবে কোথায়? দেখতে না দেখতে সেই মৌচাক ভেঙে হাজার হাজার মৌমাছি বেরিয়ে পড়লো। বেরিয়ে পড়ে আকাশে বাতাসে উড়তে আরম্ভ করলো। আর দূর থেকে এরোপ্লেন যে রকম হুঙ্কার ছাড়ে প্রায় সেই রকমের একটা গোঁ গোঁ আওয়াজ। কবিরা তাঁদের কবিতার মারপ্যাঁচে যাকে মৌমাছিদের গুঞ্জনধ্বনি বলে থাকেন এই হয়তো সেই জিনিস হবে। তবে মৃদু মধুর নয়, তার অনেকগুণ বাড়িয়ে। এক কথায়, গঞ্জনাধ্বনি হয়ত বলা যায়।

"আমাকে কামড়ে দিয়েছে।" অশ্বত্থামার কানফাটানো আর্তনাদ কানে এল।

আশ্চর্য নয়! ও একেবারে মৌচাকের সম্মুখেই ছিল। "পালাও—পালাও।" বঁড়শি চেঁচিয়ে ওঠে। এবং নিজের উপদেশের উদাহরণস্বরূপ মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়।

অশ্বত্থামার হস্তক্ষেপে লক্ষ লক্ষ মৌমাছি মুক্তিলাভ করেছিল। মৌমাছির গুঞ্জন, সকলের সমবেত ঐক্যতানে তখন রীতিমত এক গর্জন। আর সবাই মিলে সামনে পেয়ে—

সামনে পেয়ে যা করেছে তা চোখে দেখা যায় না। অশ্বত্থামা মৌমাছির তাড়নায় মুখ থুবড়ে পড়ে গেছল। কোনো রকমে যখন সে উঠে দাঁড়ালো তখন কোনদিকে যে সম্মুখ আর কোনদিক তার পশ্চাদ্ভাগ তা বোঝা দায়। সে এক ভয়ংকর দৃশ্য।

হাসির ফোয়ারা

অদূরে একটা আটচালা মতো দেখতে পেয়ে আমরা দু'জনাই সেদিকে দৌড়েছি। আটচালার দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। "দরজা খোলো। দরজা খোলো।" আমরা চেঁচাতে থাকি।—"মৌমাছিরা আমাদের তাড়া করেছে!"

" সেকথা আর আমাকে বলতে হবে না।" ভেতর থেকে জবাব আসে। বঁড়শিই জবাব দেয়। এবং কিছুতেই দরজা খোলে না। সজোরে চেপে থাকে। অগত্যা দু'জনে মিলে ধাক্কা মেরে তো দরজা ভেদ করে ঢুকে পড়া গেল। সেই ফাঁকে আমাদের পিছু পিছু কয়েক শো মৌমাছিও পড়ল সেঁধিয়ে।

তারপর? তারপর আর কি? সেই ছোট্ট ঘরের মধ্যে সবসুদ্ধ আমরা সাত শো প্রাণী। দু'পেয়ে মাত্র তিনজনা—তার বিরুদ্ধে বাদ বাকী সব ষট্‌পদ। সবাই সমান উন্মত্ত।

"এইবার ওদের বাগে পেয়েছি।" অশ্বত্থামা চেঁচিয়ে ওঠে। কথাটা এক হিসেবে মিথ্যে নয়। বললে পরে সেভাবেও বলা যায় আমি ভেবে দেখলাম।

"এইবার ওদের এক একটাকে ধরো আর মারো।" এই বলে সে পায়ের জুতো খুলে ফেলল। আমি আর বঁড়শি দু'জনে দু'কোণ ঠেসা হয়ে কাঁপছি। ওর কাণ্ড দেখে আমাদের কাঁপুনি আরো বেড়ে গেল।

এক একটা মৌমাছিকে সে তাক্‌ করে, আর জুতো দিয়ে ঘা-কতক দেয়। তেড়ে ফুঁড়ে লাগায়। এইভাবে দশবিশ বারের অপচেষ্টায় এক একটাকে সে কাত করতে লাগল। মরছিল কিনা জানি না, কাছে গিয়ে দেখবার সাহস হয়নি, তবে কয়েকটাকে ধরাশায়ী হতে দেখলাম।

এই বলে সে পায়ের জুতো খুলে ফেলল।

মারতে মারতে মানুষের খুন চেপে যায়। মার খেতে খেতে মানুষ খুনে হয়ে ওঠে। আর মারের দিক দিয়ে মৌমাছিরা কামার—যা ওদের কামড়। তার স্যাঁকড়ার জুতোর ঠুকঠাকের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মৌমাছিদের কামারের মতন এক এক ঘা—এক একটা কামড়। কামড় খেয়ে খেয়ে

● মধু চক্রান্ত

অশ্বত্থামাও ক্ষেপে গেল—"দরজা খুলে দাও। আসুক ব্যাটারা। সবাই আসুক। ওদের সব ক'টাকে জুতিয়ে আজ লাশ বানাবো।"

দরজার বাইরে লক্ষ লক্ষ মৌমাছি ভনভন করছে। আমি কাতর হয়ে পড়লাম, "রক্ষে করো ভাই! দরজা খুলো না আর। তাহলে আর বাঁচতে হবে না।"

"বঁড়শির বাবার কারখানা লাটে তুলে দিয়ে তবে আমার শান্তি। বঁড়শি, ছিপ, ফাৎনা সব আজ শেষ করব।" অশ্বত্থামা গজরাতে থাকে। তার গলার আওয়াজ প্রায় হ্রেষাধ্বনির মতো আর আমরা দুজনে মিলে তাকে ধরে থাকি।

না, অশ্বত্থামা আর মৌমাছির কারখানা করেনি। এই কান্ডের দিন কয়েক পরে ওকে দেখতে গিয়েছিলাম। সে বললে, "আরে রাম, ওর চাষ আবার মানুষে করে! সেরে উঠি আগে। চেহারাটার যা খোলতাই হয়েছে, বাইরে মুখ দেখাবার জো নেই কো। বাইরে বেরুতে পারলে তারপর বঁড়শি ব্যাটাকে আমি একবার দেখে নেব আগাপাশতলা।"

জীবনকেষ্টর জীবন-নাট্য

এক
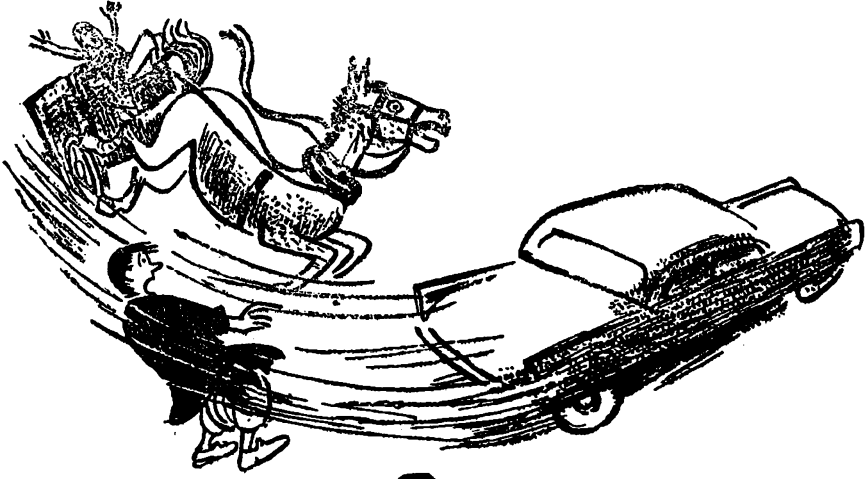
জীবনকেষ্টর সব কাণ্ড লিখতে গেলে একটা মহাভারত হয়। তার কীর্তিকথা একমুখে বলবার নয়। তাহলেও সবার সম্মুখে বলবার মতো। সেই বিচিত্র কাহিনী এখানে শুরু করা হচ্ছে।

জীবনকেষ্টর ধারণা তার শিক্ষার বয়স এখনো পেরোয়নি। সত্যি বলতে, কারোই সে বয়স পার হয় না! কখনই না, কিন্তু আশ্চর্য, কারো সে ধারণা নেই। সেই ধারণাটাই জীবনকেষ্টর হয়েছে, সর্বসাধারণতার থেকে এইখানেই তার ব্যতিক্রম।

শিখবে তো, কিন্তু কী শিখবে? শেখবার মতো কী আছে? আছে অনেক কিছু যা তার শক্তির বাইরে—শেখবার শক্তি এবং ধারণা শক্তির বাইরেই তার,—আবার অনেক কিছু আছে যা তার এক-আধটু আধা-খ্যাঁচরা শিখে রাখা।

যেমন এই মোটর-চালানো শিক্ষাটাই ধরা যাক না! একবার একজনের গাড়ি বাগে পেয়ে এই শিক্ষাটা বাগিয়ে আনবার সে চেষ্টা করেছিল কিন্তু দখল হবার আগেই গাড়িটা বে-দখল হয়ে গেল। যার গাড়ি, জীবনকেষ্টর কৃপায় সে অধিকতর শিক্ষালাভ করে লোহার দরে গাড়িটা বেচে

দিয়ে সেই মূলধন নিয়ে লোহার কারবারে জমে গেছে। তার কেমন ধারণা হয়েছিল, জীবনকেষ্ট যেভাবে লেগেছে তাতে ও-গাড়ি থাকবার নয়—এমন কি, অচিরেই গাড়ি আর জীবনকেষ্ট দুজনেই যাবে। একসঙ্গে এক সহমরণে। অতএব বেচে দিয়ে গাড়ির তিন কুল বাঁচানো গেল—গাড়ি, জীবনকেষ্ট এবং নিজেকে।

লোহার কারবারে এখন সে এত লোহা জমিয়েছে, যাকে জমানো সোনা বা রূপাই বলা চলে,—শোনা কথা নয়, জীবনকেষ্ট স্বচক্ষেই গিয়ে দেখল সেদিন। লোকটাও লৌহ-ঘটিত হয়ে কেমন যেন লক্কর হয়ে গেছে। সে লোক থাকলেও সে লৌকিকতা নেই। এখন তো ইচ্ছে করলে অমন গাড়ি সে চারখানা কিনতে পারে, এমন অলৌকিক কিছু না। কিন্তু জীবনকেষ্টর প্রস্তাবে সে ঘাড় নাড়ল আর বলল—আর না। ভাবখানা যেন এ রকম, যে গাড়ি একবার বেচেছে, আর তার মুখদর্শন করবে না—অন্ততঃ জীবনকেষ্ট বেঁচে থাকতে নয়। তবুও সে হাল ছাড়েনি, বলেছে, আচ্ছা, আমি যদি ভালো করে মোটর চালাতে শিখি? তাহলে? তাহলে কিনবে ত?

—শেখোতো আগে। তখন দেখা যাবে।

জবাবটা যেন একটু আশাবাদীর মতই। শিখতে আরম্ভ করে পঠদ্দশায় হয়ত সে এমন করেই চালাবে যে, অক্লেশেই নিজেকে পরপারে চালিয়ে নিতে পারবে সেজন্যে তার বন্ধুর আলাদা গাড়ি কেনার দবকার হবে না।—বন্ধু হয়েও কি রকম স্বার্থপর হতে পারে জীবনকেষ্ট তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ পায়।

ওকালতির অবশ্যি সে কিছু কম করেনি। এও বলেছিল—বিনে পয়সায় আমার মতো একজন ড্রাইভার পাচ্ছ। অমনি পেয়ে যাচ্ছ—এটা কি তুমি লাভ বলে মনে করো না? অমনি তোমার গাড়ি চালাব, এক পয়সা নেব না, অথচ হুকুম করলেই হাজির! এক পাড়াতেই তো আছি! যাব কোথায়?

তবুও ঘাড় নেড়েছে তার বন্ধু। কী ভেবে কে জানে। বস্তিত্ব উভয়েই পাশাপাশি বটে, কিন্তু মোটর কেনার পর জীবনকেষ্ট অপঘাতে না গেলেও তার অস্তিত্ব কোথাও থাকবে বলা কঠিন। সত্যি বলতে, কলকাতার কোথায় না থাক্‌বে! টালা থেকে টালীগঞ্জের মধ্যে সব রাস্তাতেই সে ঘুরচে—উক্ত মোটরের ড্রাইভার আসনটিতে তাকে দেখা যাবে। তোমার আর অসুবিধা কি? মাঝপথে হাঁ করে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকো, দেখতে পেলেই হাঁক ছাড়ো, গাড়ি তোমার পাশেই এসে হাজির, উঠে পড়ো তখন! অসুবিধেটা কি?

কিন্তু জীবনকেষ্টর বন্ধুত্বে যতখানি আগ্রহ, যেমন অকৃত্রিমতা, বন্ধুর জীবনকেষ্টত্বে ঠিক ততখানিই ভেজাল। যাই হোক, ওর মোটর চালানো শিখতে তো কোনো হানি নেই—নিজের প্রাণহানির বা অন্য প্রাণী-হানির সে কেয়ার করে না। তারপর শিখে চালাবার লাইসেনস্‌ পেলে পর, বিনা-দক্ষিণার বদলে না হয় বেতন নিয়েই শহর প্রদক্ষিণ করবে। তার বন্ধু না হোলো বয়ে গেল, শোফারের চাকরিই না হয় সে করবে যে কোনো মোটরওলার কাছে—মন্দ কি? মোটর

চালানো একটা কাজ তো? আরামের কাজ! তাছাড়াও, একটা মোটরকে নিজের আয়ত্তে আনা কম কাজ নয়।

এক মোটর-শিক্ষালয়ের ঠিকানা জানা ছিল। শখের খাতিরে বা পেশার জন্য কেউ মোটর চালানো শিখতে চাইলে সেখানে উপযুক্ত শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে তার সুব্যবস্থা আছে, খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন পাঠে একথা সে জেনেছিল। সেইখানেই গেল সে।

শিক্ষালয়টা একটা মেরামতি কারখানা মাত্র, জীবনকেষ্ট দেখল। কয়েকখানা মোটরগাড়ি নিয়ে মিস্ত্রি-মজুর জনকয়েক উঠে পড়ে লেগেছে। আস্ত মোটরকে ভাঙছে, আর ভাঙা মোটরকে জুড়ছে। একখানাকে তিনখানা, আর তিনখানাকে একখানা করা—এই তাদের কাজ বলে তার মনে হোলো। মোটরদের তারা দস্তুরমত শিক্ষা দিচ্ছে—হয়ত বা বলা গেলেও, তাদের কাউকে বিজ্ঞাপন-কথিত উক্ত উপযুক্ত শিক্ষক বলে জীবনকেষ্টর বোধ হোলো না।

কারখানার একদিকে আপিস ঘরের মতো একটুখানি ছিল। টেবিল চেয়ারে জমানো জায়গাটা। জীবনকেষ্ট সেইখানে গিয়ে খোঁজ নিল।

আরেকটি যুবক ছিল সেখানে—সভ্য ভব্য স্মার্ট। তাকেই শিক্ষক বলে সন্দেহ করে এগিয়ে গেল জীবনকেষ্ট—আজ্ঞে, কিছু মনে করবেন না। আপনিই কি মোটরশিক্ষক? জিজ্ঞেস করল ও।

—আজ্ঞে না। আমি শিখতে এসেছি।

এই সময়ে হৃষ্টপুষ্ট এক ভদ্রলোক সেখানে ঢুকলেন—দিব্যি অমায়িক চেহারার।

—কে যেন মোটর শিক্ষকের কথা বলছিল না? শুনলাম যেন। বললে সেই আগন্তুক।

—আজ্ঞে, হ্যাঁ। আমি। জীবনকেষ্ট জবাব দিল।

—আমার ড্রাইভারটা প্রায়ই কামাই করে। মাঝে মাঝে কোথায় যে পালিয়ে যায় জানি না। দেখছি নিজে না চালাতে শিখলে আর চলে না, যুবকটি তাঁকে জানাল।

—ও, আসলে তুমি একজন শিক্ষার্থী? ভদ্রলোক বললেন।

—আজ্ঞে, হ্যাঁ।

এইবার সেই বিপুল-বপু লোকটি জীবনকেষ্টর দিকে ফিরলেন।

—এই শিক্ষার্থীটি ততক্ষণ বসুন, ইতিমধ্যে আমরা একটু মোটরে করে বেড়িয়ে এলে কেমন হয়? জিজ্ঞেস করলেন তিনি জীবনকেষ্টকে।

এই অতিকায় ভদ্রলোক, ডাঃ প্রতুলচন্দ্রর অতিশয় ভদ্রতার কথা সে অঞ্চলে কারো অবিদিত ছিল না। তাঁর অমায়িকতায় রুগীরা যেমন মুগ্ধ ছিল, তাঁর বৌ তেমনই তিত-বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন। তার কারণ আর কিছু না, তাঁর এই ভাববাচ্যের কথাবার্তা।

রুগী এবং স্বীয় পত্নীর প্রতি (তিনি রুগী না হলেও) তিনি অভিন্ন আচরণ করতেন।

সকালে উঠেই প্রথম কথা তাঁর ছিল—একবার জিভটা তো দেখতে হয়।

বৌ জিভ বার করতে একটু দেরি করলে তাঁর বাক্যের দ্বিতীয় ভাগ শোনা গেছে—জিভটা একবার আমাদের দেখানো দরকার। লজ্জা কি দেখাতে? লোকে তো জিভ বার করে ভেংচিও কাটে!

তারপর জিভ-টিভ দেখে নাড়ি-টাড়ি টিপে হয়ত বলেছেন—আজকে আমরা বেশ ভালোই আছি মনে হচ্ছে তবু একটু সিরপ অফ ফিগস্ খেয়ে রাখা ভালো। দু'চামচ মাত্রায় সমপরিমাণ জলের সঙ্গে খাব আমরা—কেমন? পেট পরিষ্কার থাকলে কখনো আমাদের কোনো অসুখ করবে না। (বলা দরকার এই সিরপ তিনি স্বয়ং কখনো খেতেন না।)

ইতিমধ্যে আমরা একটু মোটরে করে বেড়িয়ে এলে কেমন হয়? [পৃঃ ৩৯

"রুগী অন্তিমদশায় পৌঁছনোর পূর্ব পর্যন্ত তাঁর এই আত্মীয়-ভাব বজায় থাকতে দেখা যেত। কেবল সেই চরম ক্ষণে, রুগীর যায়-যায় অবস্থাতেই তিনি ভাববাচ্য এবং উত্তম পুরুষের বহুবচন পরিত্যাগ করে অধম পুরুষের এক বচনে নেমে আসতেন। 'আমরা ভালো হয়ে উঠব, সেরে উঠব, ভয় কি?' যে-তিনি এই কথাই আগের ভিজিটে বলে গেছেন, সেই-তিনিই, কেন বলা যায় না, 'আমাদের আর বাঁচানো গেল না' একথা না বলে 'ওকে আর বাঁচাতে পারলুম না। অক্কাই পেল বুঝি'—এই কথাই বলে ফেলেছেন।

যুবকের কথা শুনে প্রতুলচন্দ্রের মনে হোলো তাঁর শোফারেরও তো প্রায় সেই ব্যারাম। পালিয়ে যাওয়া ব্যারাম ঠিক না হলেও, ব্যারাম হলেই সে পালিয়ে যায়। হয়ত ডাক্তারি চিকিৎসার ভয় ততটা তার নয় যতটা বুঝি বা ডাক্তারের আত্মীয়তার—আর সে যখন বাড়ীর বৌ নয়, তখন তার পালাতে বাধা কি?

এই যেমন আজকে তার আর টিকি দেখা যাচ্ছে না প্রতুলচন্দ্র মনে করলেন, ঐ যুবকের অনুকরণীয় আদর্শ অনুসরণ করে তাঁর নিজেরও মোটর-চালনাটা রপ্ত করে রাখলে মন্দ হয় না। এবং শিক্ষককেও যখন এত সহজে, আসা মাত্রই হাতের নাগালে পাওয়া গেছে তখন এ-সুযোগ ছাড়া কেন?

হাসির ফোয়ারা

—একটু মোটর চালানো তা হলে শেখা যাক। কেমন? জীবনকেষ্টকে তিনি বলেছেন। —সাঁতার শেখার মতো মোটর চালানোটা আমাদের প্রত্যেকেরই শিখে রাখা দরকার—কখন কি কাজে লাগে! তাই নয় কি?

—সে কথা ঠিক। বলেছে জীবনকেষ্ট।

ডাঃ প্রতুলচন্দ্র এবং তার ভাববাচ্যের সঙ্গে সম্যক পরিচয় না থাকায় তাকেই সে মোটর-শিক্ষক বলে ভ্রম করেছে বলাই বাহুল্য। কিন্তু ডাক্তার যে তাকেই শিক্ষক বলে ঠাউরেছেন, এ তথ্য সে ধরতে পারেনি।

তাদের কাছাকাছি প্রকান্ড একটা সালুন্ গাড়ি তখনো অটুট অবস্থায় ছিল—তখন পর্যন্ত মিস্ত্রী-মজুররা কেউ তার পেছনে লাগেনি।

—এইখানাই বার করা যাক—কেমন? ডাঃ প্রতুলচন্দ্র প্রস্তাব করেছেন।—ক্ষতি কি?

গাড়ির ভেতরে কে কোন্ স্থান অধিকার করবে, তাই নিয়ে দুজনেই একটুক্ষণ ইতস্ততঃ করচেন। জীবনকেষ্ট জিজ্ঞেস করেছে—আপনি তাহলে চালকের আসনে বসুন।

—না, না। আমি কেন? জবাব দিয়েছেন প্রতুলচন্দ্র—কিঞ্চিৎ আশ্চর্য হয়েই, বলতে কি।

—আমিই চালাবো তাহলে? জীবনকেষ্ট বলেছে ঃ বেশ। আপনি আমার পাশে থাকচেন তো?

—তা, পাশাপাশি বসতে আপত্তি কি আমাদের? প্রতুলচন্দ্রের তাড়া দেখা গেছে এবার—চট করে বেরিয়ে পড়া যাক তাহলে। বাজে সময় নষ্ট করে লাভ কি?

—কোন্ দিকে যাবো? ড্রাইভারের আসনে বসে প্রশ্ন করেছে জীবনকেষ্ট।

—রাস্তায় তো বেরনো যাক আগে। তারপর হাওড়া ব্রিজ হয়ে—

—য়্যাঁ? একেবারে হাওড়া পর্যন্ত?

—নিশ্চয়। বলেচেন প্রতুলচন্দ্র ঃ এমন কি তারও ওধারে—গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে যদ্দূর যাওয়া যায়। চালাতে শেখার সাথে সাথে যদি একটু হাওয়া খাওয়া যায়। মন্দ কি?

গাড়িতে স্টার্ট দিতেই ইঞ্জিনের পত্রপাঠ প্রত্যুত্তর পেয়ে জীবনকেষ্ট চমৎকৃত—এরকম গাড়ি এর আগে সে পায়নি। হাতায়নিও এর আগে।

এক ছুটে বোঁ করে বেরিয়েছে গাড়িটা। এত বড় গাড়ি, যার বনেট্টাই এতখানি, করায়ত্ত করা জীবনকেষ্টর এই প্রথম। কিন্তু তাহলেও, একজন ওস্তাদ শিখিয়ের পাশে বসে চালানোয় তার ভয়টা কি?

——বাঃ দিব্যি ফাঁকা রাস্তা! আরো একটু জোরে চালানো যায় না? প্রতুলচন্দ্রের প্রশ্ন।

—কতো জোরে চালাতে আপনি বলছেন?

—যতো জোরে চালানো যেতে পারে।

অদ্ভুত গাড়ি! অ্যাক্সিলিরেটরে পা ছোঁয়াতেই গাড়িটা তীর বেগে ছুটেছে। একটা ঘোড়ার ল্যাজে ঘেঁষে চলে গেছে উল্কার মতো।

হাসির ফোয়ারা

—চমৎকার চালানো। এক চুলের জন্যই বে'চে গেছে ঘোড়াটা। চুলচেরা বিচার করে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছেন ডাক্তার।

এই কৃতিত্ব সত্যিই ওর চালনা নৈপুণ্য কি না। জীবনকেষ্ট ভেবেছে। ভেবে একটু অবাক হয়েছে নিজেই।

—আবার কি ঐ রকম একটা কিছু করা যায় না?

—তা—চেষ্টা করলে—বোধ হয়—

—আমাদের সামনে ঐ—ঐ যে রেসিং-কার চলেছে দেখা যাচ্ছে—ফিরিঙ্গি ছেলেমেয়েরা চেপে ফূর্তি করে চলেছে—ওর একেবার ধার দিয়ে—প্রায় দাড়ি কামানো গোছ চে'ছে দিয়ে যাওয়া যায় না? পাশ দিয়ে যাবার সময় খুব জোরসে হর্ন্ বাজিয়ে যেতে হবে কিন্তু?

জীবনকেষ্ট সন্ত্রস্ত চোখে সঙ্গীর দিকে তাকালো। সঙ্গীন পরীক্ষাই বই কি!

কিন্তু নাচতে নেমে ঘোমটা রাখা যায় না। শিক্ষালাভ করতে এসে পরীক্ষার কালে প্রশ্ন-পত্রকে ফাঁকি দেওয়া চলে না!

রেসিং-কারের দাড়ি চে'ছে যাবার সময় তার মনে হোলো, গাড়িটা যেন শিস্ দিয়ে চলেছে—সেই সঙ্গে হর্নের এমন কান ফাটানো আওয়াজ! আর সঙ্গে সঙ্গে ও-গাড়ির হল্লাকারীদের কী বিচ্ছিরি চিৎকার। বাতাসে আর্তনাদটা গপ করে গিলে ফেলল, তাই রক্ষে; নইলে জীবনকেষ্টর কান গেছল।

—তোফা! উল্লসিত হয়ে উঠলেন ডাক্তার। আচ্ছা, কতো তাড়াতাড়ি তুমি মোড় ঘোরাতে পারো? স্পীড একদম না কমিয়ে মোড় নিতে পারো না—অস্বাভাবিক উৎসাহে এমন কি তিনি স্বাভাবিক ভাববাচ্য পর্যন্ত ভুলে গেলেন। জীবনকেষ্টর মৃত্যু আসন্ন জেনেই কিনা কে জানে!

—বলতে পারব না ঠিক—জবাব দিল জীবনকেষ্ট।—কখনো চেষ্টা করিনি।

—আচ্ছা, সামনের বাঁকটায় ঘোরো তো দেখি। যতো তাড়াতাড়ি পারা যায়।

জীবনকেষ্টর হাত কাঁপতে থাকে স্টিয়ারিং হুইলের ওপর। শিক্ষালাভ করতে হলে প্রাণপণ করতে হয়, এমন কি প্রাণ দিয়ে শিক্ষা পাওয়াটাই আসল শিক্ষা—জীবনকেষ্টর তা অজানা নয়। 'রক্ত দিয়ে কী লিখিব—প্রাণ দিয়ে কী শিখিব—কী করিব কাজ?' রবীন্দ্রনাথের কবিতার এই কলিও তার মনে পড়ে। কিন্তু তবুও তার হাত কাঁপে।

—তবে তাই হোক। তথাস্তু! মনে মনে নিজেকে এই কথা বলে জীবনকেষ্ট মরিয়া হয়ে পড়ে। মোড়ের মুখের পথিকরা, গ্রহের চক্রান্তে সেই দণ্ডে যারা প্রায় মরবার মুখে ছিল, চিৎকার করে ওঠে—গাড়িটাও এক ধারে দুটো চাকা স্বর্গের দিকে তুলে দেয়। কিন্তু তক্ষুনি আত্মসংবরণ করে ভূমিষ্ঠ হয়ে নিজেকে সোজা করে নিতে সে দেরি করে না।

এই সুযোগে গাড়িটা মোড়ের পাহারোলার ল্যাজ ঘে'ষে গেছল। ধনুষ্টঙ্কারের মতো বে'কে আত্মরক্ষা করে সেও নিজেকে সোজা করে নিয়েছে।

হাসির ফোয়ারা

অদ্ভুত! অদ্ভুত—উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন ডাক্তার।—বিলেতে যে সব মোটরের রেস হয়, তাতে আমাদের যোগ দেয়া উচিত।

—আপনি—আপনি কি সত্যি বলছেন? আমি—আমি কিন্তু কখনো সে কথা ভাবিনি। জীবনকেষ্ট নিজেকে অভাবিত জ্ঞান করে।

—আচ্ছা, এই যে সব গাড়িঘোড়া যাচ্ছে, ডাইনে বাঁয়ে রেখে এঁকে বেঁকে—যেমন করে ফুটবল কেয়ারি করে নিয়ে যায়, তেমনি করে এদের ভেতর দিয়ে যেতে পারোনা তুমি?

—আপনি কি মনে করেন? পারব কি?

—তুমি সব পারো। ডাক্তার হাসতে থাকেন ঃ আমার মনে হয় তোমার অসাধ্য কিছু নেই।

অকস্মাৎ জীবনকেষ্টরও মনে হয়, সে সব পারে। এতক্ষণ তাদের গাড়ি বড় রাস্তা দিয়ে ছুটছিল বটে, কিন্তু এবার আরো চওড়া রাস্তায় চড়াও হোলো। চারি ধারে গাড়ি, ঘোড়া, মোটর, লরীর ছড়াছড়ি; ট্রাম যাচ্ছিল, আসছিল। প্রতুল ডাক্তার জীবনকেষ্টর কানে কানে কী যেন বললেন। কানাকানি করবার মতই কথা বটে! এক মুহূর্তের জন্য জীবনকেষ্ট ভয়ে জমে যেন জড় পদার্থ হয়ে গেল। তারপর বলল, কোন্ ধার দিয়ে যাব? যে ট্রাম যাচ্ছে তার ডান ধার দিয়ে, না কি, যে ট্রাম আসছে তার—

তা কেন? যা বললাম! দুটো ট্রামের মাঝখান দিয়ে—তারা সামনা-সামনি এসে পড়বার ঠিক আগের মুহূর্তে কেটে বেরিয়ে যাও?

জীবনকেষ্ট ঠিক অক্ষরে অক্ষরে বুঝতে পারে না।—কি রকম?

—আহা! এ ট্রামটা যাবে আর ও ট্রামটা আসবে—তারা মুখোমুখি এসে পড়বার মুখে তাদের মাঝখান দিয়ে বন্দুকের গুলির মতো সোঁ করে গাড়িটাকে নিয়ে বেরিয়ে যেতে হবে। সিকি সেকেন্ডের এদিক-ওদিক হলে দুটো ট্রামের মাঝখানে পড়ে পিষে চ্যাপটা চকোলেট হয়ে যাব আমরা। এবার বুঝেছো?

প্রাণকেষ্ট ঢোঁক গিলল। চরম পরীক্ষার জন্যে তৈরী হতে বুক বাঁধল সে। আশ-পাশের ট্রামের ঘর্ঘর-ধ্বনি যেন রেলগাড়ির শব্দের মতো মনে হতে লাগল তার। তার চোখের সামনে সব আবছা বলে বোধ হতে লাগল। তার ওস্তাদ্‌জী যদি অন্ততঃ তাঁর একটা হাতও স্টিয়ারিং হুইলের ওপর রাখতেন, তাহলে সে যেন শান্তি পেত—নিশ্চিন্ত হতো একটু—কিন্তু না, তিনি তা রাখতে প্রস্তুত নন। অগত্যা জীবনকেষ্টকে স্বহস্তেই সুকঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। দুধারের ট্রামের আওয়াজ যেন বজ্রগর্জন বলে তার মনে হতে থাকে—মুহূর্তের জন্যই। তার শরীর ঝিমঝিম করে। সে চোখ বোঁজে।

অবশেষে চোখ খুলে—পার হয়েছি? হতে পেরেছি? এই কথায় প্রথম সে জিজ্ঞেস করে।

ডাক্তার বলেন—সাবাস্।

হাসির ফোয়ারা

এতক্ষণে তারা হাওড়া ব্রিজ পেরিয়ে গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোডে এসে পড়েছে—এর পর কি করব? জিজ্ঞেস করে জীবনকেষ্ট।

—কিছু না। ঝড়ের বেগে চালিয়ে যাও। হুকুম আসে।

চল্লিশ—পঞ্চাশ—ষাট—সত্তর! গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোডের ফাঁকা রাস্তায় ঝড়ের বেগে গাড়ি চলেছে—স্পীডো-মীটারে সত্তর মাইলের নিশানা।

—এরকম একজন পাকা ড্রাইভারের পাশে বসে যাবার সৌভাগ্য জীবনে একবারই হয়। ডাক্তার না বলে পারেন না।

—সত্যি বলছেন আপনি? জীবনকেষ্ট গদগদ হয়ে পড়ে।

—তোমার ব্রেকের খবর কি? ব্রেক ঠিক আছে তো?

—এখনো পরীক্ষা করে দেখা হয়নি।

—আমি ভাবছিলাম কি—এই স্পীডের মাথায় যদি হঠাৎ তোমায় গাড়ি থামাতে হয়—সামনে কোনো বিপদ বা দুর্ঘটনা এসে পড়ে—তাহলে কি করবে?

জীবনকেষ্টর সর্বাঙ্গ শিউরে ওঠে। কথাটা ভাববার মতো বই কি। তার শিরদাঁড়া দিয়ে যেন বরফের স্রোত ওঠানামা করতে থাকে।

—তা হলে কি করতে বলেন? ক্ষীণকণ্ঠে সে জিগেস করে! সে রকম অবস্থায় কি করব?

—মনে হচ্ছে, অদূরে যেন রাস্তাটা ব্লক্ করে দিয়েছে—একটা লরী লম্বালম্বি খাড়া করে রাস্তাটা যেন আটকে দেয়া হয়েছে মনে হচ্ছে। গাড়িটা থামাও তো এবার।

ডাক্তারের ধারণাই ঠিক! দেখতে দেখতে সেই লরীর বেড়া সামনে এসে পড়েছে ; আর জীবনকেষ্টও প্রাণপণে ব্রেক্ টিপেছে। চার চাকাতেই ব্রেক এঁটে গিয়ে—হঠাৎ বিশ্রী এক কেকাধ্বনি—এবং সঙ্গে সঙ্গে গোটা গাড়িটাই কয়েক হাত লাফিয়ে উঠেছে আকাশে।

—যাক, বাঁচা গেল! বলেছেন ডাক্তার।

—আপনি যা বলেন! আমার কিন্তু বাঁচানোর আশা একদম ছিল না। জীবনকেষ্টও হাঁফ ছেড়েচে।

ঠিক পাশেই তার ওতোরপাড়ার থানা। সেখান থেকে দারোগা বেরিয়ে এসেছেন। গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে সন্দেহজনক এক মোটরগাড়ির মারাত্মক গতিবিধির খবর একটু আগেই টেলিফোনে তাঁরা পেয়েছিলেন। রাস্তা আটকেছিলেন তাঁরাই।

থানার দারোগা এসে জীবনকেষ্টকে পাকড়ালেন—লাইসেনস্ দেখাও।

—আমি তো সবে চালাতে শিখছি। লাইসেনস্ কোথায় পাবো! জীবনকেষ্ট বলেছে : উনিই তো মাস্টার। উনিই আমায় শেখাচ্ছেন।

—আমি মাস্টার! তার মানে? তুমিই তো আমার মাস্টার হে! প্রতুলচন্দ্র অত্যন্ত প্রতিবাদ করেছেন। খুব শেখালে যাহোক্!

● জীবনকেষ্টর জীবন-নাট্য

—তার মানে? দারোগা এবার প্রতুলবাবুকে নিয়ে পড়েছেন ঃ আপনার লাইসেনস্ দেখান তো।

—আমার মেডিক্যাল লাইসেনস্—তার সঙ্গে গাড়ি চালানোর কি? ডাক্তার প্রতুলচন্দ্র আকাশ থেকে আছাড় খান ঃ এবং তাও তো আমার সঙ্গে নেই। আমার রেজিস্টার্ড নম্বর বলতে পারি। তাতে কিছু সুবিধে হবে?

—কোথ্ থেকে আসছেন আপনারা?

—ভবানীপুরের এক মোটর গ্যারেজ থেকে।

—আপনার লাইসেনস্ দেখান তো?

—কতক্ষণ আগে রওনা হয়েছেন?

প্রতুলচন্দ্র ঘড়ি দেখে কাঁটায় কাঁটায় বলে দ্যান—ঠিক সাড়ে চার মিনিট আগে।

—ভবানীপুর থেকে ওতোরপাড়া সাড়ে চার মিনিটে এসেছেন—ঘণ্টায় কতো মাইল বেগে এসেছেন, আপনাদের খেয়াল আছে? এই রেস্ট্রীক্টেড্ এরিয়ায় এরূপ বে-আইনী গাড়ি চালানোর জন্য আপনাদের আমরা সোপর্দ করব—

এমন সময় একটি যুবক দৌড়ে এসে হাঁপাতে লাগল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলতে লাগল।

—এই যে...ডাক্তার রায়...কি ভাগ্যিস, আপনি এসে পড়েছেন।......এত তাড়াতাড়ি আপনি আসতে পারবেন, আমরা ভাবতে পারি নি। আপনাকে ফোন করবার পর থেকে এই ক'মিনিট যে কি করে কাটছে আমাদের! মুখুজ্যে মহাশয়ের হার্ট ট্রাব্‌লটা হঠাৎ বড্ড বেড়ে উঠেছে—প্রায় যায় যায় অবস্থা। আসুন তাড়াতাড়ি। থানার পাশের দু'খানা বাড়ি বাদ দিয়ে ঐ বাড়িটা আমাদের।

দুই

জীবনকেষ্টও বাসে উঠে এক কীর্তি করে বসল।

কথায় বলে কীর্তির্যস্য স জীবতি। কিন্তু আমাদের জীবনকেষ্টর বেলা তার অন্যথা দেখা যাচ্ছে। কীর্তি করে সে মারা যাবার দাখিল ; ফাঁসি ঠিক না হলেও নিজেকে ফাঁসিয়েছে যে, তার ভুল নেই। যে পথ দিয়ে লোকে ফাঁস যায়—এবং তার কাছাকাছি আরো যেসব তীর্থক্ষেত্র—জেল হাজত ইত্যাদি বাস করে সেই পথে সেই আদালতেই এসে তাকে হাজির হতে হয়েছে।

কেন যে তার ধৈর্যচ্যুতি হোলো বলা যায় না, বাসে যেতে যেতে মোটা-সোটা এক মেমকে হঠাৎ সে এক চাঁটি মেরে বসলো এবং তার ফলে, আহত ব্যক্তিটি স্থূল বলে নয়, মেম বলেই বেজায় হুলস্থূল পড়ে গেছে।

সবাই এসে বলচে,—"জীবনকেষ্ট, এমন কাজ তুমি কেন করলে? এ কাজ তোমার উপযুক্ত হয় নি।"

কিন্তু জীবনকেষ্টর কোনো জবাব নেই।

"তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছলো নাকি! নইলে হঠাৎ অমন ক্ষেপে ওঠবার কারণ?" জিগেস করে একজন।

জীবনকেষ্ট চুপ করে থাকে।

"না কি মেম তোমাকে মারতে এসেছিল বুঝি? তাই বাধ্য হয়ে আত্মরক্ষার খাতিরেই বোধ করি...?" আরেকজন সংশয় প্রকাশ করে : "কিন্তু মেমরা তো সচরাচর কারুকে কিছু বলে না কামড়ায়ও না বড় একটা?"

জীবনকেষ্ট রা কাড়ে না তবুও।

"মাতৃবৎ পরদারেষু এ কথা কি তোমার জানা নেই জীবনকেষ্ট? তবে? তবে হ্যাঁ, মেমকে মাতৃতুল্য মনে না করতে পারো বটে। আমাদের কার বাবা আর কটা মেম বিয়ে করতে গেছে! কিন্তু —কিন্তু পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ, এটা তো মানো? মেম কিছু তোমার নিজের দ্রব্য নয়? নিজস্ব জিনিস না?" পণ্ডিতগোছের এক ব্যক্তি শাস্ত্রের দ্বারা জীবনকেষ্টকে আঘাত করেন। চাণক্যশ্লোক মেরে ওকে পেড়ে ফেলবার চেষ্টা করেন তিনি। "পরের মেমের গায়ে হাত তোলা কি তোমার উচিৎ হয়েছে? তুমিই বলো?"

হাসির ফোয়ারা

জীবনকেষ্ট কিছুই বলে না—কেবল ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে এবং ওই ঘোঁৎকারের বেশি আর কিছুই তার কাছে আদায় করা যায় না।

কেউ দুঃখ করে, কেউ বা সহানুভূতি জানায়, কারো কারো চেষ্টা হয় জীবনকেষ্টকে অভিনন্দন দান করার। সংবর্ধনা-দাতাদের প্রত্যাশা, জীবনকেষ্টর এই তো সবে হাতে খড়ি, মেম থেকে শুরু করেছে, এর পরে আস্তে আস্তে ও সাহেবের দিকে এগুবে—এবং ক্রমে ক্রমে শহীদ্ হবে—যদি প্রাণপণে লেগে থাকে!

বেশির ভাগ লোক অবশ্যি ছি-ছিই করে। কিন্তু জীবনকেষ্টর হুঁ হাঁ না নেই।

খবরের কাগজ থেকে ফোটো নিতে এসেছিল, একটি সদ্যজাত সাপ্তাহিকের সম্পাদক বাণী চেয়ে পাঠিয়েছিলেন, পাড়ার হাতে-লেখা ত্রৈমাসিকের নাছোড়বান্দা ছেলেরা জীবনী ছাপতে রাজী হয়েছিল—তাদের একমাত্র মুখপত্রে যার মুদ্রণ মাত্র ১—কিন্তু জীবনকেষ্ট তাদের সবাইকে ভাগিয়ে দিয়েছে। এমন কি, জীবনকেষ্টর এক পাড়াতুত ভাই বড় মুখ করে এসে বলেছিল, "পানুদা, তুমি একটা বিবৃতি দাও।" জীবনকেষ্ট তাতেও কোনো উচ্চবাচ্য করেনি।

সেই ঘটনার পর থেকে জীবনকেষ্ট কেমন যেন মনমরা হয়ে রয়েছে।

অবশেষে জীবনকেষ্টর বিচারের দিন এল। আদালত ভীড়ে ভীড়াক্কার! কাঠগড়ায় দাঁড়ালো জীবনকেষ্ট! মুখে তার সকাতর হাসি। একবাক্যে বীর আর কাপুরুষ আখ্যা লাভ করলে যেমনধারা মানুষের দেখা যায়।

জীবনকেষ্ট এইবার মুখ খুলবে সবাই আশা করে।

কিন্তু জীবনকেষ্ট মুখ খোলে না।

জীবনকেষ্ট উকিল দেয় নি, নিজেও জেরা করছে না—সাক্ষীরা একে একে সাক্ষ্য দিয়ে যায়—আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত—বাসের কিম্বিধ পরিস্থিতির মধ্যে কিরূপ তার অপচেষ্টা—সমস্তই প্রায় ঠিক বলে যায় জীবনকেষ্ট কান পেতে শোনে। অধোবদন জীবনকেষ্ট।

অবশেষে হাকিম নিজেই জীবনকেষ্টর জবানবন্দী চান। কেন সে এমন হঠকারিতা করে বসল—তার কৈফিয়ৎ তলব করেন।

জীবনকেষ্ট মুখ খুলল। অবশেষে মুখ খুলতে হোলো ওকে ঃ

"শুনুন ধর্মাবতার, বলি তাহলে"—ম্লানহাসি হেসে শুরু করল জীবনকেষ্ট।—"কেন যেন এমনটা ঘটে গেল তাহলে বলি। শ্বেতাঙ্গী মহিলাটি বাসে উঠলেন, উঠে বসলেন। তারপর উনি তাঁর হাতব্যাগ খুললেন, খুলে মনিব্যাগ বার করলেন, তারপর হাতব্যাগ বন্ধ করলেন, মনিব্যাগ খুললেন খুলে একটা আনি বার করলেন। আনিটি বার করে মনিব্যাগ বন্ধ করলেন, হাতব্যাগ খুললেন—খুলে মনিব্যাগ রাখলেন, রেখে হাতব্যাগ বন্ধ করলেন—তারপর উনি তাকিয়ে দেখলেন যে কণ্ডাক্টার বাসের দোতলায় উঠচে। অতএব আবার তিনি তাঁর হাতব্যাগ খুললেন, খুলে মনিব্যাগ বার করলেন,

করে হাতব্যাগ বন্ধ করলেন, মনিব্যাগ খুললেন, খুলে আনিটি তার ভেতর রাখলেন। রেখে মনিব্যাগ বন্ধ করলেন, করে হাতব্যাগ খুললেন, খুলে মনিব্যাগ রাখলেন, রেখে হাতব্যাগ বন্ধ করলেন—"

"মনিব্যাগ বন্ধ করলেন, তাই বলো।" হাকিম ঠিক অনুধাবন করতে পারেন না। ওর সঙ্গে সঙ্গে দৌড়াতে কেমন যেন তাঁর গোলমাল হয়ে যায়।

"মনিব্যাগ বন্ধ করলেন? না, হুজুর? মনিব্যাগ খুলে তার মধ্যে হাতব্যাগ রাখলেন? না, হাতব্যাগ খুলে মনিব্যাগ রাখলেন? না—কি—মনিব্যাগ খুলে হাতব্যাগ বার করে তার ভেতর আনিটা রেখে, তারপর হাতব্যাগ বন্ধ করে—নাঃ তাও তো নয়। তাই বা কি করে হয়? মনিব্যাগের ভেতর কি হাতব্যাগ রাখা যায় কখনো? আপনি সমস্ত গোলমাল করে দিলেন হুজুর। আমার সব গুলিয়ে যাচ্ছে কেমন। দাঁড়ান হুজুর, আবার তাহলে গোড়া থেকে খেই ধরি।"

জীবনকেষ্ট আবার আনুপূর্বক আরম্ভ করে। যেখানে এসে আটক ছিল প্রায় সেখান অবধি গড়গড় করে গড়িয়ে আসে এক খেয়ায়।

"—তখন উনি দেখলেন যে কন্ডাক্টার বাসের দোতলায় যাচ্ছে। দেখে ফের তিনি তাঁর হাতব্যাগ খুললেন, খুলে মনিব্যাগ বার করলেন, বার করে হাতব্যাগ বন্ধ করলেন, বন্ধ করে মনিব্যাগ খুললেন—"

"বন্ধ করে মনিব্যাগ খুললেন?" হাকিমের খটকা লাগে ঃ "সে আবার কেমন হোলো?" পুনশ্চ তিনি বাধা না দিয়ে পারেন না ঃ "বন্ধ করচেন আবার খুলচেন—দু'রকমের দুটো কাজ একসঙ্গে হয় কি করে?"

"কি করে হয় বলতে পারব না হুজুর, তবে এইটুকুই শুধু বলতে পারি যে হচ্ছিল। একটা খুলচেন আরেকটা বন্ধ করচেন—একটার পর একটা ঘটে যাচ্ছে।" জীবনকেষ্ট প্রাঞ্জল করার জন্যে প্রাণপণ করে।

"বুঝেচি—" হাকিম মাথা নেড়ে বলেন ঃ "আচ্ছা, বলে যাও।"

জীবনকেষ্টর করুণ সুরে শুরু হয় পুনরায় ঃ

"—তখন উনি দেখলেন যে কন্ডাক্টার বাসের দোতলার দিকে হেলতে দুলতে রওনা দিল। অতএব, আবার উনি ওঁর হাতব্যাগ খুললেন, খুলে মনিব্যাগ বার করলেন, মনিব্যাগ বার করে হাতব্যাগ বন্ধ করবেন—কোন্‌টার ভাগ্যে কি ঘটছে ভালো করে লক্ষ্য করুন হুজুর! তারপর হাতব্যাগ বন্ধ করে মনিব্যাগ খুললেন, মনিব্যাগ খুলে তাঁর আনিটি যথাস্থানে রাখলেন। রেখে মনিব্যাগ বন্ধ করলেন, তারপর তাঁর হাতব্যাগ খুললেন, খুলে মনিব্যাগটি রাখলেন ভেতরে—রেখে হাতব্যাগ বন্ধ করলেন!...তারপর তিনি কন্ডাক্টারকে সিঁড়ি দিয়ে নামতে দেখলেন—দেখে ফের তার হাতব্যাগ খুললেন, খুলে মনিব্যাগ বার করলেন, বার করে হাতব্যাগ বন্ধ করলেন, তারপরে মনিব্যাগ খুললেন, খুলে একটা আনি বার করলেন এবং মনিব্যাগ বন্ধ করলেন—"

এরপর তো গঙ্গা যমুনা ..... অতিকায় কইমাছ এসে পড়লো পাতে।

নাও, হাঁ করো। বলেই এক চামচ চিনি আমার মুখগহ্বরে ঢেলে দিলেন তিনি।

হাকিম আর সহ্য করতে পারেন না ঃ "থামো—থামো!" বিশ্রী রকম চেঁচিয়ে ওঠেন তিনি ঃ "তুমি আমায় পাগল করে দেবে দেখচি।"

"আজ্ঞে, আমারও ঠিক তাই হয়েছিল বোধ হয়।" ম্লান হাসির সঙ্গে করুণ স্বরের মিক্‌চার করে জীবনকেষ্ট জানায়,—"কিন্তু হুজুর বলেছেন সব কথা খুলে বলতে, কিচ্ছু না গোপন করে—আমারো না বলে উপায় নেই। যেমন যেমনটি আমি দেখেছি তেমন তেমনটি হুজুরকেও আমি দেখাতে চাই। তারপর তিনি করলেন কি, মনিব্যাগ বন্ধ করে হাতব্যাগটা খুললেন, খুলে—"

"বটে? দেখাতে চাও? আমাকে দেখাতে চাও? আমার সামনে দাঁড়িয়ে আমাকেই দেখাতে চাও? য়্যাদ্দুর আস্পর্ধা!"

হাকিমের চোখমুখ কিরকম যেন হয়ে ওঠে—তাঁর হুকুম কি হুমকি ঠিক বলা যায় না, আদালতের কড়ি বরগা পর্যন্ত কাঁপিয়ে দেয়।

"তবে এই দ্যাখো।" এই বলে হাকিম আসন ছেড়ে উঠে, কাঠগড়ার কাছে গিয়ে জীবনকেষ্টর গালে দারুণ এক চড় বসিয়ে দ্যান। বলেন—"এই দ্যাখো তবে। হয়েছে এবার?"

"হুজুর, আমিও এর বেশি কিছু আর করিনি।" জীবনকেষ্ট সকাতরে দেখায়—"এই এখন দেখলেন তো হুজুর।"

তিন

রসি দিয়ে বাঁধে এবং সিক্‌ দিয়ে বেঁধে সেই হচ্ছে রসিক। বীরবল রসিকের এই ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। কিন্তু দাম্পত্য রসের ব্যাপারে এবং ওর ব্যাপারীর বেলায় এই ব্যাখ্যা অচল। মামুলি নব রসের কোনোটার পর্যায়ে এই দাম্পত্য পড়ে না ঃ ওই নয়কে জড়িয়ে, একসঙ্গে ওতপ্রোত করলে যে জর্জর রস দেখা দেয় তাই হচ্ছে দাম্পত্য। দাম্পত্য দশম রস।

এবং বিষম দশা। ওর রসিকের ব্যাখ্যাও উলটো। যে নাকি রসির দ্বারা বন্ধ এবং সিকের দ্বারা বিদ্ধ হতে পারগ এবং ঐ বিঁধা-বাঁধির মধ্যে পড়বার জন্য সর্বদা তৎপর, সেই হচ্ছে আসল দাম্পত্য-রসিক—নম্বর এক। একেবারে অকৃত্রিম জাতীয় ঃ তার মধ্যে কোনো ভ্যাজাল নেই।

এরূপ রসিক বিরল নয়। আমাদের জীবনকেষ্টই একজন। বিয়ের প্রথম পর্বে ঐ রসটা যখন টগবগে হয়ে থাকে ও এখন সেই অবস্থায়। এর পরে আরো পর্ব আছে—সে এক মহাভারত। তার ভেতরেও কুরুক্ষেত্র, শরশয্যা ইত্যাদি বাদ নেই, তবে সে ক্রমশঃ প্রকাশ্য। জীবনকেষ্ট এখন আদি পর্বে। এই অনাদি রস যখন গাঢ় হয়ে ওঠে, কিংবা আপনা থেকেই থিতিয়ে পড়ে, কিংবা চাঁছি হয়ে প্রায় পুঁছে যাবার যোগাড় হয়, আর রসিকের অন্তস্তলে স্বভাবতঃই নানান প্রশ্ন জাগে,

হাসির ফোয়ারা

যথা ঃ এই সে দাম্পত্য—এ কি দামে পোষায় এবং আদৌ পথ্য কিনা—এবংবিধ প্রশ্ন ঃ সেই পার্বণে পেঁছতে জীবনকেষ্টর এখনো কিছু দেরি।

অর্থাৎ জীবনকেষ্টর সবে বিয়ে হয়েছে।

এবং বিয়ে করে সে দেশের বাড়িতে নিয়ে এসেছে বৌকে।

প্রথম মধুনিশা পোহানোর পর ঘুম থেকে উঠে কনুয়ের ওপর ভর দিয়ে প্রাণকেষ্ট বৌয়ের মুখের দিকে তাকালো। প্রথমেই প্রাতরাশের কথা মনে পড়ল ওর—"আমার লক্ষ্মী সোনা, কী খেতে চাইবে কে জানে!"—আপন মনেই বলল ও।

ওর বৌ গাঢ় নিদ্রায় অচেতন—তখনো। তার কপালে রেখা পড়তে দেখা গেল। সূর্যের কিরণলেখা যেমন ঊষার ললাটে অবলীলাক্রমে লীলায়িত হতে থাকে প্রায় তেমনি। "ডিমসেদ্ধ কি অম্‌লেট পেলে খেতে পারি।" নিদ্রাজড়িত স্বরে জবাব দিয়েছে ওর বৌ।
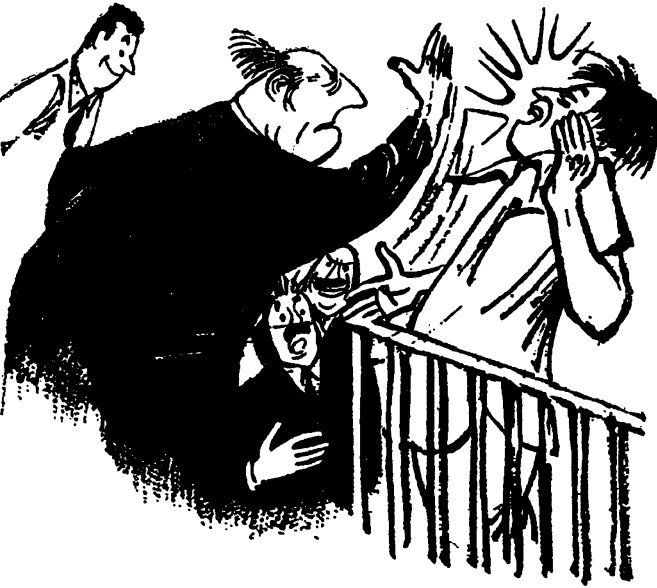
—"এই দ্যাখো তবে। হয়েছে এবার?" [পৃঃ ৪৯

"বেশ। ডিম আছে, বাড়িতেই আছে, আমার বিশ্বাস।" উঠে পড়ল জীবনকেষ্ট ঃ "ঝিয়ের কাছে খবর নিচ্ছি।"

কেবল বৌ-ঝি নিয়েই জীবনকেষ্টর সংসার, তিন কুলে কেউ নেই। শহুরে মেয়ে বিয়ে করে এনে হিমশিম খেতে হবে, অনেকে ওকে ভয় দেখিয়েছিল। কিন্তু শহরের সমস্ত দাপট যদি কেবল ডিম-টিমের ওপর দিয়েই যায় তাহলে কিসের ভাবনা! যতই অজ হোক, ডিম আজো দুর্লভ নয় পাড়াগাঁয়।

"ডিম আছে বাড়িতে?" ঝিকে ডেকে জিজ্ঞেস করেছে সে।

"না। নেই তো।"

কেন নেই, কেনই বা যোগাড় করে রাখা হয়নি? এই প্রশ্ন জীবনকেষ্টর গলায় ঠেলা মেরে উঠলেও সে সামলে নিল। বিয়ের পরে প্রথম কলহটা বুঝি ঝিয়ের সঙ্গে হওয়া বিধি নয়। নিরীহ সুরে সে বলল ঃ

হাসির ফোয়ারা

"গোটা দুয়েক যোগাড় করতে পারো ঝি? যদি মুর্গির নেহাত না পাও, হাঁসের হলেও চলবে।...নিদেন একটা?"

"কোথায় পাবো? পাড়বো নাকি?" ঝিয়ের ঝংকার।

"আচ্ছা আমি নিজেই দেখছি। তুমি উঠে হাত মুখ ধুয়ে তৈরী হও, আমি আনছি ডিম। তারপর স্টোভ ধরিয়ে আমি নিজেই তোমায় অম্‌লেট বানিয়ে দেব!" এই কথা বলে (ঝিকে নয়, বৌকেই বলে) জীবনকেষ্ট মুখ হাত না ধুয়েই বেরিয়ে যেতে প্রস্তুত। আগে ডিম, তার পরে অন্য কথা।

"একবার ভাঁড়ার ঘরটা খুঁজে দেখি আগে। থাকতে পারে ডিম।"

ভাঁড়ার ঘর এবং রান্নাঘরের সমস্ত হাঁড়িকুঁড়ি হাতড়ে দেখা গেলো—কিন্তু সব ভাঁড়েই ভবানী। এ ঘরের ও ঘরের আনাচ কানাচ তন্ন তন্ন করে খোঁজা হোলো—কোথ্‌থাও নেই।

"কী আশ্চর্য! কোথ্‌থাও একটা ডিম নেই গো। অদ্ভুত বাড়ি বটে!" হাঁপ ছাড়ল জীবনকেষ্ট।

এ তাক ও তাক—বাক্স প্যাঁটরা তোরঙ্গ তছনছ করে ফেলা হোলো—

—বৃথাই! অবশেষে সুটকেস হাতড়াতে গিয়ে শার্ট পাঞ্জাবি ইত্যাদির তলায় ডিমের মতন কী যেন একটা ঠেকল ওর হাতে। অশেষ উৎসাহে তুলে নিয়ে দেখল জীবনকেষ্ট, নাঃ, ডিম নয়। দাড়ি কামাবার সেফ্‌টি সেট্‌। সাগ্রহে একবার দেখে তারপর সুটকেসেই অবশেষে তাকে রেখে দিল—"না, এখন নয়। ফিরে এসেই কামানো যাবে।...পাড়ায় ডিম পাওয়া যায় কিনা দেখা যাক!"

"খুব বেশি দেরি হবে না তো ফিরতে তোমার?" জিগেস করল বৌ। শুয়ে শুয়ে এতক্ষণ সে মুগ্ধ দৃষ্টিতে জীবনকেষ্টর কার্যকলাপ দেখছিল।

"নাঃ, দেরি কিসের? যাবো আর আসবো।" জীবনকেষ্ট জানায়। সীতার জন্যে স্বর্ণমৃগের সন্ধানে বেরুতে রামচন্দ্রের প্রাণ কেমন করেছিল কে জানে, কিন্তু বৌয়ের খাতিরে ডিমের মৃগয়ায় বার হতে জীবনকেষ্টর বেশ আরাম লাগে। তাঁর তুষ্টিতে জগৎ তুষ্ট, আয়েষার তুষ্টিতে জগৎসিংহ তুষ্ট, বৌয়ের আয়েসে জীবনকেষ্ট পরিতুষ্ট। তার প্রাণ কানায় কানায় ভরে ওঠে। মনের মধ্যে ডিণ্ডিম বাজে।

দৃঢ়চেতা জীবনকেষ্ট হন হন করে বেরিয়ে পড়ে। এত সকালে সদ্যবিবাহিতের শোভাযাত্রা দেখে জনৈক পড়শী পথের মধ্যে থমকে দাঁড়িয়েছিল, জীবনকেষ্টর প্রশ্নাঘাতে একটু দাড়ি চুলকে সে বলল—

"ডিম? ডিম কোথায় পাওয়া যায় তা তো বলতে পারব না। তবে একটু এগিয়ে বাজারের কাছটায় নতুন চায়ের দোকানে দেখতে পারেন। যদি থাকে ঐখানেই থাকবে। তবে সঠিক করে কিছু..."

কিন্তু শ্রোতা ততক্ষণে নতুন চায়ের দোকানের এলাকায় গিয়ে পৌঁছেচে।

"না মশাই, ডিম আমরা রাখি না। ডিম আর পাড়াগাঁয় কটা লোক খায় বলুন রোজ? ডিম রাখলে পচে যায়। দু-পয়সা কাপ চা, তারই দাম পাই না মশাই, তার ওপরে আবার ডিম..."।

অতো কৈফিয়ৎ শোনার তার সময় নেই। ততক্ষণে সে পাশের বেগুনির দোকানে পাশ ফিরেছে।

গ্রহবৈগুণ্য আর কাকে বলে? বেগুনিওয়ালা তো ডিমের নামোচ্চারণেই নৃত্যকালী। কপালে করাঘাত করে সে চেঁচিয়ে উঠেচে—"ডিম? এই সকালে ডিম? এখনো বউনি করিনি আর প্রথমেই তুমি অযাত্রা ওই ডিমের নাম করলে?..." সে হায় হায় করতে থাকে।

এ তাক ও তাক—বাক্স প্যাঁটরা তোরঙ্গ তছনছ করে ফেলা হোলো— [পৃঃ ৫১

সে বউনি করেনি তবে জীবনকেষ্ট করেচে, কিন্তু তার টীকা-ভাষ্যের চেয়ে টিকে থাকার পক্ষে পালানোই যে শ্রেয়ঃ বোধ করল। **সেখান থেকে পালিয়ে জীবনকেষ্ট আরেক দোকানে হানা দিল। দোকানের মাথায়** আলকাতরালাঞ্ছিত দেবাক্ষরে তক্তার সাইনবোর্ড লাগানো ঃ "আমরা গেরস্থর যাবতীয় জিনিস সরবরাহ করি।"

এখানে আবার পাছে সেই বউনির গেরো বাঁধে—(বউনি আর বউ নিয়ে সর্বত্রই মুশকিল!) জীবনকেষ্ট আগেই আধ সেরটাক্ গুড় কিনে বসল। তারপর দোকানীর কানের গোড়ায় ফিস ফিস করে বললে, (ঠিক যেমন করে লোকে কোকেনের খোঁজ করে থাকে) ভায়া, আমাকে গোটা দুই ডিম দিতে পারো? বড্ড দরকার।

শুনে দোকানদারের হাসি আর ধরে না। "—ডিম? বিয়ে করলে লোকে রসিক হয় বাস্তবিক —বিয়ে করলে—"

রসিক ছাড়াও আরো কি কি হয়, গোরু ভেড়া গাধার মতো কোনো চতুষ্পদ হয়ে যায় কিনা

এই ধরনের আরো মন্তব্য হয়তো ওর ছিল, কিন্তু অট্টহাসির দ্বিতীয় চোট এসে পড়ায় সেটা চাপা পড়ে যায়।

জীবনকেষ্ট বিরক্ত হয়ে আধ সের গুড় ঘাড়ে করে বেরিয়ে পড়ে। এবার গাঁয়ের চৌকিদারের সঙ্গে দেখা। যে-লোকটা এত চোর-ডাকাতের খবর রাখে সে কি আর একটা ডিমের খোঁজ দিতে পারে না? আইনের রক্তচক্ষু যদিও, তবু বৌয়ের কোমল দৃষ্টির কথা স্মরণ করে তার সামনে এগিয়ে যেতে সে ভীত হলো না। চৌকিদারকেই গিয়ে পাকড়ালো।

"ডিম? ডিম ইখানে কুথ্‌থাও পাবা না। দাগী আসামীর মতো ডিম সব চালান যায়। এই রাস্তা ধরে দেড় মাইল গেলে রহমান মিঞার বাগান মিলবে, তিনি মুর্গি পোষে আমি জানি। তার লগে গিয়ে মাগলে দু' একটা ডিম তিনি দিতে পারে, মর্জি করে যদি।" বলে চলে গেল চৌকিদার।

ডিমের লালসা পরিত্যাগ করবার জীবনকেষ্টর বাসনা হোলো বারেক। কিন্তু লালসা তার নিজের নয়, নইলে ঘোড়ার ডিমের পাঠশালা থেকে একদা যেমন সে পালিয়েছিল, তেমনি এই ডিমের ত্রিসীমানা থেকে পালিয়ে যেতেও তার কোনো দ্বিধা ছিল না। কিন্তু লালসা তার নিজের নয়, ঐখানেই বাধা এবং ঠিক এই কারণেই ওর এই প্রাণপণ।

এবার প্রাণপণ হন্টন শুরু হোলো ওর। নিজের গাঁ ছাড়িয়ে, ছোটখাট আরো দু একটা গণ্ডগ্রাম ডাইনে বাঁয়ে রেখে আড়াই মাইল হেঁটে গেলে রহমৎপুরে রহমান খাঁর বাগান। বাগান এবং বাড়ি।

দেড় মাইল কখন পেরিয়ে গেছে কিন্তু রহমান খাঁর বাগান আর আগায় না। সূর্য আকাশে কতো মাইল উঠে গেল বলা কঠিন, বেলা বোধ হয় ন-দশটার কম নয়, হেঁটেই চলেছে জীবনকেষ্ট। একটা ডিমের জন্য তার সর্বস্ব যায় যায়!

যেতে যেতে হঠাৎ, কোকিলের কুহুধ্বনি শুনে পথিকেরা যেমন চমকে ওঠে, জীবনকেষ্টও তেমনি বিচলিত হয়ে উঠল। অদূর থেকে একটা আওয়াজ শোনা গেল—"কোকরকোঁ......!"

থমকে দাঁড়ালো জীবনকেষ্ট। বেড়াঘেরার আড়ালে একটা বাগানের মতো না? এইটাই কি তবে সেই আস্তানা—রহমান সাহেব এবং তাঁর মুর্গিদের? কিন্তু কোন্ দিক দিয়ে পথ এবং কোন্ ধারে তাঁর রহমৎখানা কিছু বোঝবার উপায় নেই। অগত্যা, বেড়া ফাঁক করে হামাগুড়ি দিয়ে ঢোকাই প্রশস্ত বোধ করলো জীবনকেষ্ট।

এভাবে বেড়ানো, বিশেষতঃ অপরের বাগানে, খুব নিরাপদ নয়। তবু যতটা দৃষ্টির ওপরে নির্ভর করা যায়, কোনো ধারে কেউ কোথাও নেই ভালো করে সে দেখে নিয়েছে। তারপরে অদৃষ্টের ভরসা। দূরদৃষ্টি আটকানো যায় না, অনেক সময় দেখা যায়।

হাসির ফোয়ারা

বেড়ার ফাঁক না বলে বেড়ার ফাঁকি বলাই উচিত। কেননা গর্তটা যেমন বেঁটে, জীবনকেষ্ট নিজে তেমন খাটো নয়। কাঁটা ঝোপের বেড়া, জীবনকেষ্ট নিতান্ত সংকুচিত হয়ে প্রবেশ করলেও তাদের তেমন ভদ্রতা-বোধ নেই—পিঠের থেকে পাঞ্জাবি খানিকটা খাবলে নিয়েছে।

তা নিক, জীবনকেষ্ট পৃষ্ঠভঙ্গ দেবার পাত্র নয়—কাঁটার আক্রোশে হাত, পা, গা এবং গাল ছড়ে গেলেও এত ক্লেশের পর সে ডিমের নাগালে এসেছে। কাঁটাকে কাটিয়ে ধুলোয় কাদায় মাখামাখি এবং কণ্টকিত জীবনকেষ্টর বাগানে হস্তক্ষেপ—পদক্ষেপও বলা যায় কিন্তু সমস্ত কষ্ট মুহূর্তের মধ্যে সে ভুলল, যখন দেখল তার সকল কাঁটা ধন্য করে বাগানের মধ্যে ফুল ফুটে আছে ঃ প্রায় ডজনখানেক মুর্গি বসে আছে অদূরে ঃ বড় বড় অধ্যবসায় নিয়ে বিরাট কর্মীরা যেমন করে বসে থাকে।

একটু পরেই একটা মুর্গি উঠে গেল এবং তার পরিত্যক্ত স্থলে সে দেখল—স্পষ্টই দেখল মণির চেয়েও মহার্ঘ—উজ্জ্বল একটি ডিম। জীবনকেষ্ট তার প্রাণ দেখতে পেল যেন।

সেই প্রাণের ডিমটি হাতে নিয়ে জীবনকেষ্ট যেন তার প্রাণ হাতে পেল। হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে ডিমটি তুলে যেমনি না পকেটজাত করা, অমনি তার নজরে পড়ল এক বাঘা কুকুর। কুকুরটাও তাকে দেখেছিল।

দেখেছিল অনেক আগেই। এতক্ষণ হয়ত অবাক হয়ে ওর কাণ্ডকারখানা দেখছিল, কিন্তু এবার তেড়ে এসে প্রতিবাদ না করে পারল না। আর সে কী প্রতিবাদ!

কুকুরের ওষুধ হচ্ছে মুগুর ও লগুড়ও হয়ত-বা, কিন্তু জীবনকেষ্টর হাতের কাছে গুড় ছাড়া আর কিছু ছিল না। তাও ওজনে আধসের টাক্ মাত্র। অগত্যা তাই ছুড়েই সে কুকুরটাকে তাক্ করল। এবং সেই ফাঁকে ক্ষিপ্রতর হামাগুড়ি-প্রদানে বেড়ার সুঁড়িপথ ধরে লম্বা দেবার চেষ্টা দেখল।

এদিকে গুড়ের তাল সামলে কুকুরটাও ওর পেছনে এসে লেগেছে। এসেই তার কাছায় বসিয়েছে এক কামড়। সে এক প্রাণ নিয়ে টানাটানি কাণ্ড—জীবনকেষ্টর টানাপোড়েন! কুকুর টানে কাছা আর জীবনকেষ্ট টানে আপনাকে। এধারে কাঁটা ঝোপের পক্ষপাতিত্বে তার আগপাশতলা ছড়ে যেতে থাকে।

অবশেষে উভয়পক্ষেরই জিৎ। জীবনকেষ্ট প্রাণ নিয়ে গলে এল, কুকুর ওর কাছা নিয়ে চলে গেল।

যাকগে, দুঃখ নেই, ডিমের কোনো অঙ্গহানি হয়নি। অটুট অবস্থাতেই রয়েছে তার পকেটে। প্রাণে তার কোনো ক্ষোভ ছিল না, বিজাতীয় আনন্দে বরং একটা বিজয়ীসুলভ মৃদুহাস্যই ছিল ওর মুখে।

হাসির ফোয়ারা

জীবনকেষ্ট এখন ফিরতি পথে। ছিন্নবেশ, ভিন্নকচ্ছ, পাগলের মতো চেহারা জীবনকেষ্টর। ভাবতে ভাবতে চলেছে। পৃথিবীতে অন্নকষ্ট সব নয়। অন্যান্য কষ্টও আছে। যেমন এই ডিমের কষ্ট। বিয়ে করার কষ্টও কিছু কম না। ভেবে দেখলে, জীবনধারণ করাই কষ্টকর। কষ্ট করার জন্য—কষ্টের ধারণা করার জন্যই মানুষের জীবন।

তবু মানুষের অন্নকষ্ট দূর হওয়া দরকার, কেউ কেউ বলেন। সত্যই কি দরকার, জীবনকেষ্ট ভেবে দ্যাখে! যাদের অন্নকষ্ট আছে তাদের ঐ কষ্টটাই একমাত্র, আর কোনো বালাই তাদের নেই। ডিমের কথা তারা চিন্তাই করে না।

যদি তাদের অন্নকষ্ট দূর হয়, তখনই তাদের জীবনে, জীবনকেষ্টর মতো ডিমের কষ্ট দেখা দেবে। নানাজাতীয় ডিমের কষ্ট ঃ অজানাকে না জানার দুঃখ, জানাকে আরো জানার দুর্দশা ; কত কিছু পেয়ে কিংবা না পেয়ে হারানোর ব্যথা, কত কী পেয়ে না হারানোর গ্লানি ; কত রকমের সুখের কষ্ট আর শখের কষ্ট! অন্নভাণ্ড যদি পূর্ণ থাকে, ব্রহ্মাণ্ডের কত না কষ্ট আপনা থেকেই এসে গায় পড়ে—কাব্যজিজ্ঞাসা থেকে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা পর্যন্ত,—ওরই মধ্যে হয়তো কখন আবার ভগবানকে না পাওয়ার কষ্টও দিতে কসুর করে না, সুখের মধ্যে এসে ভূতেরা কিলকিলিয়ে যায়!.........বাস্তবিক, একবেলার মধ্যেই জীবনকেষ্ট প্রচণ্ড দার্শনিক হয়ে উঠল।

কুকুর টানে কাছা আর জীবনকেষ্ট টানে আপনাকে। [পৃঃ ৫৪

বারোটা বাজিয়ে জীবনকেষ্ট বাড়ি ফিরল। বিমুগ্ধদৃষ্টিতে বৌয়ের দিকে তাকিয়ে বলল ও ঃ "ফিরতে বড্ড দেরি হয়ে গেল—না গো?"

বৌয়ের চোখেও পলক নেই।—"একি? এ দশা কে করল তোমার?"

কে করল, তাকে চোখের সামনে দেখা গেলেও, তার চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো যায় না। অন্ততঃ এই মুহূর্তে জীবনকেষ্ট সেটা বাঞ্ছনীয় জ্ঞান করে না।

চার

অণিমা ছটফট করছে তখন থেকে। সাতটা বেজে গেল—এখনো জীবনকেষ্টর দেখা নেই। হয়ত এখনই মহিমারা এসে পড়বে। আপিস থেকে একটা দিনও—আজকের দিনটাও—কি একটু চটপট বাড়ি ফিরতে নেই? ও'র আসার আগে যদি ওরা এসে পড়ে আর গৃহকর্তাকে অভ্যর্থনা-কালে অনুপস্থিত দ্যাখে তাহলে কী বিচ্ছিরি হবে ভাবো দিকি? কোনো দিনও কি একটু আক্কেল হবে না ও'র।

অণিমা ছটফট করে। ছটফট করে ঘুরে বেড়ায়। নিজের কক্ষপথে ঘুরতে ঘুরতে এধারের জিনিস নড়িয়ে ওধারে রাখে, ওদিকের জিনিস সরিয়ে এদিকে আনে—তারপর এক এক সময়ে দূরে সরে এসে দাঁড়িয়ে নিরীক্ষণ করে—হ্যাঁ, এইবার দেখতে আরো একটু ভালো হলো। বেশ মানানসই হয়েছে এবার।

কিন্তু তা যেন হলো—তাই দেখালো—কিন্তু এই অনুগৃহীত জগতের সবচেয়ে বড় দ্রষ্টব্য, গৃহস্থ যে, তারই এখনো দেখা নেই।

ধূমকেতুর সংঘর্ষে পৃথিবীর কক্ষচ্যুত হবার সম্ভাবনা হয় বলে শোনা যায়। কিন্তু সংঘর্ষের আগেই জীবনকেষ্ট ঘর ছেড়ে পালাবে—এই বা কি কথা? আর তাছাড়া, মহিমারা কিছু ধূমকেতু নয়, মহিমার বর যদিও ধূমপান একটু ভালোবাসে আর দেখতেও একটু ধূমসো—কিন্তু তাই বলে তাকে ঐ ধূমায়মান আখ্যা দেওয়া যায় না।

নেপথ্যের একটুখানি আওয়াজেই জীবনকেষ্টর আবির্ভাব টের পাওয়া গেল। ঝংকার দিয়ে উঠলো অণিমা : "হ্যাঁগা আজকের দিনেও কি দেরি করে? আজো কি একটু সকাল সকাল বাড়ি আসতে নেই? আমি আধঘণ্টা ধরে ছটফট করছি, কখন তুমি আসো, কখন তারা আসে। আর তুমি এদিকে—"

জীবনকেষ্ট প্রতিবাদচ্ছলেই কিছু বলতে দু'বার হাঁ করেছিল, কিন্তু অণিমার তোড়ের মুখে নিতান্তই তা 'না' হয়ে বুজে গেল।

"—যাও, অমন করে আর সঙের মতো দাঁড়িয়ে থেকো না। হাত মুখ ধুয়ে জামা-কাপড় ছেড়ে তৈরী হয়ে নাও। এক্ষুনিই তারা এসে পড়তে পারে, জানো তো।"

"সেকথা বার বার জানাবার দরকার করে না অণু," জীবনকেষ্ট বলে। "আসবেই তারা, আমি জানি!"

হাসির ফোয়ারা

"যখনই আমার কোনো আত্মীয়-স্বজন আসে তুমি যেন কেমন ধারা হয়ে যাও।" অণু ফোঁস করে ওঠে ঃ "আপনার লোক আসুক, কে না চায়? তারা বাইরের চাঞ্চল্য বয়ে আনে, জীবনের স্বাদ ফিরিয়ে দেয়। বাঁধা ধরার একঘেয়েমি থেকে বাঁচায় আমাদের।"

"একঘেয়েমি দূর করতে অনেক ঘা খাবার কোনো মানে হয় না।" জীবনকেষ্ট জানায়।

"হ্যাঁগা, তুমি যেন কী! দিনকে দিন কী যেন হয়ে যাচ্ছ—একলষেড়ে একগুঁয়ে কী রকম যেন! কোনো আমোদ ফুর্তি নেই প্রাণে—যেন একটি জরদ্গব! মহিমার বর নিরঞ্জনকে দ্যাখো তো! তোমার চেয়ে বয়সে বড় অথচ কেমন ফুর্তিবাজ!"

"দেখেচি। গতবারে যখন এসেছিল তার ফুর্তির চোট দেখা গেছল। দুখানা চেয়ার দিয়ে সেই যে কী কায়দা দেখিয়েছিল—"

"ভাবো দিকি কী আমোদ—"

"কায়দা দেখাতে গিয়ে চেয়ার দুখানা ভাঙল—দুখানাই দামী দামী চেয়ার—সেই সঙ্গে নিজেও পা ভেঙে পড়ে রইলো মাসখানেক। দিনরাত রুগ্ন শয্যার পাশে তটস্থ থেকে সেবা-শুশ্রূষার হাঙ্গাম—সেই ডাক্তার ডাকো—ওষুধ আনো—সে সব কি ভুলবার? তার ওষুধের দাম, রোগের পথ্যি, ডাক্তারের ফি—তাও আমাদের গুনতে হয়েছে। অথচ চেয়ার নিয়ে ঐ ফুর্তি না দেখালেই কি তার চলতো না? ফুর্তিবাজের বাজে ফুর্তি যতো! এ কি রকমের আত্মীয়তা?"

"আত্মীয়তার মানে তুমি বোঝো? নিজে কখনো কোথাও যাবে না, বেরুবে না, আত্মীয়দের খোঁজ-খবর নেবে না, কেবল নিজের ঘর আঁকড়ে পড়ে থাকবে। আত্মীয়তা কী জিনিস তুমি কি জানবে? মহিমারা এসে এবার বেশ কিছুদিন এখানে থাক তাই আমি চাই।"

"তাই না কি?" জীবনকেষ্ট বলে। 'তাহলেই হয়েছে!' এ কথাটা সে আর উচ্চারণ করে না।

মড়ক মারী দুর্ভিক্ষ অনেক সময় পথ ভুল করে, পতঙ্গপালও ভুল করে অপর ক্ষেত্রে গিয়ে পড়ে, মৃত্যুও শিয়রে এসে অজান্তে ফিরে যায় এক এক সময়, কিন্তু আত্মীয়দের বেলা কখনো অন্যথা হয় না। যে গাড়িতে আত্মীয়েরা আসে তাতে কলিশন হবার কথা কদাপি শোনা যায়নি। জীবনকেষ্টর এইসব শ্রুতি এবং স্মৃতিসুলভ দার্শনিক অভিজ্ঞতাকে সত্য প্রতিপন্ন করে মহিমা আর নিরঞ্জন যথাসময়ে নিরঞ্জন মহিমায় দেখা দিল।

দরজার কড়া নড়তেই অণিমা কান খাড়া করছে। জীবনকেষ্ট বলেচে—"ঐ রে! ওরা এসেছে! ওরাই! ওরা ছাড়া কেউ না।"

বলতে বলতে ওরা এসে পড়ল। অণিমার বোন মহিমা, মহিমার বর নিরঞ্জন, আর নিরঞ্জনের দুলালী ইলা।

হাসির ফোয়ারা

"এই যে জীবনকেষ্ট! কেমন আছো প্রাণ? বহাল তবিয়ৎ তো?" নিরঞ্জনের পুরাতন ফুর্তি দেখা গেল—প্রথম দর্শনেই।

"নিরঞ্জন যে! ভালো আছো বেশ?" জীবনকেষ্টর শুকনো অভ্যর্থনা। "মহিমা, আমাদের যে ভুলে যাওনি, তুমিও যে এসেছো—তাতে যে কী খুশী হলাম বলতে পারি না।"

"আপনাদের কখনো ভোলা যায় জামাইবাবু, কী যে বলেন!" মহিমা বলে : "ইলা, তোমার মেসোমশাইকে প্রণাম করো।"

"থাক থাক। হয়েছে। ওতেই হবে।" প্রণামাঘাতের ভয়ে জীবনকেষ্টকে পশ্চাদপদ দেখা যায়। "ইলা আমাদের খুব লক্ষ্মী মেয়ে।" অযাচিত সার্টিফিকেট দিয়ে ফ্যালে।

"লক্ষ্মী মেয়ে! হ্যাঁ, লক্ষ্মীই বটে!"—নিরঞ্জন উছলে ওঠে : "আর দু' এক বছর তুমি সবুর করো ভায়া, তারপর দেখো ইলাকে। তখন ওর পদভরে সারা বাংলা টলমল করবে। বলে, এখনই আমাদের পাড়া কাঁপছে!"

"আশ্চর্য নয়। যেমন বাপ-মার মেয়ে! ঘোড়া না হলেও—কিছু না হলেও—থোরা থোরা তো হবে!" জীবনকেষ্ট মনে মনে বলে এবং এখনই তাকে একটু কম্পান্বিত দেখা যায়।

"তাই নাকি, ইলামণি? এত বড়ো হয়েও এখনো তুমি পাড়াময় ছুটোছুটি করে বেড়াও নাকি?" সারা দেশময় ছুটোছুটির কথা জীবনকেষ্ট ভাবতেই পারে না।

"ছুটোছুটি! ছুটোছুটি কি হে! তুমি যে অবাক করলে বন্ধু! ইলা ছুটবে কি? ইলা নাচে। এর মধ্যেই ও যা নাচ শিখেচে দেখলে তাক লাগে।" নিরঞ্জন বিশদ করে দেয়।

ইলাও প্রতিবাদ করে : "আমি এমন কি বড় হয়েছি মেসোমশাই? আমার বয়স তো বারো মোটে।"

পাইকিরি হাসি পড়ে যায়।

"ও, তাই নাকি?" জীবনকেষ্ট নিজের ভুল বুঝতে পারে।

জলযোগের পর সবাই আরাম করে বসেছে, জীবনকেষ্ট বলল : "হ্যাঁ, ভালো কথা! নিরঞ্জন, এবার তোমরা বেশ—বেশ কিছুদিন এখানে থাকচ তো?" মনের কথাটা প্রাণের বহির্গত না করে সে পারে না।

"আঃ, চুপ করো—" অণু উচ্ছ্বসিত হয়েছে।

"তা—মেরে কেটে দিন পনেরো থাকা যাবে 'খন। ছুটি পেলে আরো কিছুদিন কাটানো যেত কিন্তু..."

"সত্যি! দিদির এখানে এমন আরামে দিনগুলো কাটে যে ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু তোমার যা আপিস বাবা!" মহিমাই স্বামীর বাক্য সম্পূর্ণ করে দেয়।

"ওহে, সিগ্রেট আছে?" নিজের পকেট হাতড়ানো শেষ করে নিরঞ্জন পকেটের বাহিরে অনুসন্ধান করে।—"আমার ফুরিয়ে গেছে দেখছি।"

"সিগ্রেট। সিগ্রেট তো আমি খাই নে, জানো তো!"

"আচ্ছা, আনিয়ে দিচ্ছি সিগ্রেট।" বলে সে উঠে পড়ে। "নিয়ে আসছি, বোসো।" বলে নিজেকেই আনতে পাঠায়।

"সত্যি! আনিয়ে রাখা উচিত ছিল, আগেই। নিরঞ্জনবাবু ভীষণ সিগ্রেট ভালোবাসেন।" অণিমা বলে ঃ "আমিও বলতে ভুলে গেছি আর উনি—উনি যে নিজের থেকে খেয়াল করে কিছু করবেন তবেই হয়েছে!"...

নৈশ ভোজন সমাধার পর নতুন সমস্যা দেখা দিল। অণুর অনুস্বর শোনা গেল ঃ "ওগো শুনছ?"

"কী—বলো?"

"দ্যাখো, ইলা না হয় আমার কাছে শোবে। মহী আর নিরঞ্জনকে আমাদের বাড়তি ঘরটা ছেড়ে দিলাম। কিন্তু তুমি শুচ্ছ কোথায়?"

"তাই তো! আমি কোথায় শুই!" জীবনকেষ্ট ভাবনায় পড়ল,—"তা—আমার শোয়া—আমাকে শোয়ানো কি এতই দরকার?"

"নাও, রসিকতা রাখো। ভাঁড়ার ঘরে যে বেঞ্চিটা আছে তার থেকে হাঁড়িকুঁড়িগুলো নামিয়ে তোমার জন্যে বিছানা করে দেব?...ডবোল করে পাতা যাবে 'খন—বিছানা তাতে পুরু হবে বেশ। আরাম করে শুতে পারবে?"

"সেই বেঞ্চিটা, যার থেকে সেবার আমি পড়ে গেছলাম? সেবারে নিরঞ্জনরা এলে শুয়েছিলাম যাতে—সেইটে তে? না, তাতে আর আমি শুচ্ছিনে।"

"অবাক করলে! কেন, বেঞ্চিতে কি শোয়া যায় না? শোয় না মানুষ? রেলগাড়িতে তবে লোকে শুয়ে যায় কি করে?"

"প্রাণ হাতে করে। দিনের পর দিন—রাতের পর রাত—নিজেকে হাতে করে থাকা আমার পোষাবে না। তার চেয়ে আমি মাটিতে শোব।"

"বেশ। তাহলে স্নানের ঘরে তোমার জন্যে বিছানা করে দিই? কেমন?"

"আমি স্নানের ঘরে শোব মাসিমা।" ইলাকে উৎসাহিত দেখা যায় ঃ "চান করবার ঘর—আহা—সেখানে শুতে কী আরাম!"

"না। তুমি কেন স্নানের ঘরে শুতে যাবে? তুমি আমার কাছে থাকবে।"

"আমি স্নানের ঘরে শুতে পারব না। কলটা খারাপ হয়ে গেছে। টপ্ টপ্ করে জল পড়ে।" জীবনকেষ্টর আপত্তিকর কারণ জানা যায়। —"আর মাথায় জল পড়লে আমার আবার ঘুম হয় না।"

"কেন, ছাতা মাথায় দিয়ে ঘুমোনো যায় না—না কি? তুমি তাজ্জব করলে!"

হাসির ফোয়ারা

এমন আশ্চর্য কাণ্ড—এমন কি, অণুরও অনুমানের বাইরে—জীবনকেষ্টর এহেন আদিখ্যেতা প্রত্যক্ষ হয়ে দেখা দেবে তা সে ভাবতে পারেনি।

"তার চেয়ে আমি বাইরের ঘরে শোবো। আমার আরাম চেয়ারে।" জীবনকেষ্ট জানায়।

"নিরঞ্জন তো ঐ চেয়ারটায় আরাম করবে। অনেক রাত অবধি সে গল্পের বই পড়ে—জানো না নাকি?"

"তাহলে আমার শোবার জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না। আমি আরো বাইরে গিয়ে শোব। সামনের ফুটপাথেই। সেও আমার ভালো।"

জ্বলন্ত দৃষ্টি হেনে, জীবনকেষ্ট ফুটপাথের সন্ধানেই কিনা বলা কঠিন, সবেগে বেরিয়ে যায়। অণিমা ইলার দিকে ফেরে : "তোমার মেসোমশাই ঐরকম! আপনার লোকরা বাড়ি এলে য্যাত খুশী হন যে বলা যায় না। যাতে সবার আরাম হয়, সবাই সুখে থাকে তাই উনি চান। নিজের জন্যে ভাবেন না মোটেই।"

কিছুক্ষণ ফুটপাথে ফুটপাথে, শুয়ে শুয়ে নয়, ঘুরে ঘুরে সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। অনেকক্ষণ কাটিয়ে অবশেষে প্রাণান্ত অবস্থায় জীবনকেষ্ট কয়লার ঘরে এসে আশ্রয় নেয়—ছুঁচো এবং ইঁদুরদের আপত্তি অগ্রাহ্য করেই। তাদের স্বচ্ছন্দ বিচরণের দিকে দৃকপাত না করে এক কোণে কয়লা সরিয়ে কোঁচার খুঁট দিয়ে একটু ঝেড়ে ঝুড়ে সে লম্বা হয়ে পড়ে। ছুঁচোদের সুখসুবিধা কেন সে দেখতে যাবে? ছুঁচোরা কিছু তার আত্মীয় নয়।

শুয়ে শুয়ে সে ভাবে। মানুষের সবচেয়ে কঠিন পীড়া এই আত্মীয়পীড়া, নানারকমের মারাত্মক বীজাণু আত্মীয়ের ছদ্মবেশে এসে বাসা বাঁধে। সহজে সারে না, একেবারে সারে। এ ব্যায়রামের প্রধান লক্ষণ এই, ব্যয় আছে, কিন্তু আরাম নেই। তাছাড়া উপসর্গ অনেক—কোন্‌টা কখন দেখা দেবে বলা কঠিন।

আত্মীয়-ঘটিত এই পীড়ার সবচেয়ে দুর্লক্ষণ দেখা দেয় আত্মীয়ের পীড়া হলে। সেই পীড়ার ওপরে পীড়া ; একেবারে পীড়াপীড়ি। সংস্কৃত করে বললে পীড়ম্‌পীড়া। আর চলতি ভাষায় বলতে গেলে, গোদের ওপর বিষফোড়া। খুব সম্ভব, সর্বস্বান্ত হওয়া কিংবা ভিটে ছেড়ে পালিয়ে যাওয়াই সেই দুশ্চিকিৎস্য উৎপীড়ার প্রতিকার।

আত্মীয়রা পর নয়, কাজেই পরম্পরায় পীড়াদায়ক হলেও তাদের মেরে ধরে তাড়ানো রীতি নয়। তাতে আত্মীয়তা অটুট থাকে না। অথচ এধারে আত্মরক্ষা ও আত্মীয়তা রক্ষা একাধারে অসম্ভব। জীবনকেষ্ট কী করবে? পাগল হয়ে যাবে কিনা এই কথাই সে শুয়ে শুয়ে ভাবে।... কিন্তু পাগল। দাওয়াটা কি সহজ? ইচ্ছে করলেই কি পাগল হওয়া যায়? পাগল হওয়া এক রকমের দৈব ঔষধ—দৈবাৎ এক আধজন পাগল হয়। দাওয়াইটা প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ বটে, কিন্তু সবাই কি পায়? জীবনকেষ্টর তেমন বরাত নয়। অতো সুখ নেই ওর অদৃষ্টে। দেবতার

আশীর্বাদে সে বঞ্চিত।...শুয়ে শুয়ে হাত কামড়ায়, মাথার চুল ছেঁড়ে, কি করলে পাগল হওয়া যায় প্রাণপণে তার পাঁয়তারা ভাঁজে।—পাগল হতেই বুঝি ওর বাকী রয়েছে কেবল!

ভাবতে ভাবতে ও ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দ্যাখে। স্বপ্ন দ্যাখে কি সত্যি দ্যাখে কে জানে, আকারে প্রকারে হুবহু ওর মতোই আরেক জীবনকেষ্ট—সেই কয়লার ঘরে তার সামনে এসে দেখা দেয়। "বাবা জীবনকেষ্ট!" ডাক ছাড়ে লোকটা।

জীবনকেষ্ট চমকে ওঠে—"হ্যাঁ! কে তুমি—কি বলছ?"

"তোমার বিশ্রামের ব্যাঘাত করলাম বুঝি?" লোকটা একটু কিন্তু-কিন্তু হয়।

"বিশ্রাম? না না এমন কিছু বিশ্রাম নয়। অবিশ্রাম বলতে পারো বরং, নিজের চোখেই তো দেখেছো!" সে দীর্ঘনিশ্বাস ফ্যালে।

"দেখলাম বলেই তো ছুটে এলাম। না এসে পারলাম না। তুমি যে সমস্যায় পীড়িত হচ্ছ তার ওষুধ আমার জানা আছে—সেই কথাই তোমাকে জানাতে এলাম। আমায় চিনতে পারছ কি?..."

জীবনকেষ্টর চেনা-চেনা মনে হয়, সে নিজেই যেন ধুতি-পাঞ্জাবি ছেড়ে চোগাচাপকানের ভেতর সেঁধিয়েছে। আর, যে কারণেই হোক, বহুৎ দিন দাড়ি কামায়নি। কিন্তু 'আত্মানং বিদ্ধি' এই কথা যে-উপনিষৎকার বলেছিলেন তিনি নিজেই কি আত্মাকে বিদ্ধ করতে পেরেছিলেন? জীবনকেষ্টরও তেমনি নিজের শ্রীবৃদ্ধি স্বচক্ষে দেখেও নিজের সম্বন্ধে সন্দেহ থেকে যায়।

"না তো!" ম্লানমুখে সে জানায়।

"কি করে চিনবে! তোমার জন্মাবার ঢের আগেই যে আমি পটল তুলেছি! আমি তোমার বেশ কয়েক পুরুষ আগেকার—তোমারই পূর্বপুরুষ। আমার নাম ধিনিকেষ্ট। শ্রীধিনিকেষ্ট পতিতুণ্ড। আমি কোম্পানির আমলের লোক।"

"ও—তাই বলো! তোমার সঙ্গে আমার দেখাই হয়নি তো চিনব কি করে? কিন্তু সে কথা থাক, আমার এই আত্মীয়সংকটের কি একটা ওষুধ তোমার আছে—বলছিলে না?"

"হ্যাঁ, সেই কথাই। আমার আত্মীয়েরা তোমার মতো নয়—তারা আরো নিকটাত্মীয় ছিল। যারপরনাই আপনার, তাদের খপ্পর থেকে কি করে বাঁচলাম—সেই কথাই বলছি!"

"বলো কি? তোমাদের সময়েও আত্মীয়রা হানা দিত নাকি? আমি তো জানতাম এ সব ব্যাধি আধুনিক সভ্যতার আমদানি। তখনো আত্মীয়রা ছিল—বটে?" জীবনকেষ্টকে অবাক হতে হয়।

"ছিল বলে ছিল! আমার বাবা তিনশো তেয়াত্তরটা বিয়ে করেছিলেন। বড়ো জ্যাঠামশাই চারশো নিরানব্বইটা বিয়ে করতেই দেহরক্ষা করেন—পাঁচশো পুরো করে যেতে পারলেন না—এই দুঃখ নিয়ে নব্বই বছর বয়সে সজ্ঞানে তিনি গঙ্গালাভ করেন। তারপর আমার মেজ-সেজ-ন-রাঙা-ছোট এই সব জ্যাঠা আর খুড়োরা মিলে সবসুদ্ধ কতো যে বিয়ে করেছিলেন তার লেখাজোখা হয়

না। আমার সহোদর ভাই ছিল সাতজন—কিন্তু পৈতৃক ভাইয়ের সংখ্যা এগারো শো চুরোশি—এবং এরা তো শুধু আত্মীয় নয়, আপনার ভাই, আত্মীয়ের বাড়া। তার সঙ্গে জেঠতুত খুড়তুত সব যোগ করে ক' হাজার দাঁড়িয়েছিল তা ধারণা করা যায় না। এই সব আত্মীয়—এবং এদের আত্মীয় এবং—তাদের আত্মীয়দের আত্মীয়তা—এত ধাক্কা আমাকে সামলাতে হয়েছে। ঠ্যালা বোঝো!"

"কি করে চিনবে! তোমার জন্মাবার ঢের আগেই যে আমি পটল তুলেছি!" [পৃষ্ঠা ৬১

জীবনকেষ্ট সহানুভূতি দেখাতে চায়, কিন্তু ভাষায় কুলিয়ে উঠতে পারে না। এই সব পরাৎপর আত্মীয়দের কি করে তিনি পরাস্ত করেছিলেন জানতে ব্যাকুল হয়।

"তা, এত আত্মীয় নিয়ে তুমি খুব বিপদে পড়েছিলে বোধ হয়?"

"বিপদ? বিপদ বলে বিপদ! কোম্পানির চাকরি নিয়েছিলাম বলে আমার একটু রোজগারপত্র ছিল। তাই সবাই মিলে আমার স্কন্ধে এসে ভর করল। নিকট আত্মীয়, দূর আত্মীয়, সুদূর আত্মীয়—কোনো দূরাত্মাই বাদ দিল না। কেউ ছেড়ে কথা কইলো না। তবে ভগবানের ভারী দয়া ছিল আমার ওপর—এক বছরের মড়কে আমার অনেক আত্মীয় খসে গেল—আরেকবার পদ্মার ভাঙনে তলিয়ে গেল কতকগুলো—আর আমার সেজশালীকে টেনে নিয়ে গেল বাঘে—"

"আহা, মহিমাকেও একটা বাঘে টেনে নিয়ে যেত যদি!" জীবনকেষ্ট গুমরে ওঠে।—"কিন্তু বাঘ কি আর আছে আজকাল? এই কলিকালে?" থাকলেও যথাস্থানে সময়মত নেই জেনে ওর দুঃখ হয়।

"বাকী যারা রইলো তারা নাছোড়বান্দা। একেবারে যমের অরুচি। বাঘ ভালুক, কুমির-টুমির কেউ তাদের ছোঁয় না। কি করি? তখন করলাম কি, কোম্পানি চা-বাগান খুলেছিল—সেই চা-বাগানে তাদের চালান করে দিলাম। ধরে ধরে নিয়ে জোর করে মাথা পিছু কুড়ি টাকা হিসেবে বেচে দিয়ে এলাম। একটু কষাকষি করলে আরো কিছু দর উঠত জানি, কিন্তু কে অতো সবুর করে? ওরা আমাকে এমন জ্বালিয়েছিল যে অমন সব আত্মীয়ের দর বাড়াবার একটুও আমার মেজাজ ছিল না—ভাবলাম আর অতো আদরে কাজ নেই। কিসের এত গরজ? নগদ যা মেলে তাই লাভ! আর বলতে কি, আত্মীয়দের থেকে এত উপায়, এমন লাভ আমার জীবনে আর হয়নি। পতিতুন্ডি বংশে তো নয়। ভেবে দ্যাখো, ১২০৲ হিঃ ডজন—দু'শো টাকা করে কুড়ি—এই দরে কতো ডজন কতো কুড়ি যে বেচেছি তার ইয়ত্তা হয় না।" সেই স্মৃতির সৌরভে এতদিন পরেও ধিনিকেষ্ট পতিতুন্ডিকে উদ্‌ভ্রান্ত দেখা যায়।

"আহা, আমিও যদি পারতুম", জীবনকেষ্ট বলে : "তাহলে নিরঞ্জন-জোড়াটিকে বেচে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতুম। কিন্তু কিনবে কে? সে চা-বাগান কি আর আছে? বাগান আছে কিন্তু অমন করে বাগানো নেই। এখন কেনাবেচা করতে হয় না—এখন ওমনি লোক সেধে গিয়ে চা-বাগানের চাকরি নেয়। সভ্যতা বাড়ার সাথে সাথে মানুষের অসভ্যতা যেমন বেড়েছে, তেমনি অসুবিধাও বিস্তর।"

"তাহলে—তাহলে আমার ওষুধ তোমার কোনো কাজে লাগবে না মনে হচ্ছে।" ধিনিকেষ্টকে ম্রিয়মাণ দেখা যায়।

এমন সময় খড়ম খট-খট করে লাল চেলী পরনে জীবনকেষ্টর আরেক প্রতিমূর্তি আবির্ভূত হলেন। তাঁর এক হাতে মড়ার খুলি, তাতে তরল মতো কী যেন পানীয়।

তাঁকে দেখে ধিনিকেষ্ট সাষ্টাঙ্গে লুটিয়ে পায়ের ধুলো নিল।—"ঠাকুরদা যে! কি মনে করে এখানে?"

"আহা, বেচারা বড় কষ্ট পাচ্ছে। সেইজন্যেই আসতে হোলো আমায়।" জীবনকেষ্টকে দেখিয়ে তিনি বল্লেন।

জীবনকেষ্টর দুই চোখে—"??"—এক জিজ্ঞাসা।

"ইনি আমাদের আরো পূর্বপুরুষ, বুঝলে জীবনকেষ্ট! আমার ঠাকুরদা কুলাচার্য শ্রীমৎ কালীকেষ্ট পতিতুন্ডি। সেকালের একজন নামজাদা তান্ত্রিক ছিলেন। কালীসাধন করতে গিয়ে শেষে ইনি কাপালিক হয়ে যান।"

"বৎস জীবনকেষ্ট! তুমি আত্মীয়দের নিয়ে বড় বিব্রত বোধ করছ—তাই না? আর কিছু না, এক কাজ করো। খেয়ে ফ্যালো।" কাপালিক কালীকেষ্ট তাকে এই উপদেশ দিলেন।

"খেয়ে ফেলব—কী বলছেন?" সে হাঁ করে। "কাকে খাবো?"

"কেন, ঐ আত্মীয়দের। এক একটাকে ধরো, আর ধরে ধরে খাও। এ ছাড়া আর উপায় নেই—নান্য পন্থা বিদ্যতে আয়নায়।"

"আত্মীয়দের খাবো, বলছেন কি আপনি! তা কি করে খাওয়া যায়? তারা অতি অখাদ্য যে!" জীবনকেষ্ট তেমন উৎসাহ পায় না।

"মোটেই না, তোমার ধারণা ভুল। শুধু ঐ ভাবেই ওরা সুস্বাদু হতে পারে। রসনার পথেই ওদের রসালো করা যায়—নতুবা ওরা ভারী বেরসিক। আমি কাপালিক হলাম কেন? কেন? ঐ খাবার লোভে আমার আত্মীয়দের—যারা আমাকে হৃদয়ে স্থান দিয়েছিল আর আমার গৃহে স্থান নিয়েছিল—তাদের গর্ভে ধারণ করতে দ্বিধা করিনি। আমাদের সময়ে একটা সুপ্রথা ছিল। নরবলি প্রথা। এখন আর নেই বোধ হয়? কিন্তু তুমি এক কাজ করো। আগে ওদের কালীঘাটে নিয়ে যাও মার কাছে বলি দিয়ে তারপর খেয়ো। তাহলে আর কোনো দোষ থাকবে না। তুমিও উদ্ধার পাবে, ওরাও উদ্ধার হয়ে যাবে। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা—ওরই নাম মহাপ্রসাদ।"

"না, যতই ত্যক্ত হই—তা আমি পারব না।" জীবনকেষ্ট বলে ঃ "ও কাজ করলে আমার ফাঁসি হয়ে যাবে। যাদের খাওয়াতে ফতুর হতে হয় তাদের খেলে না-জানি আরো কী দুর্গতি হবে! হয়তো সেটা ফাঁসির খাওয়া হতে পারে।"

"তোমার কোনো ভয় নেই, মা আছেন। এই নাও, একটু কারণবারি পান করে নাও। মনে জোর পাবে।" মড়ার খুলিটা কালীকেষ্ট বংশধরের দিকে এগিয়ে দেন।

"ছি, ঠাকুরদা! এমন জ্ঞানী, প্রবীণ, বিবেচক হয়ে তুমিও কিনা শেষটায় ছেলে বখাচ্চো, ছিঃ!" ধ্বনিকেষ্ট আপত্তি না করে পারে না।

"কোন দ্বিধা কোরো না, জীবনকেষ্ট! পান করো। তোমার ওপরে আমি অনেক ভরসা করেছিলাম। আমাদের বংশে আরেকজন কাপালিক জন্মাবে এই আমার সাধ ছিল। যদি আমার সে-আশা তোমার দ্বারা পূর্ণ হয় সারা বংশ কৃতার্থ হবে, আমিও ধন্য হবো।"

উপরোধে পড়ে জীবনকেষ্ট কারণের একটুখানি স্বাদ নেয়, কিন্তু কার্যের বিষয়ে তার কোনো উদ্দীপনা দেখা যায় না। কার্যকারণের সমন্বয় না দেখে কুলাচার্যও একটু ক্ষুণ্ণ হন।

জীবনকেষ্ট তাঁকে অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা করে ঃ "আজ্ঞে, একেবারে না খেলে কি হয় না? রামকেষ্টদেব—তিনি আমাদের পতিতুন্ডি বংশের কিনা জানি না—বলতেন যে ফোঁস করো, তাতে কোনো দোষ নেই, কিন্তু ছোবল মেরো না কখনো। তা, তা, আত্মীয়দের বেলাও, না খাবলে কেবল ফোঁস করলে হয় না?"

কালীকেষ্ট ফোঁস করে ওঠেন।—"রামকেষ্টদেব? কে সে? তিনি দেবতা হতে পারেন কিন্তু আমাদের আত্মীয়দের তিনি কী বোঝেন? কী জানেন তিনি? এ বিষয়ে কদ্দুর তাঁর অভিজ্ঞতা—শুনি?"

"তা বটে! এ সব দৈত্য নহে তেমন।" জীবনকেষ্ট সায় দেয়।

"তাছাড়া, যদ্দূর মনে হচ্ছে, তিনি পতিতুণ্ডি ছিলেন না। কে ছিলেন রামকেষ্টদেব? আমরা কখনো তাঁর নাম শুনিনি—তিনি যেই হোন, যত বড় দেবতাই হন, পতিতুণ্ডিদের সমস্যা বোঝা তাঁর কর্ম নয়। বরং আমাদের প্রাতঃস্মরণীয় বটকেষ্ট পতিতুণ্ডির কথা বলতে পারো। তিনি বলতেন, যদি ফোঁস করে ছেড়ে দাও তো পরে আপসোস করবে। ফোঁস নয়, আগে গিয়ে ফাঁসাও—নইলে দেখবে সেই এসে তোমাকে ফুস করে দিয়েছে—আত্মরক্ষার কোনো সুযোগ না দিয়েই। তাই ফাঁসি যেতে হয় তাও স্বীকার কিন্তু আগে ফাঁসিয়ে যাওয়া চাই।"

জীবনকেষ্টর টনক নড়ল ঃ "কে আসচেন না? চেনা চেনা আওয়াজ পাচ্ছি। আমাদের কোনো আত্মীয়ই বোধ হয়?"

আত্মীয়ই বটে। নামাবলী গায়ে, কপালে তিলক, গলায় কণ্ঠি, জীবনকেষ্টর অনুরূপ আরেক শ্রীমূর্তি দর্শন দান করেন।

"আমার অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ—প্রভুপাদ শ্রীল শ্রীহরেকেষ্ট পতিতুণ্ডি। তোমাদের ইনি কে হন—তোমরা নিজেরাই তা আন্দাজ করে নাও।" কুলাচার্য নত হয়ে প্রভুপাদের পদধূলি নেন।

জীবনকেষ্টর আন্দাজ অতদূর পৌঁছায় না—একটু চেষ্টা করে সে হাল ছেড়ে দেয়। "প্রভুপাদ এমন বেশে এখানে যে হঠাৎ?" জিজ্ঞেস করেন কুলাচার্য।

"আর বলো কেন? বংশলোপের আশঙ্কায় আসতে হোলো। বেচারা জীবনকেষ্ট পাছে বাড়ি ছেড়ে বিবাগী হয়ে যায় সেই ভয়ে—"

"প্রভু! একটুখানি আমাদের কুঁড়ে, আমাদের দুজনেরই কুলোয় না। তার ওপরে—" জীবনকেষ্ট প্রায় কাঁদো-কাঁদো হয়ে পড়ে।

"ঠিক কথা। আমার জীবনেও এই সমস্যা দেখা দিয়েছিল। আমার কুঁড়েতেও রাজ্যের কুড়ে লোকের আমদানি দেখেছিলাম। তবে আমি কিন্তু তাদের তাড়ালাম না, আসতেও বারণ করলাম না—তাদেরই ঘাড় ভেঙে আমার প্রসাদ বানালাম। কালক্রমে সেই প্রসাদ ফলাও হয় বেড়ে ওঠে মহাপ্রাসাদ হয়ে দাঁড়ালো।"

"হ্যাঁ, উনি বলছিলেন বটে—মহাপ্রসাদের কথা।" জীবনকেষ্ট বলে ঃ "কিন্তু ওতে আমার তেমন রুচি হচ্ছে না।"

"মহাপ্রসাদ নয় মূর্খ, মহাপ্রাসাদ। রাজরাজড়াদের যা থাকে, তাই। নবাবদের রঙ্‌মহল শীস্‌মহল সব জড়ালে যা একখানা হয়, তার কথাই বলছি।"

আ-কারভেদে প্রসাদ এবং প্রাসাদের পার্থক্য অনুভব করার প্রয়াস পায় জীবনকেষ্ট ঃ "প্রভু, কি করে তা হোলো আমায় সবিশেষ বলুন!"

"সেরেফ্‌ মন্ত্রের জোরে। আবার কি?" প্রভুপাদ প্রকাশ করলেন, "তারাও আসতে লাগল, আমিও তাদের মন্ত্র দিয়ে গুরুদক্ষিণা নিয়ে ছাড়তে লাগলাম। গলায় কণ্ঠি আর কীর্তন দিয়ে, কণ্ঠে আর পৃষ্ঠে নামাবলী দান করে ছেড়ে দিলাম। তাদের ইহলোকের যথাসর্বস্ব কেড়ে নিয়ে

পরলোকের পথ মুক্ত করে দিলাম। যেমন হাসতে হাসতে তারা এসেছিল—কাঁঠাল হাতে করে আমার মাথায় ভাঙ্গবার মতলবে—কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল একদিন। কিন্তু তা কান্না নয়—তাই জীবের সম্বল—তারই নাম কৃষ্ণ-কীর্তন!"

"কীর্তন আমি শুনেছি, কিন্তু অমন মারাত্মক বলে তো মনে হয়নি।"

"শুনেছো কিন্তু শোনার মতো করে শোনোনি। তাহলে মন্ত্রের মতো ফল দেখতে। তোমরা একালের ছেলেরা মন্ত্রশক্তিতে বিশ্বাস করো না, নইলে এই কলিতে কেবল নামমাহাত্ম্য। নাম ছাড়া আর কী আছে? কলৌ নামৈব কেবলম্! প্রভো, তুমিই সত্য!" প্রভুপাদ যুক্তকরে তাঁর প্রভুকার প্রতি যেন নমস্কার-নিক্ষেপ করলেন।

"তা জানি। এ যুগে নামের জন্যই যা কিছু করা। তা ঠিক।" জীবনকেষ্ট ঘাড় নাড়ে, অনেকটা নমস্কারের মতো করেই।

"আর কী নাম! কেমন মন্ত্রের মতো অব্যর্থ এই নাম! যেমন জোরালো তেমনি ধারালো। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ! অর্থাৎ তিনিই সব হরণ করেন, আমরা শুধু নিমিত্তমাত্র, তাঁর সহায় হই বই তো না! তিনি তো বলেই গেছেন, নিমিত্তমাত্র ভব সব্যসাচী। নিমিত্ত হও, নিমিত্ত হলেই সব্যসাচী হতে পারবে।"

"কেবল নাম দিয়ে আপনি কাম ফতে করলেন? মন্ত্রের কেরামতিতে ঐ কুড়েদের দ্বারা, কুঁড়ে ঘরের থেকে আপনার মহাপ্রাসাদ হোলো? এযে দেখছি আলাদিনের কাণ্ড!...এ কি আমি পারবো?...আমার মধ্যে কি অতো গুরুত্ব আছে?"

"খুব পারবে বৎস। আত্মীয়দের ধনেপ্রাণে মারতে পারবে না—কী যে বলো! তুমি যে তাদের আত্মীয়, সেকথা কেন ভুলে যাচ্ছ? আত্মীয়ের পক্ষে এর চেয়ে সহজ কাজ আর কী আছে? প্রভু শ্রীকৃষ্ণকে দ্যাখো—খোদ্ কেষ্টর কথাটাই ভাবো না একবার!"

"খোদ্ কেষ্ট? তিনিও কি পতিতুণ্ডি ছিলেন?" **জীবনকেষ্ট অবাক হয়।**

"পতিতুণ্ডি **না হোন, পতিতপাবন তো বটেন। সমগোত্র বইকি।** আত্মীয়-কবলে যারা পতিত তাদের উদ্ধারকর্তাও তিনি। নিজে তিনি কি করেছিলেন মনে নেই? কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ বাধিয়েছিল কে? তিনিই তো! অতো আত্মীয়-নিপাত আর কোন্ যুদ্ধে হয়েছে? তাতেও শান্তি না পেয়ে শেষে নিজের যদুবংশ ধ্বংস করে তবে তিনি ক্ষান্ত হন। এতেই বোঝো।"

জীবনকেষ্ট বোঝে। কিন্তু বুঝেও বোঝে না—"আমি কি পারবো? অমন একটা কুরুক্ষেত্র করতে পারবো কি আমি?"

"খুব পারবে ; সংশয় কোরো না। সংশয়াত্মা বিনশ্যতি। প্রত্যহ গীতাপাঠ করো! নাকের ওপর তিলক চড়াও। সেই সঙ্গে পাইকিরি দরে নামাবলী আর কন্ঠির বায়না দিয়ে রাখো। আত্মীয়দের ডাকো। সহজে না আসে নিমন্ত্রণ করে খাবার লোভ দেখিয়ে আনাও। আর তারপরে, নামাবলীর বাস জড়িয়ে—নামজাদা গামছা গলায় দিয়ে—বুঝতেই পারছ। শেষটায় আমি আর

আত্মীয় অনাত্মীয় বাছিনি। যে এসেছে, কাছে ঘেঁষেছে, যাকে ধরতে পেরেছি তাকেই দীক্ষা দিয়েছি। হাড়ে হাড়ে দীক্ষা! না দিয়ে তো নিস্তার নেই—জীবে দয়া নামে রুচি আমাদের ধর্ম কিনা!"

"আমার বেলায় কিন্তু জীবে রুচি আর নামে দয়া—দয়াটা আমার নামমাত্র কিন্তু রুচিটা আপনার চেয়ে বেশি।" কুলাচার্য বলেন।

"তুমি আমাদের বংশের কুলাঙ্গার। তিন কুল খেয়ে শেষ করেচ। তাদের বাঁচিয়ে রোজগারের উপায় করলে কতো লাভ হোতো, সেটা একবার ভেবে দেখেছিলে?...প্রভো, তুমিই সত্য।" প্রভুপাদ নিজের টিকিতে হাত বুলান।

"আর তুমি বুঝি আমাদের বংশের এক মহাপুরুষ? তাই না?" কুলাচার্যের কুলোপনা চক্র দেখা দেয়। এক ঢোঁক কারণবারি গিলে নিতেই তাঁর চোখ জবাফুলের মত টকটকে হয়ে চরকির মতো ঘুরতে থাকে ঃ "বটে? পুরুষ তো অনেক দেখলাম—চোখেও দেখেছি—মহাপুরুষকে তো দেখি একবার! যার দয়ায় সাধারণ পুরুষই মহাপ্রসাদ হয়ে ওঠে, কিন্তু আস্ত একটা মহাপুরুষ কিরূপ দাঁড়ায় সেটাও তো একবার দেখতে হয়!"

এই বলে কুলাচার্য প্রভুপাদকে তাড়া করতেই তিনি—"ওরে বাবারে! খেয়ে ফেল্লেরে!"—বলে, প্রাণান্ত এক ডাক ছেড়ে কয়লা ঘরের জানলা টপকে উধাও হলেন। কুলাচার্যও পেছনে পেছনে দৌড়ুল—খড়ম হাতে করে।

"বেশ, একটা ঘরোয়া বৈঠক জমেছিল—এমন ভাবে ভেঙে গেল!" জীবনকেষ্ট মনোকষ্ট জানায়।

"ধরতে পারলে খেয়ে ফেলবে ঠিক! আমি চললাম। দূরে দাঁড়িয়ে দেখি'গে—কদ্দূর গড়ায়। মহাপ্রসাদ পর্যন্ত গড়ায় কি না দেখা যাক। ফাঁক পেলে একটু ঝোল চাখব না হয়।" এই বলে ধিনিকেষ্টও চলে যান।...

"হ্যাঁগা উঠলে?" কয়লাঘরের দোরগোড়ায় ডাক ছাড়ে অণু।

"রক্ত চাই—রক্ত চাই।" জড়ানো গলায় জবাব আসে।

"য়্যাঁ, কী বলচো?..." অণু ভেতরে গিয়ে অনুসন্ধান করে।—"কী হয়েচে তোমার? দেখি—ইস্! গাটা যেন গরম দেখছি।"

"আমি. খাবো। ধরব আর খাব—একেকটাকে ধরে কেটে কুটে মসলা দিয়ে গরগরে করে রাঁধব, চপ্—কাটলেট—কালিয়াকোর্মা—কোপ্তা—কালিয়া—কিমাম। তারপরে সেই কালিয়াদমন করা আমার কাজ। আমাদের চোদ্দ পুরুষের কম্মো। আমাদের বংশের আদিপুরুষ কে ছিল জানো? খোদ কেষ্ট—যে কুরুক্ষেত্র আর কালিয়দমন করেছিল। আমিও করব।" জীবনকেষ্টর চোখ ঘুরছে।

"খাবে বই কি। চা হয়েছে। মুখ হাত ধুয়ে খাবে এসো।"

হাসির ফোয়ারা

"হতভাগাটা বক্‌ছে কী?" দাঁতের ব্রুশ হাতে নিরঞ্জন যাচ্ছিল, দাঁড়িয়ে কান পেতে শোনে। "রাত্রে ইঁদুরে কামড়েছে—র‍্যাট পয়জন হয়েছে ব্যাটার বোধ হয়।"

"কেন, আমি কি কুরুক্ষেত্র করতে পারিনে?" নিরঞ্জনকে দেখেই সে লাফ ছাড়ে। "ময় ভূখাহুঁ!" হাঁক ছেড়ে তাড়া করে যায়।

"আরে মোলো যা!" নিরঞ্জন তিন হাত পিছিয়ে যায়। "ভূখাহু তো আমি কি করব? তোমার গিন্নিকে বলো, খাবার এনে দেবে।"

"খাবার নয়, তোমায় খাবো। হাড় খাবো, চামড়া নিয়ে ডুগডুগি বাজাব। কেন, আমিও কি তোমার আত্মীয় নই? চপ্ কাটলেট্ বানিয়ে খাব তোমাকে।"

"সাধের কথা শুনে মরে যাই!" নিরঞ্জন বলে। মুখে সে বিরক্তি দেখায় বটে কিন্তু মনে মনে ভয় খায়। দাঁত মাজা ব্রুশ দিয়ে কতোদূর আত্মরক্ষা করা যাবে চিন্তা করো। এধারে ওধারে তাকিয়ে লাঠি শড়কি কিছু তার চোখে পড়ে না। "ভালো আপদ হোলো। ওর কি আজকাল মাঝে মাঝে এম্‌নি ধারা হয় না কি?"

"কই কখনো তো দেখিনি!" অণু কাতর হয়ে পড়ে, "বাড়িতে হতে দেখিনি তো কখনো।"

হাঁক ডাক শুনে ইলা, ইলার মাও এসে পড়েছে। ইলার খুব মন্দ লাগছে না, বেশ আনন্দ পাচ্ছে, কিন্তু ওর মা ভাবিত হয়ে পড়েছে—"জামাইবাবুর কী হোলো দিদি?" চাপা গলায় সে জিগেস করেছে।

কী যে হয়েছে তা জানাবার জন্য জীবনকেষ্ট নিজেই তৈরি। ধেই ধেই করে সে নাচতে আরম্ভ করে আর রক্ত চাই বলে চেঁচায়। চেঁচানি আর নাচানিতে তার একাকার! নাচতে নাচতে আবার ছড়া কাটে ঃ

"বল্ রে বন্য হিংস্র বীর।
দুঃশাসনের চাই রুধির॥
চাই রুধির, রক্ত চাই।
ঘোষো দিকে দিকে এই কথাই॥
দুঃশাসনের রক্ত চাই!
দুঃশাসনের রক্ত চাই!...

"বাঃ মেসোমশাই, তুমি তো বেশ নাচতে পারো।" ইলা বাহবা দেয় ঃ "আমাদের যে নাচ শেখায় তার চেয়েও দেখচি তুমি ওস্তাদ।"

"তোকে আমি খাবো। কড়মড় করে খাবো। চিবিয়ে চিবিয়ে খাবো, চেটে পুটে খাবো।.. চেঁছে পুঁছে খাবো...তোর কাটলেট্ বানালে কেমন হয়? লোলুপ কণ্ঠে সে শুধোয়।

"বেশ হয়। কিন্তু আমাকে একটু চাখতে দেবে তো?" ইলার অনুরোধ থাকে।

"তা দেখা যাবে। আগে তো তোকে কালীঘাটে নিয়ে গিয়ে বলি দিই। কাটলেট্—সে তখন পরের কথা। কাটবার পর।"

"ওমা, কী অলক্ষুণে কথা গো। মিন্‌সে বলে কি? ষাট্ ষাট্ বালাই ষাট্।" মহিমা ইলাকে হস্তগত করে সরে দাঁড়ায়।

জীবনকেষ্ট গুণে গুণে দ্যাখে—"এক দুই তিন। মোটমাট পৌনে এক গণ্ডা। কোয়ার্টার ডজন। চা বাগানে নেয় না আজকাল—তবে কসাইখানায় নেবে। দশ টাকা দরে বেচলেও পৌনে এক গণ্ডার দাম তিরিশ টাকা—মন্দ কি? তবে পুরো এক গণ্ডা হলেই ভালো হোতো। ভালো তো হোতো, কিন্তু পাচ্ছি কোথায়?"

"মাসিমাকেও ধরো, তাহলেই গণ্ডা পুরবে।" ইলা বাতলায়।

জীবনকেষ্ট অণুর দিকে তাকায়ঃ "ওটা গণ্ডার। গণ্ডার কসাইরা ছোঁবে না। গণ্ডার মানুষে খায় না তো।"

অণু এতক্ষণ অতি কষ্টে নিজেকে বেঁধে রেখেছিল, এবার আর পারে না। জীবনকেষ্টর এহেন অনুমান তার আত্মাভিমানে ঘা লাগে, চোখে আঁচল চেপে সে ফোঁপাতে থাকে। অকস্মাৎ তার এ কী সর্বনাশ হোলো, ডাক ছেড়ে কাঁদলেও যার দুঃখ যায় না। সেই অনুচ্চারিত দুঃখে সে গুমরে ওঠে।

"হঠাৎ কেনা বেচার কথা কেন মেসোমশাই? খাবার কথাটা কি বাদ পড়ে গেল নাকি?" ইলার অনুসন্ধান।

"কেন বাদ পড়বে কেন? খাবো তো আল্‌বাৎ! কচি পাঁঠা—বৃদ্ধ মেষ—দইয়ের মাথা ঘোলের শেষ।" জীবনকেষ্ট থেমে থেমে আওড়ায় আর ভাঁটার মতো তার চোখ খাঁড়ার মতো তার হাত নাড়ার সাথে সাথে ক্রমান্বয়ে ইলা—নিরঞ্জন—মহিমা হয়ে অবশেষে রোরুদ্যমান অণিমার ওপরে গিয়ে দাঁড়ায়। কী ভেবে অবশেষে সে বলেঃ "না—ঘোল আমি খাব না। ঢের ঘোল খেয়েছি।"

"খাবো তো বলছো—খাচ্ছো কই?" ইলার ভারী মজা লাগে। মেসোমশাইকে সে প্রেরণা দিতে চায়।

"দাঁড়া। কাটি তোদের। বঁটি আনি আগে।" এই বলে, এক লাফে সে অন্য ঘরে গেল—আর পরমুহূর্তেই বঁটি হাতে আরেক লাফে ফিরে এল। এসেই "জয় মা কালী—!" বলে তার এক বীভৎস আওয়াজ "মাকালী, মাকালদের বলি দিচ্ছি মা, কিছু মনে করিস নে!"

কালী থেকে কালিয়া—কালিয়া-দমনের কথা তার পরে। কিন্তু তার আগে ঐ বঁটি না দেখেই নিরঞ্জন মহিমাকে, মহিমা ইলাকে, পরস্পর হ্যাঁচকার এক টানে—টেনে না নিয়ে—মুক্ত দ্বারপথে দুদ্দাড় করে বেরিয়ে যায়। পরস্পর সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ রাখতে পরস্পরসম্বন্ধ হয়ে দৌড় মারে, দাঁড়ায় না আর।

হাসির ফোয়ারা

জীবনকেষ্ট তবু পিছু পিছু যায়। কিছুদূর। তার মুখে আর নজরুল নয়, রবীন্দ্রনাথই এখন—"উজাড় করে নাও হে আমার যা কিছু সম্বল—ফিরে চাও, ফিরে চা—ও, ফিরে চাও হে চঞ্চল!"

জীবনকেষ্ট গান গাইছে! যার গলা কখনো সুড় সুড় করেনি সে সুরেলা হোলো? তবে সত্যিই তার স্বামীর ক্ষেপে যেতে আর বাকী নেই—অণুর কান্না বাগ মানে না।

জীবনকেষ্ট ফিরে এল। কিন্তু চঞ্চলরা ফিরল না, ফিরে তাকালো না পর্যন্ত! বপুটি রেখে হাঁপ ছেড়ে আরাম চেয়ারে গিয়ে কাৎ হয়ে পড়ল সে—আরাম করে ছড়িয়ে পড়ল। ছাড়লো তার দীর্ঘনিঃশ্বাস।—"আর ওরা ফিরবে না। এ জন্মে নয়!...আঃ, বাঁচা গেল!"

জীবনকেষ্টর সহজ গলা শুনে চোখের আঁচল সরালো অণু। বাদলার পর্দা সরে গিয়ে আলোর ঝিলিক দেখা গেল সেখানে।

"আমিও বাঁচলাম।" সে বললে।

"আমার কালকের কেনা নতুন টুথ ব্রাশটা নিয়ে গেল—যাক্ গে! আত্মীয়তা থাকলে অমন কতো যায়! সুটকেস আর হোলড-অল রেখে গেছে...মন্তর না দিয়েই পাওয়া গেল—মন্দ কি? যথা লাভ।"

অণু হাসল। কেন হাসল সেই জানে।

শিবরামের ছেরাদ্দ!

দুঃখু করছিলাম হর্ষবর্ধন বাবুর কাছে। 'একটা ভারী আপসোস রয়ে গেল মশাই......!'

'কীসের আপসোস?' তাঁর জিজ্ঞাসা।

'দেখুন, পরের দৌলতে তো অনেক খেলাম। জীবন-ভোরই খাচ্ছি। বলতে গেলে পরের বাড়ি খেয়েই আমি মানুষ.........।'

'পরের খেয়ে খেয়ে?'

'না। পরীও আছে তার মধ্যে, পরীদেরও খেয়েছি এনতার।'

'পরী পেলেন কোথায় আবার।'

'কেন, আমার বোনরাই তো একেকটি পরী। পরীর মতই দেখতে সবাই, তাদের কি পর বলা যায়! আমার বোনদের কি আপনি পর বলতে চান?'

'না না। তা কেন বলব?' তিনি কাঁচুমাচু হয়ে বলেন।

'তাদের ঘাড় ভেঙেও খেয়েছি বিস্তর। ভাইফোঁটার দিনটি তো বটেই, তাছাড়াও আরো কতোদিন। কিন্তু সে-দুঃখ নয়—সে তো সুখের কথাই। দুঃখ এই যে নিজের সুবাদে একটা খাওয়াও এজন্মে আমার হল না।'

"কী রকম?"'

'ধরুন আমার অন্নপ্রাশনের খাওয়াটা খুব ঘটা করে হয়েছিল শুনেছি...মাছ মাংস লুচি-পোলাও-মেঠাই-মণ্ডা কিছুই নাকি বাদ যায়নি। কিন্তু যদ্দুর ধারণা, আমাকে খেতে দেয়নি একদম। খেয়ে থাকলেও আমার এখন মনে পড়ে না।...তারপর পৈতের খাওয়াটাও ফসকে গেছে আমার। বাড়ি থেকে পালিয়ে গেছলাম বলে পৈতের সময়টা উৎরে গেল কোন ফাঁকে—টের পেতে না পেতেই! আর পৈতে হ'ল না বলে বিয়েও হ'ল না শেষটায়। বিয়ের খাওয়াটাও হল না। আর বিয়ের পর বছর বছর জামাইষষ্ঠীর খাওয়াগুলোও বর্‌বাদ্‌! বর হতে পারিনি বলে বাদ পড়ে গেল বেবাক্‌!'

'কেন, বিয়ে হ'ল না কেন! যাদের পৈতে নেই তাদের কি আর বিয়ে হয় না? আমার তো হয়েছে।'

'আহা, আপনার জাতকুলের পরিচয় আছে তো। আমার তো আর তা নেই। বাপ-মা অকালে মারা গেলেন। কে বিয়ে দেবে বলুন? যেখানেই বিয়ের কথা পাড়ি, জিগেস করে তোমরা কী জাত হে? আমি বলি বামুন। তো বলে পৈতে দেখাও, দেখাতে পারিনে! পৈতে নেই, এদিকে চকরবরতি—বামুন-কায়স্থ-বদ্যি কেউই মেয়ে দিতে চাইল না, উলটে শ্লোক ছুড়ে ছুড়ে মার লাগালো আমায়।'

'শেলেট ছুড়ে? বলেন কি মশাই?'

'শেলেট নয়, শোলোক। বলল যে, অজ্ঞাতকুলশীলস্য বাস দেয়ো ন কস্যচিৎ! শ্লোকের ঘায় চিৎপাত হয়ে পড়তে হোলো বলতে গেলে।'

'দুঃখের কথাই বটে!'

'তারপর ধরুন, নিজের ছেরাদ্দর খাওয়াটাও আমার বরাতে নেই, কিন্তু সেজন্যে দুঃখ করে লাভ কী! যদ্দুর জানি, কেউই নাকি ওটা খেতে পায়না। পরের ছেরাদ্দে খেয়ে খেয়েই সে দুঃখ ভুলতে হয়—পুষিয়ে নিতে হয় সবাইকে।'

'তাহলে আর সে দুঃখুটা রাখবেন না,' তিনি বললেন—'নিজের ছেরাদ্দর খাওয়াটা আপনি খেয়ে যেতে পারেন। ইচ্ছে করলে এখুনিই!'

'কী করে?'

'নিজের ছেরাদ্দ নিজেই করে—আবার কি করে?'

'কী রকম?'

'শাস্তরে সেরকম বিধান দিয়েছে। যে অপুত্রক, যার পিণ্ডজল দেবার কেউ নেই, সে নিজের পিণ্ডি নিজে দিয়ে পরলোকের পথ পরিষ্কার করে যেতে পারে। ভাটপাড়ার থেকে পণ্ডিতদের বিধান আনিয়েছি আমি। আমারও তো কোনো ছেলেপুলে হ'ল না, নিজের ছেরাদ্দ নিজেই করে যাব বলে ঠিক করে রেখেছি।'

'তাই নাকি? তাহলে আমাকেও......মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থা করতে হয়।'

● শিবরামের ছেরাদ্দ!

হাসির ফোয়ারা

'একি! আপনিও যে শেলেট ছুড়ে মার লাগাচ্ছেন মশাই!'

'শেলেট নয় শোলোক।' আমাকে শুধরে দিতে হয় আবার।

অবশেষে আমার ভাগনে গোপালকে হাঁক পাড়লাম একদিন—'এই ছাপানো চিঠিগুলো এইসব ঠিকানায় বিলি করে আয় তো...'

বলে নাম-ঠিকানার একটা লিস্‌টি দিলাম ওর হাতে।

'এ যে তোমার ছেরাদ্দের চিঠি গো মামা!' চিঠি পড়েই না ভড়কে গেছে—চক্ষু ওর চড়কগাছ!

'বেঁচে থাকতে থাকতেই করে যাচ্ছি ...তোরা করবি কি না কে জানে! শেষটায় নরকে পচে মরতে হবে। আর তাছাড়া সত্যি বলতে...', আসল কথাটা ফাঁস করি তারপর —'আমার ছেরাদ্দ, যদিই বা হয়, সবাই মিলে সাঁটাবে আর আমিই কেবল ফাঁক যাব, এ-চিন্তা আমার কাছে অসহ্য, তাই কেবল শুধু করেই নয়, নিজের ছেরাদ্দে পেট ভরে খেয়ে যেতেও চাই আমি।'

'মাসিদের কাউকে তো নেমন্তন্ন করোনি...।' গোপাল তালিকা পাঠ করে বলে, 'বিনি মাসি, ইতু মাসি, পুতুল মাসি, জবা মাসি, কাউকেই তো ডাকোনি দেখছি।'

'আহা, ওরা কখনো আমার ছেরাদ্দে খেতে পারে?...প্রাণে লাগবে না ওদের? তা, মাস্‌তুতো বোনদের না করলেও তোর মামাদের...মাস্‌তুত ভাইদের প্রায় সবাইকেই করেছি, আর ঐ সঙ্গে আমার লেখক বন্ধুদেরও।'

'এ যে তোমার ছেরাদ্দের চিঠি গো মামা!'

গোপাল সুবোধ বালকের মতন গড় গড় করে পড়তে লাগলো চিঠিটা—

'সময়োচিত নিবেদনমিদং মহাশয়, অমুক তারিখে আমার মামা চন্দ্রবিন্দু শিব্রাম চকরবরতি-র

হাসির ফোয়ারা

শুভ শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে আপনার সবান্ধব আগমন প্রার্থনা করি। ইতি, নিবেদক, বিনীত শ্রীগোপাল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়...চিঠিটা কিন্তু ঠিক ঠিক লেখা হয়নি মামা। কোথায় যেন ভুল হয়েছে মনে হচ্ছে। খটকা লাগছে আমার।'

'ভুলটা পেলি কোথায়?'

'শুভ শ্রাদ্ধানুষ্ঠান—এমন কথা শুনিনি কখনো। শুভ বিবাহ হয়ে থাকে জানি, শুভ অন্নপ্রাশনও হয়, শুভ উপনয়নও হতে পারে, কিন্তু শুভ শ্রাদ্ধ...?'

'কেন, শ্রাদ্ধ কাজটা কি খুব অশুভ নাকি?' বাধা দিয়ে আমি বলি—'একজনের পরকালের কল্যাণের পথ সাফ করা হচ্ছে, সেটা কি খুব অশুভ কাজ?'

'কিন্তু ঐ চন্দ্রবিন্দু শিব্রাম...চন্দ্রবিন্দু...চন্দ্রবিন্দু', আপন মনে বিড়বিড় করতে থাকে সে।

ওর বিড়ম্বনায় আমি বললাম—'আরে চন্দ্রবিন্দু কেন রে? ওটা হোলো গে ঈশ্বর শিব্রাম্। মরে যাবার পর ঈশ্বরপ্রাপ্তি ঘটে সবাই ঈশ্বর হয়ে যায় না? মুখ্যু কোথাকার! কিচ্ছু জানিসনে!'

কিন্তু আমার ঐশ্বর্যের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করেই সে বেরিয়ে গেল চিঠি বিলোতে।

ফিরে এলো সন্ধ্যেবেলায়, এসে বলল, 'তোমার লেখক বন্ধুদের কেউই কিন্তু আসতে রাজি হ'ল না। বুঝলে মামা?'

'কেন, কী বললে তারা?'

'একজন বল্লে, মরেছে নাকি? আপদ গেছে। দাঁড়াও, তোমায় মিষ্টিমুখ করাই। খোসখবর এনেছো!...বলে চলে গেল বাড়ির ভেতর। আমি বসে আছি তো বসেই আছি, সন্দেশ রসগোল্লা কী খাওয়ায় কে জানে!...'

'নরানাং মাতুলক্রম বলে যে, তা মিছে না।' বলে মনে মনে ওর তারিফ করে একটা শ্লোক ছুড়ে মারি আমিও—'তারপর?'

'বসে আছি তো বসেই আছি। অনেকক্ষণ বাদে বেরিয়ে এসে বললে, একি, তুমি এখনো বসে আছো যে? আজ্ঞে আপনি কী খাওয়াবেন বললেন না, আমি ও'র মনে করিয়ে দিই।'

'তা ভাই, এই বাজারে মিষ্টি এখন কোথায় পাই? সন্দেশ টন্দেশ সব কণ্ট্রোল হয়ে যায়নি? বলে এক গাল হেসে ফের তিনি বাড়ির ভেতর সেঁধুলেন। আমি চলে এলুম তখন।'

'তারপর?'

'একজন বললে, সত্যি মরেছে? না, খবর কাগজে নাম ছাপানোর মতলব?...তুমি জানো ঠিক? শিব্রামটা মরেছে, আমার কিন্তু পেত্যয় হয় না। সহজে মরবার ছেলে নয়। তেমন পাত্রই না, আমাদের মেরে তারপরে যদি সে মরে। বলি, রামায়ণ পড়েছো তো? সেই যে...কৃত্তিবাস পণ্ডিত কবিত্বে বিচক্ষণ, লঙ্কাকাণ্ডে গাইলেন গীত রামায়ণ। তিনি কি বলে গেছেন জানো? বলেছেন, কী ধাতুতে তৈরী? মরিয়া না মরে রাম এ কেমন বৈরী?...দাঁড়াও আমি রামায়ণটা

নিয়ে এসে শোনাই তোমায়। বলে তিনি ইয়া মোটা একখানা বই নিয়ে এলেন, দেখেই না আমার চক্ষুস্থির! তক্ষুণি আমি সটকে পড়েছি সেখান থেকে—তাই না দেখেই।'

'আর সেখানে যাসনে কক্ষনো।' আমি উপদেশ দিই।

'মরে গেলেও না।...মানে, তুমি সত্যি সত্যি মারা গেলেও যাব না। আরেকজন বললেন, দ্যাখো বাপু, ওর ছেরাদ্দে গিয়ে কী হবে? ও তো আর আমার ছেরাদ্দে আসতে পারবে না। আমার স্মৃতিসভাতেও ওকে দিয়ে কাজ হবে না কোনো। ওর তো হয়েই গেল। ওর ছেরাদ্দই বল আর স্মৃতিসভাই বলো—সেখানে গিয়ে আমার লাভটা কী শুনি?'

'আসতে হবে না ওর।' শুনে আমার রাগ হয়ে যায় বেজায়।

তারপর যথাদিবসে যথাসাধ্য আয়োজনে শ্রাদ্ধের পাঠ চুকল। যথারীতি মন্ত্র আওড়লুম। নিজের পিন্ডি চটকালুম দু'হাতে। তারপর নিজেকেই খেতে হ'ল তাই আবার। আত্মার কল্যাণে যা যা করণীয় করতে হল সব।

শ্রাদ্ধশান্তি সকালে নির্বিঘ্নে চুকে যাবার পর, বিকেলে ব্রাহ্মণ আর কুটুম্ব-ভোজনের পালা।

'মামা, তুমি লুকিয়ে থাকো এখন—ঘাপ্‌টি মেরে থাকো কোথাও।' বিকেল না হতেই গোপাল বলল আমায়, 'আত্মীয়রা তো সব আসবে এইবার। তোমাকে দেখতে পেলে তারা ভড়কে যাবে না? নেমন্তন্ন না খেয়ে ভিরমি খাবে সবাই।'

'বারে! আমার ছেরাদ্দ, আর নিজেই আমি দেখতে পাব না? সে কি কথা!'

'দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে এই ঘরটার ভেতর থেকে ঘুলঘুলির ফাঁক দিয়ে দ্যাখো না কেন!' গোপাল বাতলায়ঃ 'তোমাকে কেউ দেখতে না পেলেই হ'ল।'

তাই হ'ল। আত্মগোপন করে আত্মীয়স্বজনদের আবির্ভাব দেখতে লাগলাম। শুনতে লাগলাম সবার আহা-উহু—কত না সমবেদনা! স্বকর্ণে শুনতে হ'ল সোচ্চার সব প্রশংসা। আমি যে সত্যিই এহেন ভালো, এমন আদর্শ লোক ছিলাম তা আদৌ আমার ধারণা ছিল না। নিজেকে এত নিস্বার্থপর, সদাশয়, মহৎ, উদারচেতা, পরহিতচিকীর্ষু ইত্যাদি ইত্যাদি বলে ঘুণাক্ষরেও কোনোদিন সন্দেহ করিনি।

তারপর পাতায় পাতায় বসে গেল সব একে একে। সেই পাতা-বাহারের ওপর সেদিনকার যতো বাহারী আহার এসে পড়তে লাগল।

'এটা কী হে?' শুধালেন একজন।

'আজ্ঞে, পানতুয়া।' জবাব দিলো গোপাল।

'একি চেহারা পান্তুয়ার!'

'কারিগর জানাল যে এ-জিনিসের পান্তুয়া এর আগে সে কখনো বানায়নি তাই চেহারাটা ঠিক যুতসই করতে পারল না।'

হাসির ফোয়ারা

'তা গোড়াতেই মিষ্টি কেন হে? লুচি তরকারি আনো না আগে।'

'আজ্ঞে, আজ বেস্পতিবার কিনা। চাল-গমের খাবার বিকেলে ব্যবহার নিষিদ্ধ যে! সরকারী মানা রয়েছে।' বালক গোপালই বৃহৎ কর্মকর্তা হয়ে দেখা দিয়েছে।

'লোকটার আক্কেল দ্যাখো একবার! বেছে বেছে এমন দিনে মরেছে যে ছেরাদ্দের তারিখটি পড়েছে ঠিক বেস্পতিবারের বারবেলায়?' বিক্ষোভ প্রকাশ করলেন তিনি ঃ 'বদমাইশের ধাড়ি! এক নম্বরের শয়তান যাকে বলে।'

'তা লুচি-রুটি-ভাতটাত নাইবা হ'ল। মাংস তো করতে পারতে?' চমকে ওঠেন একজনঃ 'তার ঢালাও ব্যবস্থা হলেও শুধু তাই-ই চালানো যেত না হয়।'

'আজ্ঞে আজ নন্‌মীট ডে না?' গোপালের মনে করিয়ে দেওয়া।

'বদমাইশিটা দেখেছো একবার? এমনি ভাবে হিসেব করে খর্চা বাঁচিয়ে মরাটা...' আরেকজনের পরচর্চা শুনতে হয়।

'চকরবরতিরা কঞ্জুষ হয়ে থাকে।' আরেকজনের উতোর গাওয়া তার ওপর—'আর-আর চকরবরতিরা না হলেও উনি তো নির্ঘাৎ!'

'পানতুয়ার পর আর কী আছে হে?' একজন শুধান।

'শুধু পান।'

'শুধু পান—অ্যাঁ?' এবার সবাই সত্যিই হকচকান।—'এর পরেই পান?'

'দেখুন—দেখুন সবাই! চকরবরতির কাণ্ডটা দেখুন একবার।' চেঁচিয়ে মাত করেন একজনঃ 'জ্যান্ত থাকতেও যা বরাবর দেখে এসেছি সেই স্বভাবটা তার মারা যাবার পরেও যায়নি। মলে কি আর স্বভাব বদলাবে? জীবদ্দশায় আমাদের খাওয়াতে কখনো এক পয়সা খসায়নি, খালি আমাদের ঘাড় ভেঙে খেয়েছে। আর এই মারা যাবার পর কেমন ব্যবহারটা করে গেল দেখছেন তো?'

'স্বভাব যায় না মলে একথা যে বলে, সেকি মিথ্যে? বেঁচে থাকতে সারাজীবন লোকটা pun করে গেল, মারা যাবার পরও সেই pun দোষ তার ঘুচল না। রসগোল্লা-সন্দেশ-রাবড়ি না-হয় কন্ট্রোল, মানলুম, কিন্তু খাজা-গজা, বোঁদে-মতিচুর, গাঙ্গুরামের দই, চন্দ্রপুলি সোনপাপড়ি এসবও কি ছিল না বাজারে? তা না—সেই punতুয়া আর তার পরে pun! খান, যত খুশি খান!'

'তাহলে একটা গল্প বলি শুনুন। মলেও যে মানুষের স্বভাব যায় না তার প্রমাণ পাবেন। আমাদের সুখচরে তারিণী খুড়ো ছিলেন এক নম্বরের বুড়ো বদমাইশ! গাঁয়ের নাম সুখচর হলে কী হবে কাউকে সে সুখে চরতে দিত না। তাকে নিয়ে স্বস্তি ছিল না কারো। হুজ্জুৎ হাঙ্গামা বাধিয়ে রাখত সব সময়—এর নামে মামলা, ওর নামে মিথ্যে সাক্ষী, এর জমি দখল, ওর ক্ষেতের ফসল রাতারাতি কেটে নেয়া—এই সবই ছিল নিত্যকর্ম।

'একবার দারুণ অসুখে পড়ল সে, শেষটায় মৃত্যুর দিন ঘনিয়ে এল লোকটার। যতই পাজি হোক না, মরতে হবে একদিন সবাইকেই। মরবার আগে সে গাঁয়ের সকলকে ডাকিয়ে পাঠালো

তার ভাগনেকে দিয়ে—তিনকুলে তার ঐ ভাগনেটাই ছিল কেবল। ভাগনে গিয়ে বললে সবাইকে, মামা আমার মৃত্যুশয্যায়, আপনাদের শেষ দেখা দেখতে চান একবারটি। শুনে সবাই এলো—বেশ খুশী হয়েই বলতে কী! তারিণী খুড়ো তাদের দেখে বললে, বাপু সকল, আমার সময় তো ঘনিয়ে এসেছে, সারা জীবন ধরে তোমাদের আমি জ্বালিয়েছি, তোমরা যেন রাগ পুষে রেখোনা, তাহলে মরেও আমার আত্মা শান্তি পাবেনা—আমাকে মাপ করো তোমরা সবাই। কিন্তু একটা অনুরোধ আছে, আমার একটি কাজ তোমাদের করতে হবে। না, শ্রাদ্ধ-শান্তির ব্যবস্থা করে খরচের দায়ে ফেলতে যাচ্ছিনা তোমাদের। তোমরা কেবল এইটি করবে—আমি মারা যাবার পরে আমায় না পুড়িয়ে, গাঁয়ের মধ্যে বাজারের মাঝখানে আমার দেহ একটা বাঁশের ডগায় বসিয়ে রেখো—যদ্দিন না আমি আপনার থেকেই পচে-খসে যাই, বুঝেছ? এইভাবে আমার প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই আমি। বুড়ো বামুনের এই শেষ প্রার্থনাটা তোমরা রাখবে, এই না বলে খুড়ো তো চোখ বুজলেন। তারা আর কী করে, তাঁর আত্মার সদগতির জন্যে, তাঁরই উপদেশমতো, বাঁশের ডগায়, শূলদণ্ডদানের মতই তাঁকে বাজারের মাঝখানে খাড়া করে রাখল। এদিকে খুড়ো করেছে কী, মরবার আগের দিনে, সদরের হাকিম সাহেবকে বেনামী এক চিঠি লিখে রেখেছিল...তাতে লেখা ছিল, আমাদের গাঁয়ের তারিণী চাটুজ্যেকে কে বা কাহারা খুন করিয়া বাজারের মধ্যস্থলে একটি বংশদণ্ডে লটকাইয়া রাখিয়া গিয়াছে। কে বা কাহারাই বা কেন বলি, এই সুখচরের তাবৎ অধিবাসী সবাই মিলিয়া ষড়যন্ত্র করিয়া এই কর্ম করিয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস। ইতি, বিনীত নিবেদক। ব্যস্, আর যায় কোথায়! পরদিন পুলিস সাহেব এসে দেখলেন সত্যিই তাই! গাঁ-সুদ্ধ লোকের হাতে দড়ি পড়ল, সবাইকে টানতে টানতে নিয়ে জেল-হাজতে পুরে দিল পুলিস। মরবার পরও স্বভাব গেলনা, মরেও গাঁয়ের সবাইকে ফাঁসিয়ে গেল তারিণী।...'

'ফাঁসি হয়ে গেল সবার?' জানতে চায় গোপাল।

'তনয়ে তারো তারিণী! এই কারণেই বলে থাকবে বোধহয়!' আপনমনে নেপথ্যে আমি আওড়াই।

'হ্যাঁ যা বলছিলাম...' গোপালের জবাব না দিয়ে বক্তা বলতে থাকেন... 'চিঠিটা লিখে রেখে খুড়ো তার ভাগনেকে বলে রেখে গেছল তাঁর মারা যাবার পরেই যেন সে চিঠিখানা ডাকে ছাড়ে। আমাদের চকরবরতিও তার এই টিঙটিঙে ভাগনেকে মরবার আগে বলে গেছে নিশ্চয়। আমার ছেরাদ্দে কাউকে কিচ্ছুটি খাইয়ো না। উপযুক্ত মামার উপযুক্ত ভাগনে তো!' বলে উনি জাজ্বল্যমান উদাহরণের দিকে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন—'দেখুন না, কেমন মিটিমিটি হাসছে আবার!'

'মিটমিটে শয়তান!' আরেকজনের সার্টিফিকেট।

'একনম্বরের বিচ্ছু!'

'আমার কী দোষ?' গোপাল এবার বিচ্ছুরিত হয় ঃ 'টাকাকড়ি না থাকলে আমি কী

করব? মামার প্রকাশকদের কাছে গেলুম টাকা চাইতে, তা উনি মারা গেছেন শুনে কেউ আর একটি পয়সাও ঠেকালে না। বলল, টাকা? টাকা কোথায়? আকাশ থেকে পড়লেন সবাই—ও'র তো কোনো পাওনা নেই আমাদের কাছে। বিস্তর টাকা আগাম নিয়ে রেখেছিলেন। তাই উশুল হতেই এখন সাত বছর লাগবে—বই বেচে আদায় করতে হবে আমাদের। তা, বই বিক্রি হলে হয় এখন! লেখক পটল তুললে তো তার বই আর কাটেনা ভাই বাজারে। এইসব বলে বিদেয় করে দিল সবাই। আমি কী করব?'

'ছ্যা, ছ্যা, এ কিসের পান্তুয়া হে?'

'যাক গে, যেতে দাও। এই পান্তুয়াই গিলবো গণ্ডা পাঁচেক। সকাল থেকে উপোস করে আছি এখেনে এসে সাঁটাবো বলে—ওই পান্তুয়াই সই! আনো তোমার পান্তুয়া যতো আছে।' বলে পাতের পান্তুয়া কামড় বসাতেই তিনি হ্যাক থুঃ করে উঠেছেন—'ছ্যা ছ্যা, এ কিসের পান্তুয়া হে?'

'কাঁচকলার।'

'কাঁচকলার পান্তুয়া! জন্মেও কখনো শুনিনি—পান্তুয়া তো ছানারই হয় বলে জানতাম।'

'ছানা যে কণ্ট্রোল তা কি আপনার জানা নেই মশাই?'

গোপাল তখন না জানিয়ে পারে না।

এমন সময়ে এক বুড়ো ভদ্রলোক লাঠি ঠুকঠুক্ করে ঢুকলেন আসরে। খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে চেহারাটা ঠিক ঠাওর হ'লনা। এসেই তিনি বললেন—'বা! হককলেই আছেন দেখতে আছি। কিন্তু যাঁর নাকি ছেরাদ্দ তাঁকে তো কই দ্যাখতেছি না?'

কথাটা শুনেই আমার পিত্তি জ্বলে যায়। বলে আমি নিজে রসের কথা বেচে খাই, আর আমার বাড়ি এসে ওপর চড়াও হয়ে এই রসিকতা? তাও আবার বস্তাপচা একখানা? আনকোরা হলেও না হয় কথা ছিল। আমার আর সহ্য হয় না।

হাসির ফোয়ারা

দ্বারভেদ করে বেরিয়ে আসি আমি—'দ্যাখবেন না ক্যান? এই তো দ্যাখতেছ্যান। আপনাগোর হামনেই তো খাড়া আছি দ্যাহেন!'

দেখেই না সবাই দুদ্দাড় করে পাতা ফেলে দে দৌড়! এমন কি সেই বুড়ো লোকটিও, লাঠি ফেলে দিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে একেবারে উধাও!

'মাটি করলে তো ভোজটা?' গোপাল বলে ঃ 'বললাম না তোমায় ঘাপটি মেরে লুকিয়ে থাকতে? সাত হাঁড়ি এই কাঁচকলার পান্তুয়া খাবে কে এখন?'

'আমিই খাবো। আবার কে খাবে? এই এত এত মিষ্টি জিনিস ফেলা যাবে নাকি? আমিই খাবো সাতদিন ধরে।'

'প্রাণ ভরে খাও মামা,' বলল গোপাল ঃ 'এ জিনিস ভিখিরিতেও মুখে তুলবে না, কুকুর বেড়ালেও ছোঁবে কি না সন্দেহ!'

'খাব তার কী হয়েছে? সকালে নিজের পিণ্ডি গিলেছি—সাতদিন ধরে কাঁচকলাই খাই এখন। আমার ছেরাদ্দর আর বাকী কিছু রইল না। পরের পয়ে আমার পয়সা—পরের পয়সায় আমার আয়—চিরকাল ধরেই দেখে আসছি। আর আমার বরাতে চিরটাকালই এই কাঁচকলা ভাই!'

মনের দুঃখে ভাগনেকে ভ্রাতৃসম্বোধন করে বসলাম।

অবশেষে সেই দিনটি এল। শেষের সেই শোকাবহ দিনটি ঘনিয়ে এল হর্ষবর্ধনের জীবনেও...

আমার সঙ্গে কথা কইতে কইতে হঠাৎ যেন তিনি ধুঁকতে লাগলেন। বললেন, বুকের ভেতরটা কেমন যেন করছে। কন কন করছে কেমন! বলতে বলতে শুয়ে পড়লেন সটান।

বুঝতে আর বাকী রইল না। রোজ সকালের দৈনিক খুলেই যে-খবরটা সব প্রথম নজরে পড়ে—তেমন খবর একটা না একটা থাকেই রোজ—কালকের কাগজ খুলেও আরেকটা সেইরকমের দুঃসংবাদ দেখতে পাব টের পেলাম বেশ।

যে-খবরে আত্মীয়বিয়োগ নয়, আত্মবিয়োগের ব্যথা অনুভব করে থাকি—আমারো তো উচ্চ রক্তচাপজনিত হার্টের দোষ ঐ—রোজই যে খবর পড়ে আমার বুক ধড়ফড় করে আর মনে হয় আমিই যেন মারা গেলাম আজ, আর আধঘণ্টা ধরে প্রায় আধমড়ার মতই পড়ে থাকি বিছানায়—মনে হোলো তেমন ধারার একটা খবর যেন আমার চোখের ওপর ঘটতে চলেছে এখন।

ক'দিন ধরেই ভদ্রলোকের শরীর তেমন ভালো যাচ্ছিল না, বুকের বাঁ দিকটায় কেমন একটা

ব্যথা বোধ করছিলেন—দেখাই দেখাই করে, কাজের চাপে পড়ে সময়াভাবে আর ডাক্তার দেখানো হয়ে উঠছিল না তাঁর...অবশেষে তিনি ডাক্তারের দেখা-শোনার একেবারেই বার হতে চলেছেন...মারাত্মক সেই করোনারি থ্রম্‌বোসিস্ এসে তাঁর হৃদয়ের দ্বারদেশে দাঁড়িয়ে কড়া নেড়েছে এখন।

তাহলেও ডাক্তার ডাকতে হয়।

ছুটলাম ট্যাক্‌সি নিয়ে রাম ডাক্তারের কাছে। এই এলাকায় নামকরা ডাক্তার বলতে গেলে তিনিই একমাত্র।

গিয়ে ব্যাপারটা বলতেই রাম ডাক্তার গুম হয়ে গেলেন। কিছু না বলে দুম করে তাঁর বিখ্যাত ডাক্তারি ব্যাগের ভেতর থেকে একটা অ্যামপিউল বার করে নিজের ইনজেকসনের সিরিঞ্জে ভরলেন।

ভয় খেয়ে আমি বলি—আজ্ঞে না, আমি নই। আমার কিছু হয়নি। কোনো অসুখ করেনি আমার। দোহাই, আমাকে যেন ইনজেকসন দেবেন না। হর্ষবর্ধন বাবুর বুকেই...বলতে বলতে আমি সাত হাত পিছিয়ে গেলাম ভয় খেয়ে। রাম ডাক্তারের ঐ এক ব্যারাম, অসুখের নাম করে কেউ সামনে এলে, কাছে পেলেই, ধরে তাকে এই ইনজেকসন ঠুকে দেন।

তিনি আমার কথার কোনো জবাব না দিয়ে সিরিঞ্জ হাতে বিনাবাক্যব্যয়ে সেই ট্যাক্‌সিতে গিয়ে উঠলেন। সিরিঞ্জ হাতেই নামলেন ট্যাক্‌সির থেকে আমার হাতে তাঁর ডাক্তারি ব্যাগ গছিয়ে দিয়ে।

গিয়ে দেখি হর্ষবর্ধন বিছানায় লম্বমান। দেখেই বুঝলাম হয়ে গেছে! দেহরক্ষা করেছেন ভদ্রলোক।

সিরিঞ্জটা আমার হাতে দিয়ে—'ধরুন, এটা ততক্ষণ' বলে রাম ডাক্তার হর্ষবর্ধনের নাড়ি টিপে দেখলেন। তার পর স্টেথিসকোপ বসালেন বুকে। অবশেষে গম্ভীর মুখে জানালেন—সব শেষ।

আমি 'ফল ধররে লক্ষ্মণের' মতন তাঁর সিরিঞ্জ হাতে কম্পাউণ্ডারের দুর্লক্ষণের ন্যায় দাঁড়িয়ে আছি তখনো।

'দিন ত সিরিঞ্জটা—' আমার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন—'ওষুধটা আর নষ্ট করব না। ও'র নাম করে সিরিঞ্জে যখন ভরেছি তখন ইন্‌জেকসনটা বর্‌বাদ না করে দিয়েই যাই বরং ওনাকে।'

বলে মড়ার উপরে খাঁড়ার ঘা মারার মতই ইন্‌জেকসনটা স্বর্গত তাঁর বুকের ওপর ঠুকে দিয়ে ভিজিটের টাকাগুলো গুনে নিয়ে ব্যাগ হাতে ট্যাক্‌সিতে গিয়ে চাপলেন আবার।

হর্ষবর্ধনের বৌ পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসলেন। আমি একখানা সাদা চাদর দিয়ে ঢেকে দিলাম শবদেহকে।

গোবর্ধন চোখের জল মুছে বলল—'কান্না পরে। ভায়ের কাজ করি আগে। আমি নিউ মার্কেটে চল্লাম, ফুল নিয়ে আসি গে। তারপরে খাট সাজাতে হবে। আপনি যদি পারেন তো ইতিমধ্যে কীর্তনীয়াদের ডেকে নিয়ে আসুন—বন্ধুর কর্তব্য করুন।'

'তার আগে চাই ডেথ সার্টিফিকেট।' আমি জানাই ঃ 'তা না হলে ত মড়া নিয়ে কেওড়াতলায় ঘেঁষতেই দেবে না। তাড়াহুড়োর মধ্যে ডাক্তারবাবু চলে গেছেন ভুলে—ডেথ সার্টিফিকেটটা না দিয়েই—সেটা লিখিয়ে আনিগে তাঁর কাছ থেকে। তার পরে ফেরার পথে তোমার সংকীর্তন পার্টির খবর নেব নাহয়।'

ডেথ সার্টিফিকেট পেলাম কিন্তু কেত্তুনেদের খোঁজ পাওয়া গেল না। তারা যে কোথায় থাকে, কোথায় যায় কেউ তা বলতে পারল না। শুধু এইটুকু জানা গেল যে আজকাল নাকি তাদের ঘোর চাহিদা। ঘৃত দুগ্ধপুষ্ট মনস্বী যতো বড় লোকদের মড়ক যেন লেগেই আছে চারধারে এখন।

ডেথ সার্টিফিকেট হাতে দরজাতে পা ঠেকাতেই চমকে উঠতে হোলো। বাড়িতে পা দিতেই যাঁর ক্রন্দন ধ্বনি কানে আসছিল তিনি আর্তনাদ করে উঠেছেন যেন অকস্মাৎ!

ঢুকে দেখলাম, হর্ষবর্ধনের স্ত্রীও নিষ্প্রাণ নিস্পন্দ সটান!

'সতীসাধ্বী সহমরণে গেলেন!' বলে তাঁর পায়ে হাতঠেকিয়ে নমস্কার করে নাকের গোড়ায় হাতটা ঠেকাতেই—ওমা! নিশ্বাস পড়ছে যে বেশ! অজ্ঞান হয়ে গেছেন মাত্র।

মুখে চোখে জলের ঝাপটা দিতেই নড়ে চড়ে উঠে বসলেন উনি।

'হঠাৎ অমন করে চেঁচিয়ে উঠলেন যে! হয়েছিল কী?' আমি জিজ্ঞেস করি।

তিনি ভীতিবিহ্বল নেত্রে বিগত হর্ষবর্ধনের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন—'মড়াটা নড়ছিল যেন মনে হল।' বলে নিজের আশঙ্কাটা ব্যক্ত না করে পারলেন না—'শনিবারের বারবেলায় গত হলেন, দানোয় পায়নি ত? ভূত প্রেত কিছু হননি ত উনি?'

'প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয়েছেন কিনা শুধোচ্ছেন? তা কি করে হয়? ওঁর মতন দানব্রত পুণ্যাত্মা লোক সটান স্বর্গে চলে গেছেন। উনি ত ভূত হবেন না—না কোনো ভূত ওঁর দেহে ভর করতে পারবে। ব'লে, মুখে সাহস দিই বটে কিন্তু সত্যি বলতে আমার বুক কেঁপে ওঠে—'রাম নাম করুন, তাহলেই আর কোনো ভয় নেইকো।'

'আমার শ্বশুর ঠাকুরের নাম যে, করি কি করে?' তিনি বলেন—'আপনি করুন বরঞ্চ।'

'আমাকে আর করতে হবে না রাম নাম। আমার নামের মধ্যেই স্বয়ং রাম আছেন, তার ওপর আমার হাতে সাক্ষাৎ রাম ডাক্তারের সার্টিফিকেট—এই দেখুন—ভূত আমার কাছ ঘেঁষবে না।'

দেখতে দেখতে হর্ষবর্ধন নড়ে চড়ে উঠে বসলেন বিছানার ওপর। খানিকক্ষণ যেন অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন চারদিকে। তারপর নিজেকে চিমটি কেটে দেখলেন বারকয়েক—'নাঃ, বেঁচেই আছি বটে।' বলে তারপর শুধোলেন আমাদের—'শিবরাম বাবু! আপনি অমন গোমড়া মুখে দাঁড়িয়ে কিসের জন্যে? গিন্নী, তোমার চোখে জল কেন গো?'

কারো কোনো বাক্যস্ফূর্তি না দেখে আপন মনেই যেন শুধালেন আবার—'কী হয়েছিল আমার?'

প্রশ্নটা আমার উদ্দেশ্যে নিক্ষিপ্ত মনে করে আমি তাঁকে পালটা জিজ্ঞেস করলাম—'আপনিই ত বলবেন আপনার কী হয়েছিল।'

'কিছুই হয়নি।' তিনি জানালেন তখন—'একটা ভারী বিচ্ছিরি দুঃস্বপ্ন দেখছিলাম যেন। এই রকমটাই মনে হচ্ছে এখন।'

'কিছুই হয়নি তাহলে। আপনি কিছু আর ভাববেন না। কর্তাকে গরম গরম এক কাপ কফি করে দিন তো।' বললাম আমি শ্রীমতীকে।

উনি দু কাপ কফি করে নিয়ে এলেন—আমার জন্যও এক কাপ ঐ সঙ্গে।

কফির পেয়ালা নিঃশেষ করে তিনি বললেন—'আপনার হাতের কাগজটা কী দেখি তো।'

কাগজখানা হস্তগত করে নাড়াচাড়া করলেন খানিকক্ষণ, তারপর বললেন—'ডাক্তারদের প্রেসক্রপসনের মাথা মুণ্ডু কিছু যদি বোঝা যায়! কম্পাউণ্ডাররাই বুঝতে পারে কেবল।'

ওষুধটা আর নষ্ট করব না, নাম করে সিরিঞ্জে যখন ভরেছি [পৃষ্ঠা ৮১

ইতিমধ্যে গোবরা কয়েক তোড়া ফুল নিয়ে এসে হাজির।

'এত ফুল কিসের জন্যে রে? ব্যাপার কি আজ?' অবাক হয়ে শুধিয়েছেন তিনি।

'আজ যে আপনাদের বিয়ের তারিখ তা একদম মনে নেই আপনার? সে কারণে আমার কথায় গোবর্ধন ভায়া ফুল কিনে আনতে গিয়েছিল বাজারে। নতুন ফুলশয্যার দিন না আজ আপনার?'

'বিয়ের তারিখ বুঝি আজ? তাই নাকি? একেবারেই মনে ছিল না আমার!' বলে আপন মনেই যেন তিনি গজরান—'মনেও থাকে না তারিখটা। রাখতেও চাইনে মনে করে। বিয়ের তারিখ তো নয়, আমার মৃত্যুর তারিখ। অপমৃত্যুর দিন আমার।'

হাসির ফোয়ারা

আমি একবার বক্রকটাক্ষে শ্রীমতী হর্ষবর্ধিনীর দিকে তাকাই। তিনি কিছু বলেন না। তাঁর ভারিক্কী মুখ যেন আরো ভারী হয়ে উঠেছে দেখা যায়।

হর্ষবর্ধন রাম ডাক্তারের সার্টিফিকেটখানা গোবরার হাতে দিয়ে বললেন—'যা তো গোবরা! রাম ডাক্তারের এই প্রেসক্রুপসনটা নিয়ে সামনের ডিসপেনসারির কম্পাউন্ডার বাবুকে দে গিয়ে—যেন এই ওষুধটা চটপট বানিয়ে দেন দয়া করে।'

গোবর্ধন বেরিয়ে গেলে আমার দিকে ফিরলেন তিনি—'ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে অদ্ভুত এক স্বপ্ন দেখলাম মশাই! বলব স্বপ্নটা আপনাকে একসময়। আপনি গল্প লিখতে পারবেন তার থেকে। কিন্তু স্বপ্ন দেখে আমি তেমন অবাক হইনি মশাই—স্বপ্ন আমি প্রায়ই দেখি, ঘুমোলেই স্বপ্ন দেখতে হয়। কিন্তু এই অবেলায় হঠাৎ এমন ঘুমিয়ে পড়লাম কেন, এমন তো ঘুমোই না, তাই ভেবেই আমি অবাক হচ্ছি আরো।'

'ঘুমের আবার বেলা অবেলা আছে নাকি?' ঘুমের তরফে সাফাই গাইতে হয় আমায়—'সব সময়ই হচ্ছে ঘুমের সময়। সকাল, সন্ধ্যে, দুপুর, বিকেল। তার ওপর রাতের বেলা ত বটেই। যখন ইচ্ছে ঘুমোন। আমি তো সময় পেলেই একটুখানি ঘুমিয়ে নিই মশাই! অসময়েও ঘুমোই আবার। ঘুমোতে তো আর ট্যাকসো লাগে না...'

বলতে বলতে গোবর্ধন একটা শিশি হাতে ফিরে এল—'এই মিকচারটা বানিয়ে দিল কম্পাউন্ডার। তিন ঘণ্টা বাদ বাদ খাবে। এক দাগ খেয়ে ফ্যালো চট করে এক্ষুণি।'

হর্ষবর্ধন এক দাগ গিলে যেন একটু চাঙ্গা বোধ করলেন—'বাঃ বেড়ে ওষুধ দিয়েছে তো! খেতে না খেতেই বেশ সুস্থ বোধ করছি। থাক প্রেসক্রুপসনটা আমার কাছে।' বলে গোবর্ধনের হাত থেকে সেই ডেথ-সার্টিফিকেটখানা নিয়ে নিজের বালিশের তলায় গুঁজে রাখলেন তিনি—'মনে হচ্ছে ওটা খেয়ে যেন নবজীবন লাভ করলাম। চালিয়ে যেতে হবে ওষুধটা। রাম ডাক্তারের দাবাই বাবা! ডাকলে সাড়া দেয়!'

'আপনার এয়োতির জোরেই বেঁচে গেছেন উনি এ যাত্রা!' কানে কানে ফিস ফিস করে এই কথা বলে ওঁর বৌয়ের হাসিমুখ দেখে আর ওঁকে বহাল তবিয়তে রেখে ওঁদের বাড়ি থেকে বিদায় নিলাম সেদিন।

দিন কয়েক বাদে হর্ষবর্ধন রাম ডাক্তারের বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, এমন সময় এক পশলা বৃষ্টি আসতেই তিনি বাড়ির দোর গোড়াটায় গিয়ে দাঁড়ালেন।

তারপর সেখানেও বৃষ্টির ছাঁট আসছে দেখে ভাবলেন, রাম ডাক্তারের ওষুধ খেয়ে এমন ভালো আছেন, তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করে ধন্যবাদটা জানিয়ে যাই।

ভেবে যেই না তাঁর চেম্বারে ঢোকা রাম ডাক্তার তো আঁ আঁ করে আঁতকে উঠেছেন তাঁকে দেখেই না!

● হর্ষবর্ধনের অক্কালাভ

'ডাক্তারবাবু! ডাক্তারবাবু! চিনতে পারছেন না আমায়? আমি শ্রীহর্ষবর্ধন।' তাড়াতাড়ি তিনি বলেন—'আপনার ওষুধ খেয়ে আমি ঢের ভালো আছি এখন। বুকের সেই ব্যথাটাও নেই আর। সেই কথাটাই বলতে এলাম আপনাকে।'

'আমি তো কোনো ওষুধ দিয়ে আসিনি আপনাকে। শুধু একটা কোরামিন ইনজেকসন দিয়েছিলাম কেবল...তবে কি, তারই রি-অ্যাক্শনেই আপনি পুনর্জীবন...'

'সে কি! আমাকে দেখে এই প্রেসক্রৃপসনটা দিয়ে আসেননি আপনি?' বাধা দিয়ে বললেন হর্ষবর্ধন : 'কাগজখানা সেই থেকে আমি বুকে করে রেখেছি যে। কখনো কাছ ছাড়া করিনে। আপনার এই প্রেসক্রৃপসনের ওষুধ খেয়েই ত আমি নবজীবন লাভ করলাম মশাই।'

কাগজখানা তিনি বাড়িয়ে দিলেন রাম ডাক্তারের দিকে।

'প্রেসক্রৃপসন? দেখি—আঁ—এটা তো আপনার ডেথ সার্টিফিকেট—আমিই দিয়েছিলাম বটে।'

'ডেথ সার্টিফিকেট?...আঁ...?' এবার আঁতকাবার পালা হর্ষবর্ধনের। কাঁপতে কাঁপতে সামনের চেয়ারটায় বসে পড়লেন তিনি।

'আমার ডেথ সার্টিফিকেট? তাই-ই বটে!' খানিকটা সামলে নিয়ে তিনি বললেন তারপর —'তাহলে ঠিকই হয়েছে। আমার সেই ভীষণ স্বপ্নটার মানে আমি বুঝতে পারছি এখন...এতক্ষণে বুঝলাম।'

'আপনি কি তাহলে মারা যাননি না কি?'

'না, মারা গিয়েছিলাম ঠিকই। ঠিকই ডেথ সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন আপনি...'

'তাহলে কি এখন ভূত হয়ে...' ভয় খেলেও তেমন ভয়াবহ কিছু নয় বিবেচনা করে ডাক্তার তত ঘাবড়ালেন না এবার—'দেখুন স্বর্গীয় হর্ষবর্ধন বাবু! আমার কোনো দোষ নেই। আমি আপনাকে মারিনি! সে সুযোগ আমি পাইনি বলতে গেলে। আমি গিয়ে পেঁছবার আগেই আপনি খতম হয়েছিলেন...।'

'না না, আপনার কোনো দোষ দিচ্ছিনে। আমি মারা গেছলাম ঠিকই। আমার নিজগুণেই মরেছিলাম। আপনার ডেথ সার্টিফিকেটেও কোনো ভুল হয়নিকো। যমালয়েও নিয়ে গেছল আমায়। ঘটনাটা যা হয়েছিল বলি তাহলে আপনাকে। যমালয়ের ফেরতা বেঁচে ফিরে এলাম কি করে আবার—শুনলে আপনি অবাক হবেন।'

সন্দেহ একেবারে না গেলেও রাম ডাক্তার উৎকর্ণ হন।

'যমদূতেরা নিয়ে গিয়ে যমরাজার দরবারে তো হাজির করল আমায়।'—বলে যান অভূতপূর্ব হর্ষবর্ধন—'দেখলাম, বিরাট সেরেস্তার সামনে সিংহাসনে বসে আছেন যমরাজ। সামনে দপ্তর নিয়ে বসে তাঁর চিত্রগুপ্ত—তিনিই যে চিত্রগুপ্ত, কেউ না বলে দিলেও, তাঁর দিকে তাকালেই তা মালুম হয়। যমদূতেরা সব ইতস্ততঃ খাড়া।

হাসির ফোয়ারা

যমরাজ আমাকে দেখে গুপ্তমশাইকে ডেকে বললেন—'দেখত হে, এর পাপ-পুণ্যের হিসাবটা দ্যাখো তো একবার।'

খতিয়ান দেখে চিত্রগুপ্ত জানালেন—'প্রভু! এর পুণ্যকর্মই বেশী দেখছি। তবে পাপও করেছে কিছু কিছু।'

ডাক্তার তো আঁ আঁ করে আঁতকে উঠেছেন তাঁকে দেখেই [পৃঃ ৮৪

'কী পাপ?'

'আজ্ঞে ভ্যাজালের কারবার। ভারতখণ্ডের বেশির ভাগ লোকই যা করছে আজকাল।'

'কিসে ভ্যাজাল দিত লোকটা?'

'কাঠের ভ্যাজাল।'

'প্রভু! কাঠ কি কোনো খাবার জিনিস না ওষুধ পত্তর, যে তাতে আমি ভ্যাজাল দিতে যাব?' প্রতিবাদ না করে পারলাম না আমি—'কাঠ কি কেউ খায় কখনো? না, কাঠে কেউ ভ্যাজাল দিতে যায়? কাঠের আবার ভ্যাজাল হয় না কি?'

'কিন্তু হয়েছে।' চিত্রগুপ্ত বললেন—'লোকটা দামী সেগুণ কাঠ বলে বাজে বেগুণকাঠের ভ্যাজাল চালাত।'

'আপনি অবাক করলেন গুপ্তমশাই!' আমি বললাম তখন—'পাট গাছ থেকে যেমন ধান হয়ে থাকে, সেই রকম কথাটাই বলছেন না আপনি? বেগুন গাছের থেকে কাঠ হয় নাকি আবার? পাটগাছের থেকে তবু পাটকাঠি মেলে, কিন্তু বেগুন গাছের থেকে কাঠ দূরে থাক একটা কাঠিও যে পাওয়া যায় না মশাই!'

'বেগুণ মানে গুণহীন, নির্গুণ, বাজে।' ব্যাখ্যা করে দিলেন চিত্রগুপ্ত। 'দামী বলে বিলকুল বাজে কাঠ ছেড়েছ তুমি বাজারে।'

হাসির ফোয়ারা

কথাটা মেনে নিতে হয় আমায়।—'তা ছেড়েচি বটে প্রভু! কিন্তু দেখুন, শাস্ত্রেই বলেছে আমাদের—মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থা। সদা মহাজনদের পথে চলিবে। আমিও সদা সিধে তাই চলেছি। মহা মহা ব্যক্তিরা—কে নয়?—নানাভাবে ভ্যাজাল চালাচ্ছে এখন—বেপরোয়া চালিয়ে যাচ্ছে—তাই দেখে আমিও...'

যমরাজ বাধা দিলেন আমার কথায়—'চিত্রগুপ্ত, এর জন্য, কতদিন নরকবাসের দণ্ড দেয়া যায় লোকটাকে?'

'ধর্মরাজ! বিশ বছর তো বটেই। পাপের বিষ ক্ষয় হতে ঐ বিশ বছরই যথেষ্ট—বিশে বিষক্ষয় হয়ে যাক...তবে এর স্বর্গবাসের সময়টাই ঢের বেশি আরো...।'

ধর্মরাজ তখন আমার দিকে তাকালেন—'তুমি আগে স্বর্গভোগ করতে চাও, না নরকভোগটাই করবে আগে?'

'যা আপনি মঞ্জুর করবেন!' কৃতাঞ্জলিপুটে আমি বললাম। আমার কথার কোনো জবাব না দিয়ে যমরাজ নিজের হাতের নোখগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন। দেখলাম, তাঁর হাতের নোখগুলো বেড়েছে বেজায়—দেখবার মতই হয়েছে সত্যি!

বললাম—'অবিলম্বে আপনার নোখ কাটার দরকার কর্তা! বড্ডো বড় হয়েছে যথার্থই! যদি অনুমতি করেন আর একটা নরুন পাই, অভাবে ব্লেড, তাহলে আমিই কেটে দিতে পারি।'

'নোখ না, আমি নখদর্পণে তোমার কলকাতার পরিস্থিতিটা দেখছিলাম।'

'আজ্ঞে, কলকাতায় আমার কোনো পরিস্থিতি নেই। আমার পেত্নীস্থিতি। আমার বাড়িতে যিনি আছেন কোনো ক্রমেই তাঁকে পরি বলা যায় না। পেত্নী বললেই ঠিক হয়। এমন দজ্জাল। ঘ্যানঘেনে আর খ্যানখেনে কুঁদুলে বৌ আর দুটি এমন দেখিনি। পেত্নী নিয়েই হয়েছে আমার ঘর করা...।'

'যদি তোমাকে বাঁচিয়ে আবার তোমার বাড়িতে ফিরিয়ে দেওয়া হয়?'

'দোহাই হুজুর, তাহলে আমি মারা পড়বো। মারা যাবো আবার আমি। অমন বৌয়ের কাছে আমি ফিরে যেতে চাইনে, তার চেয়ে নরকেও যাব আমি বরং।'

'দেখছিলাম তাই। তোমার ঘরের পরিস্থিতি এই, বাইরের পরিস্থিতি যা দেখছি কলকাতায় তা আরো ভয়াবহ...রাস্তায় খানাখন্দ, আর আঁস্তাকুড়ের গন্ধ, যত রাজ্যের জঞ্জাল। ট্রামে বাসে বাদুড়ঝোলা হয়ে যাচ্ছে মানুষ, রাস্তায় রাস্তায় শোভাযাত্রা, আপিসে আপিসে ঘেরাও, চালে কাঁকর, তেলে ঘিয়ে ভেজাল, চিনিতে বালি, বালিতে গঙ্গামাটি, দুধে জল যে রকমটা দেখলাম আমার এই নখদর্পণে তাতে মনে হয় কলকাতাটাই এখন নরক হয়ে দাঁড়িয়েছে। কত বললে চিত্রগুপ্ত? বিশ বছরের নরকবাস না? তোমার আয়ু বিশ বছর বাড়িয়ে দেওয়া হোলো আরো। যাও, গিয়ে তোমার কলকাতা গুলজার করো গে।'

আর, তারপরই আমি বেঁচে উঠলাম তৎক্ষণাৎ। বলে হর্ষবর্ধন একটা সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

কর্মযোগীর কর্মভোগ

যোগানদারি কাজে বিয়োগ আছেই। এক ঘর থেকে নিযুক্ত করে অন্য ঘরে নিযুক্ত করতে পারাটাই এর গুণ। যোগানো মানেই বিয়োগানো; যতটা নৈপুণ্যের সঙ্গে যে তা পারে ততই তার বাহাদুরি। লাভের কড়ি ভাগ করতে জানাটাই এর গুণগরিমা। এই ভাবে বহু গুণ হয়ে ভাগফল যেটা দাঁড়ায় সেটাই ভাগ্যফল!

এবং শেষ পর্যন্ত 'মা ফলেষু' হয়ে দাঁড়ালেও সে বিচলিত হয় না, অনুরূপ আরেক মরীচিকার পেছনে দৌড়তে প্রস্তুত হয়—সেই হচ্ছে খাঁটী যোগানদার। গীতায় তাকেই কর্মযোগী বলেছে। 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা'—ত্যাগের দ্বারাই যার ভোগ, কর্মভোগ বলাই উচিত, কিন্তু ত্যক্ত হওয়া যার ধর্ম নয়—মহাভারতজোড়া সেই মহাপুরুষেরই তো মাহাত্ম্য!

নিজের জীবনদর্শনের সঙ্গে জড়িয়ে এই সব তত্ত্বকথা ভাবছিলাম। 'করম্‌চাঁদ!' 'করম্‌চাঁদ ' 'করম্‌চাঁদ নিয়োগী!'—ভারী ডাকাডাকি পড়ে গেছল চার দিকে। 'করম্‌চাঁদ নিয়োগীকে ডাকছেন বড় বাবু!' এই খবর জানিয়ে ছোটবাবু আমার পাশ দিয়ে চলে গেছেন খানিক আগেই।

কিন্তু আমি কান দিইনি। সত্যি বলতে, ঠিক কী নামে যে এখানের কাজে আমি যোগ দিয়েছি আমার নিজেরই মনে ছিল না। 'সাম্‌হোয়ার্‌ ইন আসাম' যোগানদারের আড়ত। মিলিটারি ঠিকাদারির কাজ। অনেকখানি জায়গা জুড়ে ছাউনি ; ছোট সাহেব, বড় সাহেব, ছোট বাবু, বড় বাবু ; কেরানী, কুলীমজুর, মাল এবং বামালে ছয়লাপ! তার মধ্যে আমিও একজন কাজের লোক।

"এই করম্‌চাঁদ! ছোটবাবু যে গোরু খোঁজা করছেন তোমায়!" একজন সহকর্মী এসে আমাকে জানালো।

"তাই নাকি?" চম্‌কে উঠতে হয়—"শুনতে পাইনি তো।"

"যাও শোনোগে তাঁর তাঁবুতে, কেন ডাকছেন। এই ডাকাডাকির ছুতোয় আমাদের কাজের মধ্যে এসে আবার তিনি ঘোরাফেরা করেন সেটা আমরা চাইনে।" সহকর্মীর একটু উত্ত্যক্ত ভাব। —"তাঁর নেকনজরের বাইরেই থাকতে চাই আমরা।"

"কর্মবীর আমার নাম। কর্মবীর নিয়োগী। করম্‌চাঁদ তো নয়, তাই চুপ করে আছি। আমায় যে ডাকা হচ্ছে তা আমি জানব কি করে?" অনুযোগের সুরে আমি বলি।

"গেলেই টের পাবে। তুমি ছাড়া আর কোনো কর্ম নেই আমাদের এখানে।" সহকর্মী জানায়। "এখানকার আমরা সবাই অকম্মা—সবাই জানে!"

আস্তে আস্তে পিরানটা গায়ে দিয়ে খাড়া হলাম। ছোটবাবু চেঁচাচ্ছিলেন তখনো।

"আমাকে ডাকছেন ছোটবাবু?"

"কোথায় ছিলে এতক্ষণ? আধ ঘণ্টা ধরে আমি চেঁচিয়ে মরছি।" ছোটবাবুর গলা মোটেই খাটো নয়। "যাও বড়বাবুর তাঁবুতে যাও। তিনি তোমায় খুঁজছেন কেন জানিনে।"

বড়বাবু নিজেই এগিয়ে এসেছেন দেখা গেল।—"ও, তোমারই নাম করম্‌চাঁদ? তুমিই বুঝি নতুন ভরতি হয়েছ? তোমার সঙ্গে আমার একটু কথা ছিল।"

কথায় কথায় তিনি আমাকে আড়ালে ডেকে নিলেন। "এর আগে তুমি কী কাজ করতে করম্‌চাঁদ?" জিজ্ঞেস করলেন আমায়।

"নাইটের কাজ করতাম।" আমি জানাই।

"নাইটের কাজ? ও, তাহলে তো দিনের কাজ করতে তোমার খুব অসুবিধা হচ্ছে এখানে—"

"আজ্ঞে, সে-নাইট নয়। একজন নাইটের কাছে কাজ করতাম। একজন সারের সেক্রেটারী ছিলাম। এস্‌-আই-আর্‌—সার! ষাঁড় নয়।" প্রকাশ করে বলতে হোলো তখন।

"ও, সেই নাইট! ভালো ভালো। তাহলে তুমি পারবে। আমাদের বড় সাহেবের একজন প্রাইভেট সেক্রেটারীর দরকার। কার কাছে কাজ করছিলে বল্লে?"

"জব্বলপুরের সার্‌ রামশঙ্কর পাল। তিন বছর ছিলাম তাঁর কাছে।"

"জব্বলপুর? জব্বলপুরে আমি কখনো যাইনি! পশ্চিমের কাউকে চিনি নে। যাই

হোক্। এরূপ উচ্চপদস্থ ব্যক্তির কাছে যদি তুমি কাজ করে থাকো তাহলে এহেন কাজ তোমারই যোগ্য। আমাদের বড় সাহেবের কাজ কিছু শক্ত নয়। বোতল থেকে গ্লাসে ঢেলে দেওয়া—এই কেবল কাজ। তা, তুমি পারবে।"

"নিশ্চয়। এতো আমার লাইনেরই। সেখানেও ঠিক এই কাজই করতাম। বড় লোকদের প্রাইভেট কাজ, এ ছাড়া প্রাইভেট সেক্রেটারির কাজ আর কী হতে পারে, বলুন না?"

একজন সারের সেক্রেটারী ছিলাম। [পৃঃ ৮৯

"তা বটে। তা বেশ। তাহলে তোমার নামটাই বড় সাহেবের কাছে পেশ করে দেব। এখন যা বেতন পাচ্ছো তার তিন গুণ পাবে, বুঝেছ? তোমার রিসট্ ওয়াচটি তো ভারী খাসা দেখছি। একবার দেখতে পারি?"

"নিশ্চয় নিশ্চয়।" রিসট্ ওয়াচটা খুলে ও'র হাতে দিলাম—"এটা খাঁটী সোনার। বাবা আমাকে উইল করে দিয়ে গেছেন। এর সঙ্গে আরো অনেক দামী দামী জিনিস ছিল। বাবা এক নেটিভ স্টেটের দেওয়ান ছিলেন কিনা।"

"চমৎকার ঘড়ি। দামীও বটে। পিছনে মনোগ্রাম করা আছে দেখা যাচ্ছে।" বড়বাবু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ঘড়িটা দ্যাখেন।

"হাঁ, মশাই! এন সি এন—নরমচাঁদ নিয়োগী—আমার বাবার নাম।" বলতে বাধ্য হই।

"এটা তোমার বিক্রি করবার ইচ্ছে নেই? না?"

"প্রাণ থাকতে নয়। বাবার জিনিস, ছেলের কি উচিত তা কাবার করা—আপনিই বলুন?" আমি বলি, "তবে আপনার যদি ধূমপানের ধুমধাম থাকে তাহলে আপনাকে আমি একটা রুপোর সিগ্রেট কেস দিতে পারি। সেটাও বাবার কাছ থেকে পাওয়া, কিন্তু আমি তো সিগ্রেট খাই না,

তাই সেটা আমার কোনো কাজেই লাগছে না। যদি অনুমতি করেন, যদি আপনার আপত্তি না থাকে তাহলে সেটি আপনাকে উপহারস্বরূপ দিতে পেলে আমি ধন্য হব।"

"বেশ, তাই দিয়ো। তোমার ব্যবহারে বড্ড প্রীত হলাম। কিন্তু এই উপহারের কথাটা যেন ঘূণাক্ষরে প্রকাশ না পায়, বুঝেচো?" বললেন বড়বাবু।

"আজ্ঞে, সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকবেন। প্রাইভেট সেক্রেটারীর কাজ করে করে আমার হাড় পেকেছে, ও বিষয়ে আমাকে বেশী করে বলতে হবে না।"

বড় সাহেবের সেক্রেটারী হয়ে মাস খানেক তো কাটানো গেলো কোনোরকমে। কাজটা বেতোরিবৎ নয়, তবু গোড়ায় যেন একটু কেমন কেমন লাগত! কখনো ঠিক এধরনের কাজ করিনি তো! বোতল থেকে গেলাসে ঢালাঢালির এই ঢালাও কারবার রপ্ত ছিল না এর আগে। তবে বড় সাহেব পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা করে আমার সাধুতা এবং সততার পরিচয় পেয়েছিলেন। তাঁর হুইস্কির বোতলে দাগ মারা থাকতো তা আমার নজর এড়িয়ে যায় নি। কিন্তু তাঁর বোতল ফাঁক করে খাবার আমার কী দরকার? এখন আমার পয়সার কোনো অভাব ছিল না। কিনেই খেতে পারতাম, ইচ্ছে করলে। এবং সব চেয়ে সুবিধা, আমার এই নতুন কাজটার কোনো ঝক্কি ছিল না। সাধারণ মজুর কিংবা কেরানীর মত—খাটুনিই নেই বলতে গেলে। বেশ আরামের চাকরি। অবসর মতো কাজ করো, আর কাজ হচ্ছে যতো অবসর সময়ের! কাজের মধ্যে কেবল বড় সাহেবের টেবিল গুছিয়ে রাখা আর তাঁর মর্জিমাফিক ঐ যা বলেছি—ঢালাঢালি। খালি ঢালাঢালির দিকটাই আমার—ঢলাঢলি যা করবার তিনিই করতেন।

এমনি তোফা চলছিল, এমন সময়ে—যাকে বলে সেই বিনা মেঘে বজ্রাঘাত—সেই অঘটনটা ঘটল। এবং বলা দরকার তা সম্পূর্ণ আমার নিজের দোষে। আমার অসতর্কতার জন্যেই। স্বভাবতই আমি সর্বদা সাবধান, কিন্তু গলদ যখন ঘটবার, কে আটকাবে? আমার সেই হাতঘড়িটা নিয়েই কান্ড বাধলো।

বড় সাহেবের ঢালাঢালির সময়ে মাঝে মাঝে আমি হাতঘড়িটা খুলে রাখতাম—টাঙিয়ে রাখতাম চোখের সীমানায়—সামনের দেয়ালে—এক পলকের জন্যও ওকে আমার আড়চোখের আড়াল হতে দিতুম না। যাকে বলে চোখে চোখে রাখি হায়রে—! কিন্তু হলে কী হবে—

সে দিনটায়, কোন খেয়ালে, ঘড়িটা আমি সেই দেয়ালেই ফেলে রেখে বেরিয়ে এসেছি। ফলে, এখন আমায় এই আদালতে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছে। আমি নাকি কবে নিফ্‌টার নিকল্‌সন্ সাহেবের পাঁচলাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকার হীরে জহরতের জিনিস নিয়ে সরে পড়েছি, আমার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ।

কি করে যে এমনটা ঘটল তা আমার কাছে এখন আর অস্পষ্ট নয়। এই নিফ্‌টার ক্রু নিকল্‌সন্ লোকটি আমাদের বড় সাহেবের বন্ধু। কার্যগতিকে হঠাৎ আসামে আসায়, আমাদের

হাসির ফোয়ারা

বড় সাহেবের সঙ্গে মুলাকাৎ-করতে এসেছিলেন। সাহেবের ঘরে ঢুকে প্রথম দর্শনেই ঘড়িটা তাঁর চোখে পড়ে—এবং তৎক্ষণাৎ নাকি তাঁর চক্ষুস্থির হয়ে যায়। আমি তখন সেখানে উপস্থিত ছিলাম না তবে শুনেছি যে তিনি প্রায় মূর্ছিত হয়ে পড়েছিলেন। ঐ ঘড়িটা নাকি বিলেতের কোন রাজা না রানী তাঁকে উপহার দিয়েছিল, তাঁর মূর্ছার ঘোর কাটবার পর এই কথা জানা যায়।

প্রথম দর্শনে ঘড়িটা তাঁর চোখে পড়তেই তৎক্ষণাৎ তার চক্ষুস্থির!

বড়বাবুর জন্য আমার দুঃখ হয়। ভদ্রলোক বড় ভাল, যথাসাধ্য আমার উপকার করার চেষ্টা করেছিলেন,—উপকারের ফলে যে এমনটা হবে তিনি তা ভাবতে পারেননি। তাঁর প্রতি আমি কৃতজ্ঞ, কিন্তু তাঁকে আমি সেই সিগ্রেট কেস্‌টি উপহার দিতাম কিনা এখন আমার সন্দেহ আছে। ঘড়ির চেয়েও যে ওটা আরো দামী—ওটা যে আদত প্লাটিনামের তা আদৌ আমার জানা ছিল না। ওটাও নাকি নিকল্‌সন্‌ সাহেবের ঘর থেকে নিকাল-করে-আনা।

এখন এই কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে ওরফে-যুক্ত আমার এক গাদা নামের তালিকা স্বকর্ণে আর অম্লানবদনে শুনতে হচ্ছে আমায়! এর আগে কতোবার কতোভাবে আমার জেলখাটা হয়ে গেছে তাও আমি শুনছি। শুনতে বাধ্য হচ্ছি, এবং বড়বাবু ও ছোটবাবুও—সাক্ষী গোপালরূপে তাঁরাও উপস্থিত এখানে—তাঁরাও শুনছেন। প্রথম দিন তাঁদের নামডাকে সাড়া দিতে কেন যে আমার অতো দেরি হয়েছিল তাও তাঁরা বেশ বুঝতে পারছেন এখন।

টিকিট কিনতে কিনতেই গেলাম! আজ জলসা, কাল কনসার্ট, পরশু মণিপুরী নৃত্য, তার পরদিন চ্যারিটি অভিনয়—এমনি একটা না একটা চলেছে তো চলেছেই, দিনের পর দিন, হপ্তার পর হপ্তা, কামাই নেই, আর কমাও নেই। আর এ সবের টিকিট না কিনেই কি পার পাবার জো আছে?

টিকিট কিনতে কিনতেই ফতুর হয়ে গেলাম বলতে গেলে! একটু আধটু লিখেটিখে এখান সেখান থেকে, একান্ত চেষ্টা-চরিত্রে এক-আধ টাকার টিকি দেখতে পাচ্ছি কি পাচ্ছিনে—এবং যাও বা পাচ্ছি, টিকিটেই কাবার হয়ে যাচ্ছে, দেখতে না দেখতে।

পরের হিতকল্পেই অবিশ্যি ওসব। চ্যারিটির টাকাটা ঘরে বেঁধে কেউ নিয়ে যাচ্ছে না, ধরে-বেঁধে সাধলেও না। হয় কোন সমিতি, নয় কোন সংঘ অথবা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কারো কন্যাদায় কিংবা কোথাকার বন্যাদায়,—এই সব ব্যপদেশেই এহেন যত বন্য আদায় বলতে গেলে। অপরের উপকার করবার উপলক্ষেই এই সব কারবার—তাছাড়া কী আর?

হাসির ফোয়ারা

নিজের অপকার করে পরের উপকার করা— এহেন উদ্দেশ্যের মহত্ত্ব নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে আমার মতদ্বৈধ আছে। যে সব বন্ধুরা চ্যারিটির টিকিট বেচতে আসেন, তাঁদের কথাই বলছি আমি। কিন্তু আমার অভিমতকে তাঁরা ধর্তব্যের মধ্যেই ধরেন না। স্পষ্টই বলে বসেন ঃ "তোমার মতের আবার মূল্য কি হে? তোমার মতামতে কিছু যায় আসে না।"

সত্যি, আমার কথার কোন অর্থ হয় না, সেটা আমি বুঝি। কিন্তু অর্থব্যয় হয়, সেই জন্যই একটু ইতস্ততঃ করি।

"তাতে যায় আসে না, তা বটে, তবে টাকাটা আমার যায় কিনা।" আমতা আমতা করে বলি, তত্রাচ বলি।

"কিন্তু যাচ্ছে তো পরের জন্যেই? পরের উপকারের হেতুই। লোকে পরের জন্য প্রাণ দ্যায়, দিতে কসুর করে? তুমি তো একটা টিকিট কিনছো কেবল। হয় পাঁচ টাকার, নয় দু'টাকার, নয় তো এক টাকার। বড় জোর না হয় একখানা দশ টাকারই কিনবে, এর বেশী তো নয় আর?"

তা বটে! এবং ভাবনার কথাই বটে! বড় জোর একটা দশ টাকারই কিনবো—তার বেশী তো আর না।

"আচ্ছা—নিজেকে পর ভাবলে হয় না? ক্ষতি কি তাতে?" পকেটের মধ্যে মানিব্যাগ আঁকড়ে আমার সর্বশেষ প্রয়াস ঃ "সে রকম ভাবলে আমার টাকাটা—আই মীন্—পরের টাকাটা আর বাজে খরচ হতো না। পরের জিনিস তো আর আমি বরবাদ করতে পারি না! তুমিই বলো—পারি কি?"

"নিজেকে পর ভাববে? তার মানে?" বন্ধুবর বিস্মিতই হন।

"মানে, নিজেকে পর ভেবে নিজের উপকারই করে ফেল্লাম না হয়। পরকে আপনার ভাবতে দোষ কি? তাইতো দস্তুর।"

বন্ধু ভারী গোলমালে পড়ে যায়—"আপনার—পর—এসব কি বকচ তুমি হে? আবোল তাবোল যতো পাগলের মত?"

পাগলের মতই বটে। জানি, সাফল্য সুদূরপরাহত, তবু পরের তরফে প্রাণপণ ওকালতি চালিয়ে যাই, নিজেকে বাঁচাতেই—"নিজের মত পর কেউ আছে নাকি হে? অপরে মারা গেলে তবু আমরা কাঁদতে পাই, কাতর হয়ে পড়ি, শোকসভা করে থাকি—কিন্তু নিজের মৃত্যুশোক গায়েই লাগে না। নিজে মারা গেলে দুঃখই হয় না—টেরই পাওয়া যায় না বলতে গেলে। তবে?"

কিন্তু যাবতীয় জটিলতা কাটিয়ে উঠবার অসীম ক্ষমতা আমার বন্ধুদের। উক্ত নিদারুণ দার্শনিক সমস্যা সমূহের ধার ঘেঁষেও তাঁরা যান না—কিংবা ধার ঘেঁষেই তারা বেরিয়ে যান—অবলীলাক্রমেই কেটে পড়েন, বলতে কি!

হাসির ফোয়ারা

"ওসব বাজে কথা রাখো! টাকাটা বের করো দেখি, বাপু!" এক কথাতেই সমস্ত কথা সাফ্ ক'রে দ্যান তাঁরা। অগত্যা আত্মসংবরণ করে মুখ ব্যাজার করেই আমার মানিব্যাগের মুখ ফাঁক করতেই হয়। কিন্তু বন্ধু হ'লে তবু রক্ষে ছিল, কমপক্ষে এক টাকার কাটলেই কাটান ছিল, তাতেই যা বাঁচোয়া, এবং পারলে, পালাতে পারলে, পালিয়েও পার পাওয়া যেত, তাও কম কথা নয়। কিন্তু মুশকিল হয়েছে আমাদের বিনিকে নিয়ে। বিনিও ঠিক না, বিনির কলেজের বান্ধবীদের—বিনির থেকেই যাদের সূত্রপাত, বিনি সুতোয় যে সব বিভিন্ন ফুল গাঁথা পড়েছে—তাদের নিয়েই বেধেছে ফ্যাসাদ! তারাও আবার টিকিট গছাতে লেগে গেছে। তাদের হাত থেকে রেহাই নেই। এমন ফ্যাল ফ্যাল করে চায় আর ভ্যাল্ ভ্যাল্ করে হাসে আর হইচই শুরু করে যে উচ্চ বাচ্য না করে মুখটি বুজেই কিনতে হয়। যাহা পায় তাহাই খায়—সেই দ্বিতীয় ভাগের অদ্বিতীয় গোপালের মতই তারা।

পাঁচ দশ টাকার নীচে নামবার জো কি! বেশী দামেরটাই কিনতে হয়—না কিনলে রক্ষে আছে কি? বিনিকে তারা বলে, "কি করবো বল ভাই! দাদারা কোন কাজেরই নয়। কথাই বলতে পারে না, তো বেশী দামের টিকিট কী বেচবে! এগুলো নিয়ে আমাকেই তাই বেরুতে হয়েছে। এক টাকার—দু' টাকার তাই কাটাতেই তাদের অস্থির কান্ড!" দাদাদের সম্বন্ধে তাদের খেদোক্তি খুব খাঁটী বলেই মনে হয়।

"আমার দাদা কিন্তু টিকিট কিনতে ওস্তাদ্।" বিনি বলে ওঠে ঃ "চ্যারিটি একটা হলেই হলো। প্রায় ফসকায় না"—ভ্রাতৃ-গর্বে বিনির মুখ জ্বলে ওঠে। আমি কিন্তু ভারী লজ্জিত বোধ করি।

"দাদা টিকিট কেনে, আর আমি দেখি। আরো নতুন টিকিট পাস তো, আনিস আরো। বুঝলি?"

বুঝতে তাদের দেরি হয় না, ভয়ানক রকম ঘাড় নেড়ে তারা চলে যায়। ঘরে বোন থাকা মানেই দেখচি এখন, বনে ঘর থাকা। অর্থাৎ, যথারণ্যম্ তথা গৃহম্। অতএব অরণ্যে রোদন করে লাভ কি? নিজের বোন কি নিজের ভাইয়ের দুঃখ বুঝবে?

কিন্তু ঘরে বাইরে এরকম আক্রমণ কাঁহাতক সওয়া যায়? বহুৎ ভেবে চিন্তে ঘরোয়া বিভীষণতা থেকে বাঁচবার জন্য একটা ফিকির বার করি অবশেষে! আর কিছু না, বিনির বন্ধুদের অভ্যুদয়ের সময় দুর্যোগের মুখে বাড়িতে না থাকা। সাধারণতঃ বিকেলের দিকটায়, কিংবা কলেজের ছুটিছাটা থাকলেই ওরা আসে—টিকিট কিংবা বিনা টিকিটেই এসে পড়ে—সেই ফাঁকটায় আমি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরি। ঘুরে ঘুরে মরি। নেহাৎ অক্ষম হলে চিল কোঠায় গিয়ে লুকিয়ে থাকি—বিনিরও অজান্তে।

কিন্তু রাস্তায় বেরিয়েই কি নিস্তার আছে? কোলকাতার পথ ঘাট ভূগোলের গোলমালের সঙ্গে সংগতি রেখে এমন অদ্ভুতভাবে তৈরী যে একবার পা বাড়িয়েচ কি যত চেনা শোনা

লোকদের সঙ্গে দেখা হতে শুরু হয়েচে। এবং অচেনা ও অল্পচেনারাও খুব কসুর করচে না তা বলাই বাহুল্য! যাকে তোমার খুব জরুরী দরকার এবং যাকে আদপেই কোন প্রয়োজন নেই, তাদের দেখা পেতে হলে কোলকাতার পথে বারেক বেরুলেই হোল! এমন কি যখন তাদের কারুর দেখা না পাওয়াটাই বেশী বাঞ্ছনীয় তখনো। সকলের মিলনের পক্ষে সুপ্রশস্ত চলতি বৈঠকখানার সমতুল্য, কোলকাতার পথের সমকক্ষ পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় কিছু আছে বলে আমি জানি না!

সত্যি, অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই তুমি দেখতে পাবে, যাদের এককালে চিনতে—এখন প্রায় ভুলে বসেচ, যারা হয়তো কবে তোমার ক্লাস-মেট ছিল, তারপর বহুদিনের ছাড়াছাড়ি ; যাদের সঙ্গে সুদূর বিদেশে পরিচয়, প্রবাসের বাসি আলাপ ; যারা তোমার এক জেলার কিংবা যাদের সঙ্গে এক সময়ে এক জেলেই কাটিয়েছিলে,—অথবা যাদের চেনই না, কোথায় একদা এক মিনিটের বাক্য বিনিময়—এমন কি বাড়ি চড়াও হয়ে হাঁকডাক করেও যাদের কখনো পাত্তা পাওয়া যায় না—দেখতে পাবে, তাদের সবার সঙ্গে একে একে সাক্ষাৎ ঘটে যাচ্ছে।

এবং—এবং প্রায় সবার হাতেই কোনো না কোনো একটা চ্যারিটির টিকিট!

অগত্যা, কি আর করি, রেগে মেগে একটা ছাপাখানাতে গিয়েই হাজির হ'লাম। নিজেই শ'খানেক টিকিট ছাপাব। ছাপিয়ে নেব নিজের জন্যেই। জানা গেল একশ'খানা ছাপাতে যা খরচা তিনশ'খানা ছাপাতেও তাই—তখন বেশী বেশী ছাপানোই সুবিধে। অতএব পাঁচ টাকা দামের কমলা রঙের ছাপালাম একশ', দু'টাকিয়া লাল রঙের শ'খানেক, বাকীটা একটাকানে বাদামী। আরো দামী আর ছাপলুম না। মেরেকেটে পাঁচটাকাতক্ হয়তো কাটাতে পারবো, বেশী দামের ছেপে কি হবে? তা ছাড়া দশটাকার টিকিট কেবল বিনিরাই বেচতে পারে। আর আমি—আমি তো আর বিনি নই!

তিনশ' টিকিট তিনখানা বইয়ে বাঁধিয়ে চমৎকার বানিয়ে বার করে দিলে তারা, সেই ছাপাখানাওয়ালারা। রঙ বেরঙা টিকিটগুলোর দিকে তাকাই, আর পুলকে গুমরে গুমরে উঠি! পাতায় পাতায় ঝকঝকে হরফে জ্বলজ্বল করছে এচ্· আর· কে আর-এর সাহায্যকল্পে বিখ্যাত জাতিস্মর বালক রামখেলন তবলা বাজাইবেন এবং ধ্রুপদ গাহিবেন। স্টার থিয়েটার—আগামী শনিবার।

বাস, আর আমায় পায় কে! রাস্তায় বন্ধু-বান্ধব দেখলেই পাকড়াও করি, যে এককালে টিকিট গছিয়ে গেছে তাকেও, এবং যে কখনো সে দুষ্কর্ম করেনি তাকেও—কাউকেই রেহাই দিই না। এবং যে পুনরায় নতুন টিকিট গছাতে এসেছে তার বেলাতো কথাই নেই!

"কিনবো বই কি ভাই! টিকিট না কিনলে হয়!" দেখবামাত্রই বলতে শুরু করি : "চ্যারিটির ব্যাপার—কিনতে হবে বই কি! কখানা দেবে বল তো? কত দামের দিতে চাও? তার বদলে এচ্ আর কে আর এর—এই টিকিটগুলো দেবো তোমায়—এই বেচেই টাকাটা তুলে নিয়ো, কেমন?"

বলতে না বলতে মলয় বাগনময় দৌড়তে লাগল চার পা তুলে—লেজের জয়ধ্বজা উড়িয়ে—

জয় মা কালী ! মাকলদের বলি দিচ্ছি মা কিছু মনে করিসনে।

হাসির ফোয়ারা

শোনা মাত্রই বন্ধুরা পেছোতে থাকেন ঃ "এই বলে বিক্রি করে উঠতে পারছিনে! এরও পরে আবার?" আঁৎকে ওঠেন তাঁরা, আঁতে গিয়ে ঘা লাগে যেন তাদের।

"ক্ষতি কি? একই কথা তো। টিকিট নিয়ে টাকা দিতুম, তার বদলে এই টিকিটগুলোই দিলুম না হয়। ঠিক তত দামের তত খানাই দেবো—বেশী দিচ্ছি না তো। ভড়কাচ্ছ কেন? খুব বেচতে পারবে একখানা!"

"না ভাই, পেরে উঠবো না ভাই!" কাঁদো কাঁদো হয়ে পড়ে তারা ঃ "যা কাছে রয়েছে তার ধাক্কাই সামলাতে পারছি নে!"

"কী যে বলো! তোমরা আবার পারবে না? তোমরা না পারো কি! তোমাদের যদি আরও থাকে তাহলে এ তো সেই বোঝার ওপর শাকের আঁটি! নাও কত দামের দেব বলো! দু'টাকা—এক টাকা, না পাঁচ টাকার?"

সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুদের উদ্দীপনা কমতে থাকে। দেখতে না দেখতে কে যে কোন ফাঁকে কোথায় সরে পড়ে টেরই পাওয়া যায় না। কিন্তু আমিও সহজ পাত্র নই। আরো সব বন্ধুদের বাড়ি গিয়ে চড়াও হই। ফলাও করে টিকিট বেচতে লেগে যাই। কিন্তু আশ্চর্য, দেখি যে, একাদিক্রমে বন্ধুদের সবাই বীতস্পৃহ, সম্পূর্ণ অপারগ, টিকিট কেনা সবার পক্ষেই সুদূর-পরাহত। কারো বাড়িতে অসুখ, কারু বা ছেলে-মেয়ে হেমেছে—হামাগুড়ি নয়, হামের গুড়ি দেখা দিয়েছে—কারো অন্য কোথায় ঠিক সেইদিনই নেমন্তন্ন, কেউ বা ছোট ছেলেপিলেদের থিয়েটারে নামানোর ঘোরতর বিরোধী। কোথাও বা রামখেলন বলেই যত আপত্তি, বাঙালী বেহারী সমস্যা এসে পড়ে এক নিশ্বাসে—কারো ধ্রুপদ গানে আসক্তি নেই, বরং ভয়ই রয়েছে দস্তুরমতো; কোন বন্ধুর তো তবলার বোল শুনলেই, তবলায় নয়, তার নিজের মাথাতেই যেন চাঁটি পড়ে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

একজন তো স্পষ্টই বলে বসল ঃ "ওসব জন্মান্তরবাদে আমার বিশ্বাস নেই। জাতিস্মর, না, বজ্জাতিস্মর।" আর একজন বল্লেন ঃ "এচ আর কে আর-এর উদ্দেশ্যের সঙ্গে আমার একদম কোন সহানুভূতি নেই। ওদের আমি সাহায্য করতে একেবারে অক্ষম।"

"এচ আর কে আর-এর উদ্দেশ্যের কিছু জানো তুমি?" আমি জিজ্ঞেস করি, বেশ বিস্মিত হয়েই বলতে কি!

"কে আর না জানে! সব্বাই জানে ওদের ব্যাপার! তুমিই কি আর জানো না নাকি? তুমিই বলো না?"

তা বটে! আমার তো অজানা থাকবার নয়—আমিই যখন টিকিট হস্তে বেরিয়েছি। আমাকেই বলতে হয় ঃ "না ভাই, তোমার ধারণা ভুল। ওদের উদ্দেশ্য মহৎ। য়্যাপেণ্ডিসাইটিস জানোতো? সাংঘাতিক ব্যায়রাম! যেখান থেকে আদ্যিকালে ল্যাজ বেরুত, যখন আমরা বাঁদর ছিলাম বুঝলে? এখন আর বেরয় না; না বেরুলেও ঐ ল্যাজ গজানোর জায়গায় কি রকমের

● বিনির এক কাণ্ড।

একটা কী যেন হয়ে যায়—যা হলে মানুষ আর বাঁচে না।...তাই সারানোর মৎলবেই এই সমিতিটা খোলা হয়েছে বুঝেচ? একটা নতুন পদ্ধতির চিকিৎসা কেন্দ্র—"

"জানি! জানি! বেশি আর বলতে হবে না। কে না জানে! কিন্তু ওসব ব্যামো আমার হোলে তো!"

এরপর আর কথা চলে না। মুখ না চালিয়ে পা-ই চালাতে হয়। অবিক্রীত বাঁধানো টিকিটের খাতা বগলে অম্লানবদনে বাড়িতে ফিরে আসি।

শেষটায় আমিও যে টিকিট বেচার দলে ভিড়ে গেছি, ক্রমে ক্রমে বন্ধুরা জেনে গেল সবাই। তারপর থেকেই বেচারাদের আর পাত্তা পাওয়া যায় না। কোথায় যে তারা উধাও হলো—কোথাও গিয়ে গুম হয়ে রইল কি না কে জানে! আর আমার বাড়ি বয়েও আসে না, তাদের বাড়ি গিয়েও সাড়া মেলে না আদপে; পথে ঘাটে দৈবাৎ দেখা হয়ে গেলেও দাঁড়ায় না কেউ একদণ্ড; হাঁ না করতেই পা বাড়ায়—হোলো কি বন্ধুদের? টিকিটিও দেখা যায় না, টিকিটও নয়। এমন কি বিনির বন্ধুরাও ক্রমশঃ বিরল হয়ে এলো। আমার টেবিলের ওপর টিকিটের আধিপত্য দেখেই কিনা কে জানে! আমিও হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছি।

এক হপ্তাও কাটেনি, ছাপাখানার সৌজন্যে—এচ্ আর কে আর-এর কৃপায় এবং অলোক-বিশ্রুত রামখেলনের রামলীলার দৌলতে, ক'দিনের মধ্যেই আমার জীবনে যেন মিরাকল্ ঘটে গেল।

এ কয়দিন প্রাণান্ত চেষ্টায় একখানা টিকিটও বেচতে পারিনি, আনন্দেই আছি। এ সপ্তাহে, বোধহয় জীবনে এই প্রথম, পকেটটাও একটু যেন ভার ভার ঠেকচে—টাকাকড়ির বাড়াবাড়ি দেখা যাচ্ছে যৎকিঞ্চিৎ। অতএব শুক্রবার সারাটা দিন টো টো করে ঘুরলাম—সিনেমায় সিনেমায়—তিনটার, ছ'টার, ন'টার শোয়ে—পকেট হালকা করতে লাগলাম উঠে পড়ে। বারোটা বাজিয়ে বাড়ি ফিরলাম—সোজা নিজের বিছানায়।

পরের সুপ্রভাতে, শনিবার সকালে, ঘুম ভেঙে টেবিলের দিকটায় তাকাতেই তো আমার চক্ষু স্থির! বাঁধানো টিকিটের খাতাটা সেখানে নেই! য়্যাঁ, ওখানেই যে টিকিটগুলো ছিল, গেল কোথায়? তৎক্ষণাৎ হাঁকডাক লাগিয়ে দিই: "কে নিলে আমার টিকিট? বিনি, বিনি, এই বিনি!" চোটপাট লাগিয়ে দিই তৎক্ষণাৎ!

কেউ টেনেটুনে ফেলে দিলে না তো? পাড়ার ছেলেপিলেদের কেউ? কী হাঙ্গাম বলো দেখি? ওগুলি যে ওখানেই থাকবে—ঐ টেবিলেই—মৌরসী পাট্টার মত—মহাসমারোহে চিরদিন ধরেই বিরাজ করবে। ওরা গেছে কি আমিও গেছি! কী সর্বনাশ!

গর্বিত পদক্ষেপে বিনির প্রবেশ হয়: "কি হয়েছে কি? এই সাত সকালে এমন শোরগোল লাগিয়েছ কেন?"

"আমার টিকিটগুলো সব গেল কোথায়? ওগুলোকে দেখছিনা যে! কে নিলে?"

"কে আবার নেবে? আমি। আমিই বেচে দিয়েছি।"

হাসির ফোয়ারা

"বেচে দিয়েছিস! তুই!" বিশ্বাস করতে আমার কষ্ট হয়—"বলিস কী?"

"বাঃ, কাল সারাদিন ধরে তো ঐ করলাম কেবল!" বিনি বলে, চোখ মুখ ঘুরিয়েই : "সেল করলাম সবগুলো!"

"য়্যাঁ! বলিস কিরে?" বিছানার উপরেই বসে পড়ি।

"বাঃ, আজ শনিবার ওদের চ্যারিটি, অথচ দেখলাম, একখানাও তুমি বেচতে পারোনি। বুঝলাম ও তোমার কম্মো না! আমাকেই তাই বেরিয়ে পড়তে হ'ল। চ্যারিটির কাজ তো আর সাফার করতে পারে না, সবগুলো সেল করে তবেই না কাল বাড়ি ফিরেছি। কী আর করবো?"

"বেচে দিয়েছিস! তুই!"

"য়্যাঁ! বলিস কিরে?" আমি তাজ্জব হয়ে যাই : "সবগুলোই?"

"ও আর শক্ত কি এমন! আমার কাছে ওতো কিছুই না—জলবৎ তরলং। যার কাছে নিয়ে যাই সেই কেনে! হাসি মুখেই কেনে। অম্লানবদনেই নেয়! দশ টাকা দামের থাকলেও কেটে যেতো। তাও খুঁজছিল অনেকে। আসল কথা বিক্রি করার কায়দা জানা চাই।"

"তা, কাদের কাদের বেচলি?" অবাক হয়ে শুধাই।

"প্রথমে কলেজে, তারপর গেলাম কর্পোরেশনে—কাউন্সিলর, মেয়র, অফিসার—কাউকেই বাদ দিই নি। তারপর খবরের কাগজের অফিসে ঢুঁ মারলাম, বাদবাকি সব সেখানেই খতম! এডিটর, সাব্ এডিটর, প্রুফরীডার, কম্পোজিটর, প্রেসম্যান পর্যন্ত সক্কলে কিনলে! তিনশ' টিকিট কাটাতে আর কতক্ষণ!"

"তা বটে, কতক্ষণ আর!" দম নিয়ে বলি : "কিন্তু কিনলো তারা সব্বাই? একটুও

● বিনির এক কাণ্ড!

কাঁচুমাচু না করেই? মানে—একেবারে অম্লানবদনে? মুখ চুন না করে—টুঁ শব্দটি পর্যন্ত না করেই কিনল?”

“হ্যাঁ, ঠিক তুমি যেমন আমার বন্ধুনীদের কাছ থেকে কিনে থাকো!” বিনির দুর্বিনীত জবাব ঃ “কেন, কিনবে না কেন? তুমিই কেবল কিনতে জানো নাকি?”

“না, না, তা বলচি কি—তবে কিনা বাচ্চা রামখেলনের তবলা শুনতে রাজি হলো তারা? আপত্তি করল না কেউ?”

“কেউ কেউ বলছিল বটে, তবলার বদলে গানের জলসা হলেই ভালো হতো, কিন্তু আমি বুঝিয়ে দিলুম, রামখেলন তো আসল নয়, এচ আর কে আর-এর বেনিফিটের জন্যই চ্যারিটিটা! অমনি তারা সমঝে গেল।”

“ও! এচ আর কে আর! অ বটে।”

“ভালো কথা, এচ আর কে আর-টা কী দাদা?”

“ও হচ্ছে একটা জাপানী সিসটেমে রোগ সারানোর কায়দা—যার নাম কিনা হারিকিরি। হারিকিরির নাম শুনেছিস তো? সংক্ষেপে এচ আর কে আর।”

“কোন্ রোগ? কী করে সারায় শুনি তো?”

“সব রোগ সারে। একেবারে ভবব্যাধি মোচন করে তাবৎ রোগ সারিয়ে দেয়! যাকে বলে ভুঁড়ি ফাঁসিয়ে সারানো!”

“হা-রি-কি-রি! অদ্ভুত তো! তা তোমার ঐ ড্রয়ারের মধ্যে রয়েছে হারিকিরির সমস্ত টাকা। আটশোর কিছু কম—গোটা কয়েক ট্যাক্সি ভাড়ায় গেছে, নইলে সব বিনি পয়সায়।” কবুল করলে বিনি।

ড্রয়ার খুলে দেখলাম মিছে নয়। রুমালে জড়ানো নোটে টাকায়, আধুলিতে, সিকিতে এক গাদা। এতখানি বিপুল ঐশ্বর্য একজায়গায় একত্র হয়ে এহেন অবহেলায় পড়ে থাকতে দেখবো,—এ জীবনে এমন দুঃস্বপ্ন আমার ছিল!

“হারিকিরি ওয়ালাদের টাকাটা দিয়ে এসো গে দাদা। আজই শনিবার—দেরি আর কই—ক'ঘণ্টাই বা আছে? হাঁ, জানো দাদা, একজন সাহেবকেও খানকতক টিকিট কিনিয়েছি। সাহেব হলো তো কি, গছিয়ে দিলাম, ছাড়বো কেন?”

“সাহেব! সাহেব আবার পেলি কোথায় রে?” এবার আমি বিস্ময়ের মগডালে উঠেচি।

“মেয়রের চেম্বারেই ছিলেন। যে সে সাহেব নয়, জাঁদরেল একজন, কোলকাতা পুলিসের ওপরতলার লোক!” বিনির মুখে বিজয়িনীর হাসি। “পুলিস সাহেবই হবেন হয়ত!”

“তাহলে, তাহলে—হারিকিরি ঠিকই হয়েছে—”

পরমুহূর্তে তৃণহীন অগাধ জলে তলিয়ে যেতে যেতে স্খলিত কণ্ঠে আমি বলি, “তাহলে তো আর দেরি করা চলে না। বেরিয়ে পড়তে হয় এক্ষুণি—বাস্তবিক!”

হাসির ফোয়ারা

শনিবারের সকালেই যেন শনিবারের সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে—চারিদিক অন্ধকার দেখি। কোথায় বা রামখেলন আর কোথায় বা আমি! আর বিলম্ব নয়, এখুনিই কেটে পড়তে হবে এই শহর থেকে, এর ত্রিসীমানা থেকে,—বিপ্লব বাধবার আগেই, শোরগোল না জাগতেই সটকে পড়তে হবে কোথাও এক্ষুণি! পুজোর কোলকাতা পিছনে ফেলে রেখে দিল্লী কিংবা ডিব্রুগড়, রাঁচী কিংবা করাচী, গৌহাটি কি গোঁদলপাড়া, কোথাও গিয়ে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে থাকতে হবে—কদ্দিন কে জানে! অন্ততঃ যদ্দিন না ঝড়টা কেটে যায়—এবং পুলিসের গ্রেপ্তারী পরোয়ানার পরোয়া না থাকে। ফেরারী হয়ে পালিয়ে পালিয়ে পায়ে কড়া পড়ে যাবে আমার—হাতকড়ার হাত থেকে বাঁচতে!

হারিকিরির কিরি পর্যন্ত না এগুতে পারি, অন্ততঃ 'হারি' আর না করলেই নয়।

বিনির হাসির বিনিময়ে আমি ঠিক হাসতে পারি না।

বাড়ি থেকে না বেরুতেই বেরুবাড়ি!

দমদম থেকে প্লেনে চেপে দেখতে না দেখতেই একেবারে পাকিস্তান সীমান্তে এসে হাজির।

সীমানা-নির্দেশক কাঠের খুঁটি পোতার বিরাট এক কণ্ট্র্যাক্ট পেয়েছিলেন হর্ষবর্ধনরা। অরই তদ্বির তদারকে তাঁদের দুই ভাইয়ের প্লেনে চেপে এই বেরুবাড়ি আসা।

অনেক টাকার আশা! কিন্তু আশায় বুঝি ছাই পড়ে যায় শেষটায়!

বেরুবাড়িতে নামতেই খবরটা পেলেন—পাকিস্তানের পশ্চিম সীমান্তে লড়াই বেধে গিয়েছে ভারতবর্ষের সঙ্গে। ঘোরতর সংগ্রাম শুরু হয়ে গেছে সেধারটায়।

আর, এধারেও এই পুব সীমান্তেও পাকিস্তানী সাজ সাজ রব শোনা গেল। চোখেও পড়ল সঙ্গে সঙ্গে—বলতে কি!

'বুম্ বুম্—বুবুম্ বুবুম্—বোম্ বোম্!'

ঘনঘোর গর্জন হতে শুরু হোলো। ঘনঘন ঘোর গর্জন।

আর, আওয়াজের সাথে সাথেই বোমারু বিমানের কুচকাওয়াজে ছেয়ে গেল সারা আকাশ।

যেই না দেখা, যেমনি না শোনা, গোবর্ধন অমনি চিৎপটাং হয়ে পড়েছে এবং দাদাকেও ভূমিশয্যায় আহবান করেছে তৎক্ষণাৎ!

হাসির ফোয়ারা

'চটপট শুয়ে পড়ো দাদা! দেখছ কি দাঁড়িয়ে? শুয়ে না পড়লে বুমিয়ে দেবে যে! বুঝছ না?'

'বুম্—বাম্—বোম্—ব্যাম্—বিউম্!' বলতে না বলতে আকাশবাণীর মধ্যে গোবর্ধনের আমন্ত্রণপত্রের প্রতিধ্বনি শোনা যায়।

হর্ষবর্ধন অটল অবিচল—বড় বড় বিপদের সম্মুখে চিরদিনই তিনি তাঁর গোঁফের ন্যায় চাঞ্চল্যহীন, গোবর্ধনের কথাটা গেরাহ্যিই করেন না।

'হ্যাঁ, শুয়ে থাকবার জন্যই এখানে আসা-কিনা আমাদের! অমন কতো বুম্ বাম্ হবে, কত কী হবে, শুয়ে থাকলেই চলবে কিনা! পয়সা উপায় করা চাট্টিখানি নয় ভাই! যখন এই বেরুবাড়িতে পা দিয়েছি তখন বলতে গেলে প্রাণ হাতে করেই বেরিয়েছি, পকেটে নিয়েই বসে আছি প্রাণ—দরকার হলে এই তুচ্ছ প্রাণের বিনিময়ে পকেট ভরতি করে টাকা নিয়ে বাড়ি ফিরব—এই বেরুবাড়ির থেকেই, বুঝলি? তোর মতন শুয়ে শুয়ে ল্যাজ নাড়া আমার কম্মো না।'

'চটপট শুয়ে পড় দাদা! দেখছ কি?'

'বুবুম—বাবুম...বাবুম্ বুবুম্—বুম্বুমাবুম্—বুং।' তর্জনগর্জনের তোড়-জোড় বেড়েই চললো—আরো আরো।

'শুনলে না? শুনলে না তো? আমাকেই ভুগতে হবে শেষটায়, বুঝছি বেশ।' গোবর্ধন আক্ষেপ করতে থাকে।

খানিকক্ষণ গর্জন আর বর্ষণের পর বোমারুরা বিদায় নেয়। কিন্তু অমনি দেখতে না দেখতে কোত্থেকে আবার এক ঝাঁক গোলাগুলি এসে হাজির! কোথায় যেন ওৎ পেতে বসেছিল ওরা।

দাঁড়িয়ে উঠতে না উঠতেই গোবরা আবার চারিয়ে গেছে মাটিতে। চার হাত পা চার কোণে ছড়িয়ে দিয়ে।

'মাটি করলে! মাটালে! দাদাটাই মাটালে দেখছি!' শুয়ে শুয়ে ফোঁস ফোঁস করে সে, 'মাঠময় করে ছাড়লে তুমি!'

'কেন বকবক করছিস বলতো।' হর্ষবর্ধন ধমক লাগান।—'বকরবকর করতে ভাল্লাগে তোর?'

'আর রক্ষে নেই গো দাদা! বেশিক্ষণ আর বকতে হবে না আমায়। কী গোলাগুলির

তোড়রে বাবা! তোমার গালাগালির জোরকেও হার মানিয়ে দেয়।...আরি ভোঁয়া, দাদা, আরি ভোঁয়া।'

'ভারী যে ধোঁয়া বার করছিস, ব্যাপার কি?' উসকে ওঠেন দাদা।

'ধোঁয়া নয় দাদা, ভোঁয়া! আরি ভোঁয়া।'

'আরবি ফারসি ঝাড়ছিস আমার কাছে?' গোঁসা হয়ে যায় দাদার ঃ 'বিদ্যে ফলানো হচ্ছে?'

সে কথার কোনো জবাব না দিয়ে কাতর স্বরে গোবরা পুনরুক্তি করে ঃ 'আরি ভোঁয়া, দাদা, আরি ভোঁয়া।'

'আড়ি দিচ্ছিস আমার সঙ্গে?' গর্জন করে ওঠেন হর্ষবর্ধন ঃ 'বটে?'

'আড়ি নয় দাদা, আরি ভোঁয়া।'

'তার মানে?'

'তার মানে হচ্ছে, বিদায় নিচ্ছি তোমার কাছে। ইংরেজিতে ওর মানে হচ্ছে গুডবাই। ফরাসী ভাষায় তাই হল গিয়ে আরি ভোঁয়া। ফরাসী বলো আর ফারসিই বলো, একই কথা।'

কোন বইয়ে পড়েছিল বা কার কাছে শোনা কে জানে, মৃত্যুর মুখোমুখি শুয়েও বিদ্যে জাহির করার এই সুবর্ণ সুযোগ সে ছাড়ে না। ছাড়তে পারে না।

গোলাগুলির খচখচানিতেও যতটা হর্ষবর্ধনের মেজাজ না খিঁচড়েছিল, গোবর্ধনের পাণ্ডিত্যের খোঁচায় তার চেয়ে ঢের বেশী বিগড়ে যায়। খানিকক্ষণ গুম হয়ে থেকে, তারপর তিনিও আওড়ান ঃ 'পটাসিয়াম সাইনাইড।'

ভাষাবিজ্ঞানে, জগতের বিভিন্ন ভাষাজ্ঞানে, তিনিই বা কারু চেয়ে কম কিসে? তিনিও বলেন 'বেশ, তবে তাই হোক,—পটাসিয়াম সাইনাইড।'

'তার মানে?' এবার গোবরার অবাক হবার পালা।

'তার মানেও গুডবাই—তবে কিনা যে কোন ভাষাতেই।'

'গুড়ুম্—গুড়ুম্—গুম্। বাবুম্ বুম্!' আকাশবাণীও যেন ওঁর কথায় সায় দেয়।

'বুমিয়ে দিলে দাদা! গুমিয়ে দিলে একেবারে।' আর্তনাদ করে গোবর্ধন ঃ 'পট করে শুয়ে না পড়লে পটাসিয়াম সুইসাইড হয়ে গেলে, দেখচ কি?'

'আরে, ঘাবড়াচ্ছিস কেন রে! এর নামই তো ওয়ারবুম্।' ভাইকে তিনি বাতলান।

'ওয়ারবুম্—তার মানে?' জানতে চায় সে।

'ওয়ারবুম্ মানে ফলাও কারবার।' দাদার ব্যাখ্যা করে দেওয়া, 'ওয়ারবুম্ মানে, লোহার দাম বাড়বে, লক্কড়ের দাম বাড়বে, কাঠের দাম বাড়বে, আকাঠদের দাম বাড়বে—সব কিছুর দাম বাড়বে। টাকাকড়ির স্রেফ ছড়াছড়ি হবে, যতো পারো লুটে নাও—এই হচ্ছে ওয়ারবুম্। এতে ভয় খাবার কিসসু নেই।'

হাসির ফোয়ারা

দেখতে না দেখতে পাঁই পাঁই করে আবার আকাশ বাতাস ছেয়ে এল—বোমারু বিমানরা। আবার শুরু হল হরদম্ আর ভরদম্—বুম্ বুম্ বাবুম্ বুবুম্! বুম্ম্ বুম্! একটানা বুমুৎকার। ওয়ারবুম্ যাকে বলে।

উপরের বিমানরা উপে না যেতেই সীমান্ত পার থেকে সাঁই সাঁই করে গুলির ঝাঁক তেড়ে আসে। শনশন করে এসে কানের পাশ দিয়ে বনবন করে চলে যায়—শীস দিতে দিতে। দমদম বুলেট যত। হর্ষবর্ধন কিন্তু গ্রাহ্যই করেন না।

'ডোবালে দেখছি!' গোবর্ধন শুয়ে শুয়ে প্যাচাল পাড়ে। 'দাদাটাই ডোবালে!'

এবার ঝমাঝম করে গুলিরা আসতে থাকে—শ্রাবণের ধারার মতন এসে হানা দেয় তাদের ওপর। আরম্ভর সাথে সাথেই তাদের আড়ম্বর।

'গেছিরে বাবা! গোল্লায় গেছি।' গোবর্ধন বলে : 'আমি না গেলেও তুমি তো গিয়েছ! কয়েক ইঞ্চির জন্যে ওদের ফসকে যাচ্ছে কেবল। তোমার মাথার খুলিটা খুঁজে বার করতেই যা দেরি হচ্ছে ওদের।'

হর্ষবর্ধন তথাপি নট নড়নচড়ন। তবুও কোনো হুঁশ নেই ওঁর।

'ধুত্তোর।' বলে গোবর্ধন চটে মটে উঠে দাদাকে শুইয়ে দিতে যায়, কিন্তু তার দরকার হয় না। একটা ছুটকো গুলির ছর্রা তাঁর কানের কানকো প্রায় ছুঁয়ে যেতেই, তিনি ভায়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তৎক্ষণাৎ কাত হয়ে পড়েছেন।

'তবে তাই হোক্।' ধরাশায়ী হয়ে হর্ষবর্ধন গলা ছাড়েন : 'তুই যা বলছিস তাই করি ভাই।'

'করলে বলেই বেঁচে গেলে এ যাত্রা! নইলে পটল তুলতে হত এতক্ষণ!' গোবর্ধন বলে : 'তা পটলই বলো বা তোমার ভাষায় ওই পটলসাইডই বলো!'

'ভ্রাতঃ'! দাদার গলা গদগদ হয়ে ওঠে : 'ভ্রাতঃ গোবর্ধন! সত্যিই তুই আমায় ভালোবাসিস। আমার জন্যে প্রাণ দেওয়া তোর পক্ষে কিছু না। আমি জানি ; কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, তোর নিজের জন্যেই আমার প্রাণটা তুই বজায় রাখতে চাস।'

'চাই না ছাই!' গোবর্ধন গজগজ করে : 'কেন তুমি মলে কি আমি পিতৃহীন হবো? অনাথ হয়ে যাবো একেবারে, তুমি কি তাই ভাবো? আমার তিন কুলে কেউ আর থাকবে না?' সে গজরায়।

'না না, তা কেন? তা কি আমি বলেছি?' হর্ষবর্ধন বলেন : 'তবে তুই যে আমার ভালো মন্দ দেখছিস, এই বেরুবাড়ির প্রান্তে এসেও সেটা ভুলে যাসনি, সেটাই কি কম বড় কথারে? তোর পক্ষে এ কি কম প্রশংসনীয়?'

'ভালো মন্দ না কচু! স্থানে অস্থানে একটা গুলি এসে লাগলে কী হোতো তোমার? খেয়াল আছে তার?'

'বড় জোর মারা যেতাম, এই তো? তার বেশী তো আর কিছু নয়। তার জন্যে আমি ভাবি না, কিন্তু তুই যে এতখানি আমার জন্যে ভেবেছিস এতেই আমি মর্মান্তিক কাবু হয়ে গেছি। মর্মে মর্মে মরে আছি বলতে কি! আমি যাতে মারা না যাই তাই ভেবে ভেবেই না তুই এতটা কাহিল!'

'মারা গেলে তো বাঁচতুম!' গোবর্ধন বাধা দিয়ে বলে : 'সেই কথাই আমি ভাবছিলুম কি না! কিন্তু খুন না হয়ে জখম হতে যদি—কী দশা হতো আমার, সেটা ভেবেচ? দৈবাৎ তাই যদি হতে, তবেই তো হয়ে গেছল আমার! তাহলে তোমার ওই পাক্কা তিন মণ কাঁধে করে সাত মাইল দূরের হাসপাতালে আমাকেই বয়ে নিয়ে যেতে হত না? বাবা গো! সে কি চাট্টিখানি। তা হলেই তো গেছলাম! সুখ আর ধরত না আমার!'
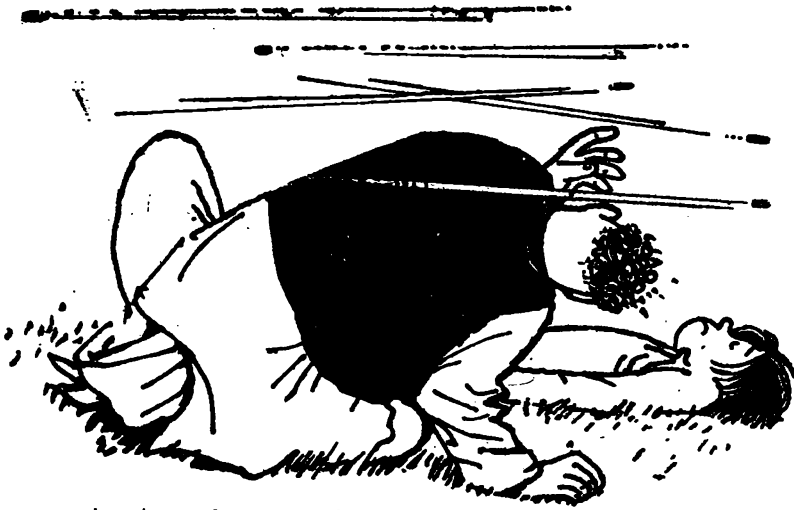
একটা ছুটকো গুলির ছর্‌রা তাঁর কানকো ছুঁয়ে যেতেই... [পৃষ্ঠা ১০৫

হর্ষবর্ধন চুপ করে থাকেন। গোবরার বক্তব্যটা হৃদয়ঙ্গম করতে তাঁর সময় লাগে। তারপরে বিশদভাবে সেটা বুঝতে পেরে তিনি গুম হয়ে যান আরো।

নিজের কলেবরের দিকে দৃকপাত করে অবশেষে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে ক্ষুণ্ণ স্বরে তিনি বলেন : 'ও রকম বইতেই হয়। যুদ্ধ তবে বলেছে কেন? ভারী ভারী যুদ্ধের বোঝা কি কম নাকি?'

তাঁর মুখ থেকে কেবল এই কটি কথা বেরিয়ে আসে। আর্তনাদের সুরেই বার হয়।

'যুদ্ধ তো ভারী!' জবাব দেয় গোবর্ধন : 'তুমি নিজে কেমন ভারী সেটা তো দেখ না। খেয়ে না খেয়ে যা একখানা লাশ বানিয়ে তুলেছ নিজেকে। বলতে কি, তুমিই এই যুদ্ধটাকে আরো ভারী করে তুলেছ দাদা!'

গোবর্ধনও একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে দেয়।

'তাহলে তুই যখন হালকা থাকতে চাস—আমার বোঝা বইতে যখন এতটাই তুই নারাজ—বেশ—তাহলে—' হর্ষবর্ধন একটু থামেন।

অন্তিমস্বরে চূড়ান্ত ব্যঞ্জনা দিতেই তিনি থামেন, তারপর অতি করুণ কণ্ঠে তাঁর শেষ বিদায়বাণী উচ্চারিত হয় :

'তবে তাই হোক্ ভাই! তাহলে পটাসিয়াম সাইনাইড—চিরদিনের মতই ওই পটাসিয়াম সাইনাইড!' বলে মাটির উপরেই মুখ ফিরিয়ে তিনি পাশ ফিরে শোন।

রিক্সায় কোনো রিস্ক নেই!

পাড়ায় গদাইয়ের গাড়ি চেপে একবার ভারী বিপাকে পড়েছিলাম, এবার ভোঁদাইয়ের মোটরে চড়ে এতদিন পরে আগেকার সেই গদাঘাতের দুঃখও ভুলতে হল!

বাস্তবিক, আমার বিবেচনায় রিক্সাই ভালো সবচেয়ে। এমনকি পা-গাড়িও তেমন নিরাপদ নয়। চালিয়ে গেলে কী হয় জানিনে, চালাইনি কখনো, কিন্তু আর কেউ যদি সাইকেল চালিয়ে আসছে দেখি তক্ষুণি আমি সাত হাত পালিয়ে যাই। রাস্তার ধার ঘেঁষে গেলেই মোটর-চাপা পড়বার ভয় নেই, কিন্তু সাইকেলের বেলায় যে ধারেই তুমি যাও না, তোমার ঘাড়ে এসে চাপবেই। ফুটপাথে উঠেও নিস্তার নেই।

তাই বলছিলাম, রিক্সাই আমাদের ভালো। কোনো রিস্‌ক নেই একেবারেই। না সওয়ারির, না পথচারির।

হাসির ফোয়ারা

কী কাজে শহরতলিতে যেতে হয়েছিল। ট্রামে বাসে ওঠা বেজায় দায়, পাদানিতেও পা দেয়া যায় না। হাঁটতে হাঁটতে যদি কিছুটা এগিয়ে কোন ট্রাম বাস একটু খালি পাওয়া যায় সেই ভরসায় এগুচ্ছি। আশায় আশায় যদ্দুর এগিয়ে আসা যায়।

হঠাৎ দেখি, ভোঁদা তার মোটর নিয়ে ভোঁ ভোঁ করে আসছে। আমাকে দেখে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে—'এসো আমার গাড়িতে। পৌঁছে দিচ্ছি তোমায়।' বলল সে।

'ঠেলতে হবে না ত ফের?' উঠতে গিয়েও থমকে দাঁড়ালাম।

'কী বললে?'

'গাড়ি চড়ার ভারী ঠেলা ভাই!' গদাইজনিত আমার পূর্ব অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করলাম। সে গাড়ি একবার থামলে আর চলবার নামটি করে না। থেমে গেলেই নেমে গিয়ে ঠেলতে হয় আবার। গদাই আর আমি দুজনে মিলে সেই গাড়ি চালিয়ে—গদাই সামনের স্টীয়ারীং হুইলে আর আমি গাড়ির পেছন থেকে—সাত দিন আমায় কাত হয়ে থাকতে হয়েছিল বিছানায়। কাতর কণ্ঠে জানালাম।

'তোমার গাড়িও সেইরকম—নেমে নেমে—মাঝে মাঝে ঠেলতে হবে না ত?'

'কী যে বলো তুমি! একি গদাইয়ের লঝ্‌ঝর গাড়ি পেয়েছ? আনকোরা নতুন মডেলের গাড়ি—দেখচ না?'

কিন্তু গাড়ি ঠেলার চেয়েও যে ভারী ঠ্যালা আছে আরো—সেই অভিজ্ঞতা হল আমার সেদিন! কেমন করে যেন আঁচ পাচ্ছিলাম সেই অবশ্যম্ভাবী অভিজ্ঞতার, আমার অবচেতন বিজ্ঞতার মধ্যেই হয়ত বা। তার আভাসেই বলতে গেলাম কিনা কে জানে—'কিন্তু তার দরকার কি এমন? আর একটুখানি গেলেই তো শহরতলির স্টেশনটা। সেখান থেকে ট্রেনে চেপে শেয়ালদা, শেয়ালদার টার্মিনাসে ট্রাম ধরে কলেজ স্ট্রীট মার্কেট—আমার ভাগনে ভাগনির বইয়ের দোকান হয়ে সেখান থেকে চোরবাগান আর কতটুকু?' বলতে গেলাম আমি।

'তা হলেও বেশ দেরি হবে তোমার—' বাধা দিয়ে বলল ভোঁদা—'এধারের ট্রেন সব আধঘণ্টা পর পর আসে। ভিড়ও হয় নেহাত কম না। ধরতে পারলেও, চড়তে পারবে কি না সেই সমস্যা, আর তা পারলেও, বাড়ি পৌঁছতে অন্ততঃ তিরিশ মিনিট লেট তোমার হবেই—আমি তোমাকে তিন মিনিটে পৌঁছে দিতাম।'

সেই তিরিশ মিনিটের লেট বাঁচাতে তিরিশ বছর আগেই বৈতরণীর তীরে পৌঁছচ্ছিলাম গিয়ে!

'গাড়িটার স্পীড একটু কমাও ভাই!' যেতে যেতেই আমি বলি—'বড্‌ডো জোরে চালাচ্ছো মনে হচ্ছে।'

'মোটেই না। ভালো গাড়ি এমনি স্পীডেই চলে। এই রকমই স্পীড নেয়।' স্টীয়ারিং

● রিক্সায় কোনো রিস্ক নেই!

হুইলে এক হাত রেখে, আর এক্সিলেটারে তার পা রেখে, আরেক হাতে নিজের গোঁফে চাড়া দিতে দিতে নির্ভাবনায় সে জানায়।

আমি কিন্তু দুর্ভাবনায় মরি। একটা পথ-দুর্ঘটনা না বাধিয়ে বসে আচমকা!

'ভারী ভয় করছে কিন্তু আমার। যদি একটা কিছু...'

এক ইঞ্চির চেয়ে কিঞ্চিৎ বেশী ব্যবধানে একটা সাইকেলের পাশ কাটিয়ে সে যায়—'জানো গাড়িকে সব সময় টিপটপ কন্‌ডিশনে রাখতে হয় তা হলেই আর টপ করে কোনো দুর্ঘটনা ঘটে না। গাড়ির মেকানিজম যদি গাড়ির মালিকের জানা থাকে আর সর্বদাই যদি সে নিজের গাড়ির খবর রাখে আর নিজেই চালায়...'

'তা বটে...!' উল্কার মত একটা লরির পাশ দিয়ে যাবার কালে সভয়ে আমি চোখ বুজি, আমার কথা আর নিশ্বাস দুই-ই বন্ধ হয়ে আসে।

'এই লরিগুলোই তো অ্যাক্‌সিডেন্ট বাধায়। বুঝেচ? কি করে চালাতে হয় জানে না একদম...' ভোঁদা ভারি ব্যাজার হয়ে ওঠে লরিটার ওপর।

'হ্যাঁ, কী বলছিলাম। এর কলকব্জা সব আমার নখদর্পণে। এর কোণার বোল্‌টুটিও আমার অজানা নয়। আমার গাড়ি আমি নিজেই সারি। কোনো কারখানায় সারাতে পাঠাই না। গাড়ির সব পার্টস নষ্ট করে দেয় তারাই।...'

পর পর দুটো পেট্রোল ট্যাঙ্কের রগ ঘেঁষে চলে যায় গাড়িটা। না, ভোঁদার আমন্ত্রণ না নিলেই বুঝি ভালো করতাম্ আজ!

'গাড়ির আসল জিনিস হচ্ছে তার ব্রেক্। ব্রেক্ যদি তোমার ঠিক থাকে, দুনিয়ার কিছুকে তোমার তোয়াক্কা নেই। বুঝলে?'

'ব্রেক্ তোমার ঠিক আছে তো?' কম্পিত কণ্ঠে জানতে চাই। আর ওর স্পীডো-মীটারে পঁয়ষট্টি মাইলের স্পীড উঠেছে দেখতে পাই।

পঁয়ষট্টি! পঁয়ষট্টি! পঁয়ষট্টি!! আমার মনে অনুরণিত হতে থাকে।

'ব্রেক্ আমার পারফেক্‌ট বলেই এত জোরে আমি চালাতে পারি।' ওর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে ওঠে।

'তোমার ব্রেক্ ভালো জেনে তবু একটু আশ্বাস পেলাম এখন।' আমি বললাম।

'ভালো বলে ভালো! আমি নিজে হপ্তায় দুবার করে অ্যাডজাস্ট করি ব্রেক্‌টা। ব্রেকের কোনো গলদ আমি বরদাস্ত করতে পারি না। ব্রেকই তো গাড়ির প্রাণ হে!'

'আর সোয়ারীদেরও বই কি!' আমি সায় দিই ওর কথায়—'তা হলেও একটু আস্তে চালালে কি ভালো হত না? ক্ষতি কি ছিল?'

'তাহলে তো গোরুর গাড়ি কি রিক্সাতেই যেতে পারতে!...এই দ্যাখো সত্তরে তুলেছি স্পীড। চেয়ে দ্যাখো।' সে দেখায়—'ঐ ব্রেকের ভরসাতেই।'

● রিক্সায় কোনো রিস্ক নেই।

আমি সভয়ে চোখ তুলে তাকাই। দেখি সত্তর—শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে—সত্যিই!

'তোমার ব্রেক ঠিক আছে তো? জানো তো ঠিক?' আমি জিজ্ঞেস করি আবার—'গাড়ি বার করার আগে পরীক্ষা করেছিলে আজ?'

'ঘাবড়াচ্ছো কেন হে? আমার ব্রেকের সম্পর্কে তোমার কোনো সন্দেহ আছে নাকি? দাঁড়াও তাহলে, এক্ষুণি তোমার সন্দেহ মোচন করি। চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন হয়ে যাক...এই
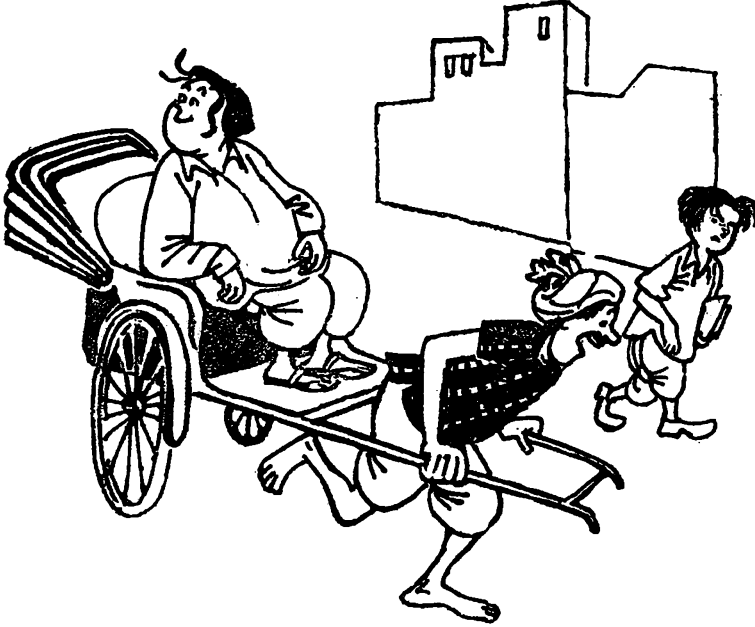
পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, থামিয়ে চেপে বসেছি তৎক্ষণাৎ। [পৃঃ ১১২

দারুণ স্পীডের মাথাতেই আমি ব্রেক্ কষবো, ঠিক এখান থেকে একশ' গজ দূরে—দরজার পাল্লাটা ধরে শক্ত হয়ে বসো...রেডি!...'

আর ঠিক একশ' গজ দূরেই সেই কাণ্ডটা ঘটল! বরাত জোর যে তিনজনেই আমরা রক্ষা পেলাম। একআধটু আঁচড়ের ওপর দিয়েই বাঁচন হোলো সে যাত্রায়।

তিনজন? মানে, আমি ভোঁদা আর পেছনের খালি ট্যাক্সির ড্রাইভারটা।

দুখানা গাড়ির ধ্বংসাবশেষের ভেতর থেকে যখন কোন রকমে খাড়া হয়ে উঠেছি তখন

ওদের দুজনের মধ্যে দারুণ তর্ক বেধেছে। ভোঁদা সেই ট্যাক্সিড্রাইভারকে বোঝাতে চেষ্টা করছে যে তার গাড়ির ব্রেক্‌টাও যদি ওর নিজের ব্রেকের মতই টিপটপ অবস্থায় থাকত তাহলে অমন টপ করে এই দুর্ঘটনা ঘটতে পারত না। লোকটা কিন্তু মানতে চাইছে না কিছুতেই। দারুণ ঝগড়া বেধে গেছে দুজনের।

মোড়ের পুলিস সার্জেণ্ট এদিকেই এগিয়ে আসছে দেখতে পেলাম। আর এমনি সময়েই ...এই দুর্বিপাকে...

ঠুন ঠুন ঠুন ঠুন! কানের মধ্যে যেন মধুবর্ষণ হল অকস্মাৎ।

পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, থামিয়ে চেপে বসেছি তৎক্ষণাৎ। ওদের দুজনকে সেই সতর্ক অবস্থায় ফেলে রেখেই...

না, রিক্সায় কোনো রিস্‌ক্‌ নেই।

আর, পাহারোলার পাল্লায় পড়ার মতন রিসক্‌ আর হয় না! অতএব অকুস্থল থেকে যঃ পলায়তি...!

চোরের ওপরে যায় যারা!

'হায় হায়! চোরের পাল্লায় পড়ে বেঘোরে মরতে হলো শেষটায়।'

হর্ষবর্ধনকে হায় হায় করতে শোনা যায় একদিন।

'বেঘোরে পড়েছি বলতে পারো দাদা, কিন্তু মারা পড়িনি এখনো আমরা।' দাদার ভুল শোধরায় গোবরা।

'মারা পড়তে কতোক্ষণ? যা সব বিটকেল লোকদের খপ্পরে পড়া গেছে! কলকাতার থেকে কোথায় কদ্দূরে এনে ফেলেছে তাই তো টের পাচ্ছিনে।'

'কোন্ মুলুকে কে জানে—মগের মুলুকেই কিনা কে বলবে!'

'বাইরে বেরিয়ে ঘুরে ফিরে একটু জেনে আসবো যে তারও কোনো জো নেই।'

'বাইরে বেরুলেই বা তুমি তা টের পাচ্ছো কি করে দাদা? জায়গার নাম তো আর মাটির গায় লেখা নেইকো।'

'মানুষের মুখে লেখা রয়েছে তো।'

'মানুষের মুখে!' গোবরার বিস্ময় ধরে না। 'মানুষের মুখে আবার মুল্লুকের নাম লেখা থাকে নাকি?'

'উল্লুকের মতো কথা কোসনে। মুখে না হলেও মুখের ভাষায় বোঝা যায় না কি?' দাদা জানায়, 'লোকেরা সব বাংলা বলছে, না আসামী বলছে, হিন্দি বলছে না উড়ে ভাষায় কইছে তাই শুনেই তো বুঝতে পারবো কোথায় এসে পড়েছি! পূর্ণিয়ায় না কটকে, ছাপরায় না আরা জিলায়, বোম্বায়ে না মাদ্রাজে......না, আর কোনো বেয়াড়া জায়গায়।'

'বোম্বাই নয়, আমি হলপ করে বলতে পারি।' বলে গোবরা, 'বোম্বাই কলকাতার থেকে হাজার মাইল দূরে। এরা তো আমাদের মোটে একশো মাইল দূরে এনেছে কেবল। আর ধরো যদি মাদ্রাজই হয়...তাহলে...'

'তাহলে?'

'তাহলে তো তুমি ধরতেই পারবে না। সেখানকার লোকেরা সব তামিল ভাষায় কথা বলে। বুঝবে কি করে? আর তাছাড়া আরো মুশকিল...' গোবরা সমস্যাটি ক্রমশঃ প্রকট করে, 'সেখানে গেলে না খেয়েই মারা পড়তে হবে আমাদের।'

'কেন, মারা পড়বো কেন? সেখানে কি বাজার হাট নেই নাকি? দোকানপাট নেই কি সেখানে? টাকা তো আছে। খাবার কিনে খাবো আমরা।'

'খেতে চাইলেই বা তারা খেতে দেবে কি করে? বুঝলে তো দেবে। তামিলনাদের লোক তোমার নাদ বুঝতে না পারলে—তামিল ভাষায় কথা না কইলে তোমার কোনো হুকুমই তামিল হবে না সেখানে।'

'ইশারায় বললেও কি সাড়া মিলবে না তুই বলছিস?' দাদা জানতে চান।

এমন সময় বাড়ির ছাতের থেকে সিঁড়ি বেয়ে সুর ভাঁজতে ভাঁজতে নেমে এলেন একজন। বাঁটকুল নয়, বিটকেল নয়, বিলকুল ওদের অচেনা।

'কে মশাই আপনি? গুনগুন করতে করতে কোথা থেকে এলেন আবার?' হতবাক হর্ষবর্ধনের কথা ফোটে।

'মশাও অবিশ্যি গুনগুন করে আর যত্রতত্র থেকে আসতে পারে বটে...' গোবরার অনুযোগ : 'কিন্তু জলজ্যান্ত মানুষের পক্ষে এই আকাশ ফুঁড়ে আসা—?'

'তাছাড়া, ছাত থেকে এলেন যে! লোকে তো নীচের থেকেই ওপরে আসে। সদর থেকে আসে অন্দরে...।'

'ছাতে তো আপনি থাকেন না নিশ্চয়? ছাতে তো দেখিনি আপনাকে। ছাতে তো উঠেছিলাম একবার...।' গোবরা বলে—'তখন তো কই দেখিনি আপনাকে সেখানে।'

● চোরের ওপরে যায় যারা!

'থাকলে তো দেখবেন? আমি এখানকার কেউ নই মশাই!' লোকটি জানায়ঃ 'আমি এখানে এসেছি আপনাদের নিয়ে পালিয়ে যাবার জন্যে...'

'অ্যাঁ! কী বললেন? আমাদের নিয়ে পালাবেন? এরাই তো আমাদের চুরি করে নিয়ে এসেছে। আমরা অপহৃত।'

'অপহরণের ওপর আমি আবার অপহরণ করবো।' লোকটি বলেঃ 'সেই জন্যেই এসেছি আমি।'

'বুঝেছি। আপনারা অন্য এক চোরের দল।'

'না, না, চোরটোর নই আমরা ...চোর বলে গাল দেবেন না আমাদের।' সোচ্চার প্রতিবাদ তার।

'ছ্যাঁচোর নাকি তাহলে?'

ছ্যা ছ্যা করে লোকটা—'ছ্যা! ছ্যাঁচোরদের আমরা মানুষ বলেই গণ্য করি না, ওদের ওটা একটা পেশা নাকি? চুরি জোচ্চুরি কি কোনো ভদ্রলোকের কাজ মশাই? এমন অপবাদ কদাচ দেবেন না আমাদের।'

'তাহলে আপনারা?'

'আমরা চোরের ওপর দিয়ে যাই।'

'ঠিক বুঝলাম না তো...'

'বুঝবেন বুঝবেন—সময় হলেই বুঝবেন! বোঝাবার সময় নেই এখন। পরে বুঝিয়ে দেবো ভাল করে। এখন বলুন, আপনারা এখান থেকে উদ্ধার পেতে চান কি চান না?' জিগ্যেস করে লোকটা ঃ 'বিটকেলদের হাত থেকে রক্ষা পেতে ইচ্ছুক কি?'

'আমি এখানে এসেছি আপনাদের নিয়ে পালিয়ে যাবার জন্যে...'

'নিশ্চয় নিশ্চয়।' দুই ভাইয়েরই উৎসাহ হয়ঃ 'কিন্তু কি করে উদ্ধার পাবো? সদর গেটে তো তালা বন্ধ—দারোয়ানের কড়া পাহারা...'

'ওধার দিয়েই না। ছাত দিয়ে নিয়ে পালাবো আমি আপনাদের। যেভাবে আমি এসেছি।' বলে লোকটা ছাতের সিঁড়ি ধরে—'আসুন আমার সঙ্গে।'
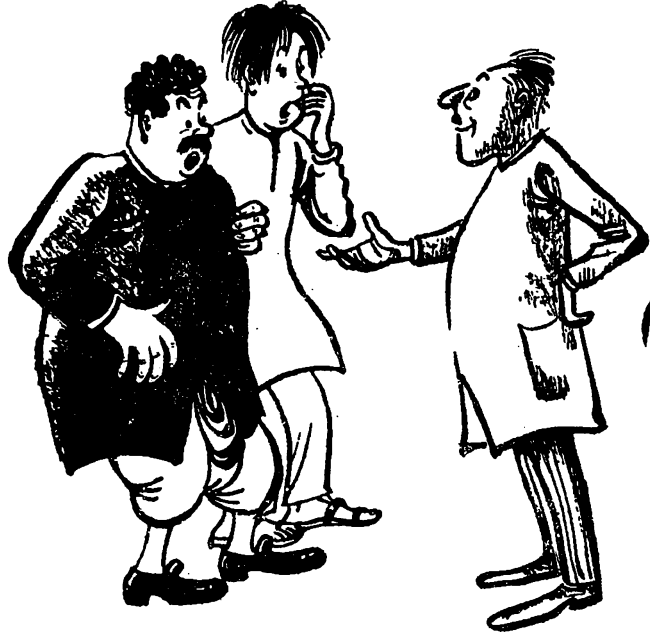
হাসির ফোয়ারা

হর্ষবর্ধন লোকটার **পিছু পিছু** ছাতে উঠে দেখেন, বাড়ির এধারকার গায়ে-পড়া গাছটা যেমন গোবর্ধনকে **একদা গর্ভে ধারণ করেছিলো**, পেছনদিকেও একটা গাছ তেমনি বাড়ির গা-লাগা হয়ে তাদের **পৃষ্ঠে বহন করার জন্যে প্রস্তুত** হয়ে আছে।

'দেখছেন তো **গাছটা?**' **উপরচড়াও লোকটি** তাঁদের দেখায় ঃ 'গাছটা কেমন হুমড়ি খেয়ে পড়েছে **ছাতের ওপর? এই পথেই এসেছি আমি। এখন** এর শাখা প্রশাখা ধরে ওপরে উঠে যান, তার **পর গা বেয়ে তরতর করে নেমে পড়ুন তলায়। তাকান** শাখাটার দিকে। উঠতে পারবেন তো?'

'তা আর পারবো না! **বলে গাছ** নিয়েই আমাদের **কাজ। কাঠের কারবারী** আমরা।' **হর্ষবর্ধন** বললেন ঃ 'কতো গাছকে কেটে তক্তা বানিয়ে ফেললাম বলতে গেলে। আর গোবরা? ওতো ছোটোবেলার থেকে গাছের কোলে পিঠেই মানুষ। আমগাছেই বাস করতো রাতদিন।'

'আম পাকলেই অবশ্যি।' গোবরার প্রতিবাদ ঃ 'তাও দিনরাত নয়! আর সারা বছর ধরে নয় তো কখনোই।'

গাছের বক্ষে ও'রা ঝাঁপ দিলেন। তারপর মাটিতে পা দিয়ে হাঁপ ছাড়লেন দুজনে ঃ 'বাঁচলাম বাবা! চোরের হাত থেকে বাঁচা গেল।'

'তা তো বাঁচা গেলো। কিন্তু কার খর্পরে পড়লুম এখন কে জানে!'

পিছু পিছু নেমে এসে এগিয়ে এলো লোকটা—'আসুন, সামনেই আমার গাড়ি দাঁড়িয়ে। রাস্তায় মোড়টাতেই।'

মোটরে উঠে হর্ষবর্ধনের প্রশন ঃ 'কোথায় যাচ্ছি এখন আমরা?'

'চলুন না খানিক। দেখতেই পাবেন।'

মিনিট পনেরো যেতেই একটা বড়ো শহর দেখা গেলো। গোবরা শুধালো—'এটা কোন শহর মশাই?'

'শহর কলকাতা।'

'ঠাট্টা করছেন'! অবিশ্বাসের হাসি হাসলো দু'ভাই ঃ 'কলকাতার থেকে একশো মাইল দূরে গিয়ে পড়েছিলাম আমরা। আর এই একটু না আসতেই—এই টুকুনের মধ্যেই কলকাতা? বলেন কি!'

'বেলগেছের থেকে কলকাতা একশো মাইল—জানতুম না তো!' লোকটাও কম অবাক হয় না।

'বেলগেছে কি আমরা চিনিনে নাকি? বেলগেছেই যদি হবে তো সেই হাসপাতাল—মার্কামারা সেই পুলটা কই? বেলগেছের খালটাই বা গেল কোথায়?'

'আমরা তো বেলগেছের পথ ধরে আসিনি। বিটকেলদের নজর এড়াতে ঢাকুরের দিক দিয়ে ঢুকেছি কলকাতায়!'

হাসির ফোয়ারা

'কলকাতাই যদি হবে তবে চিনতে পারছি না কেন?' গোবরা শুধায় ঃ 'এই ক'দিনে এতোটাই বদলে যাবে নাকি আমাদের শহর?'

'কলকাতা এই রকমই। দিনকের দিন চেহারা পালটায়। ঘণ্টায় ঘণ্টায় মিনিটে মিনিটে বদলে যায়। কলকাতার রকমসকম ধরতে পারা সহজ নয় মশাই—এই শহরকে চেনা অতি কঠিন কাজ!'

দেখতে দেখতে রাসবিহারী অ্যাভিনিউ এসে পড়ে ঃ 'হ্যাঁ হ্যাঁ কলকাতাই বটে।' উল্লসিত হয়ে ওঠেন হর্ষবর্ধন ঃ 'ঐ যে টেরাম রে! টেরাম গাড়িই কলকাতার লক্ষণ—বুঝলি গোবরা? রিকশা, মোটর, ঠেলাগাড়ি সর্বত্রই আছে—দেশ গাঁয়েও—কিন্তু এই টেরাম কলকাতার বাইরে আর কোথাও পাবিনে।'

ট্রামের বড়ো রাস্তা ছেড়ে মেজো সেজো রাস্তা পার হয়ে গাড়িটা শেষে একটা পাড়ার মধ্যে এসে ঢুকলো।

'পাড়াটা চেনা চেনা মনে হচ্ছে না দাদা?' কথা পাড়লো গোবরা ঃ 'আমাদের পাড়ার মতই ঠেকছে যেন। যেখানে আমরা থাকতাম সেই ধরনেরই অনেকটা—কী বলো—তাইনা?'

'তা কি করে হবে?' তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে চারিদিক তাকিয়ে জবাব দেন দাদা—'তবে বলতে কি, কলকাতার সব পাড়াই প্রায় এক ধাঁচের। সেই রোয়াকওয়ালাবাড়ি। পাশেই বস্তির মাঠকোঠা, সেই ছেলেরা রবারের বল পিটছে রাস্তায়, কিংবা ক্রিকেটের নাম করে ব্যাটম্বল খেলছে...'

'ব্যাটম্বল?' খটকা লাগে গোবরার ঃ 'কিসের অম্বল বললে?'

'অম্বল নয়, ব্যাটম্বল। পেটে খেলে কী হয় জানিনা, তবে পিঠের ওপর একখানা খেলে কম্বল নিতে হয় নির্ঘাত! সাত দিন শুয়ে থাকো তখন!'

'ও, তুমি সেই ব্যাটবলের কথা বলছো? তা অমন সংস্কৃত করে শুদ্ধ ভাষায় ব্যাটম্বল...'

'ও বাবা! এ রাস্তাটা এমন আবরো খাবরো কেন গো?' লোকটিকে শুধান হর্ষবর্ধন।

'রাস্তার তলা দিয়ে টেলিফোনের লাইন কি জলের পাইপ কিছু একটা এখানে পাতা হচ্ছে বোধ হয় সেইজন্যে খঁুড়ে তুলে ফেলেছে রাস্তাটা।...গাড়ি এ রাস্তায় যাবে না আর। এটাকে ছেড়ে দিয়ে আমরা নেমে পড়ি এখেনেই। আসুন।'

'বলছিস আমাদের পাড়ার মতন? আমাদের পাড়াটায় কতো খোলামেলা জায়গা পড়েছিলো, ছেলেরা ফুটবল খেলা জমাতো সেই সব পোড়ো জমিতে, আর এখানে? কতো উঁচু উঁচু সব বাড়ি উঠেছে—উঠছে—চারিধারেই চেয়ে দ্যাখ!'

লোকটা ওদের নিয়ে একটা খালি বাড়িতে গিয়ে ওঠে।—'এইটেই আপাততঃ আপনাদের আস্তানা।' জানায় সে।

জানালা কপাট নেই বাড়িটার, জানলার জায়গায় সব হাঁ করা, খাঁ খাঁ করছে সারা বাড়ি।

● চোরের ওপরে যায় যারা!

ধুলোবালিভর্তি নোংরা ঘর যত জঞ্জালভরা। দেখে শুনে নাক সিঁটকালেন হর্ষবর্ধন—'আস্তানা, না, আস্তাবল?'

'যা বলো দাদা!' বলে ওঠে গোবরা—'তা, আস্তাবলেই বা তোমার আপত্তি কি! তোমার নামের অর্ধেক তো হর্ষ (সহর্ষে সে জানায়) আর হর্স মানে ঘোড়া। ঘোড়ার পক্ষে আস্তাবলই তো ভালো!'

এমন অবস্থায় ভায়ের রসিকতার প্রয়াসে দাদার পিত্তি জ্বলে যায়। হর্স মানে যে ঘোড়া, তা তিনি জানেন। কিন্তু সে ঘোড়া ঘাস খায়। তিনি কি ঘাস খান? গোবরার কথার কোনো জবাব না দিয়ে লোকটাকেই তিনি বলেন—'তবে আমার বাকি অর্ধেকের জন্যে একটা গোয়ালঘর দেখুন নাহয়?'

'বাকি অর্ধেক? তার মানে?' বিস্মিত হয়ে জানতে চায় লোকটা।

'আমার বাকি অর্ধেক তো বার্ডেন? বার্ডেন মানে বোঝা। বোঝা টোঝা কোথায় রাখে? কোনখানে বোঝাই করা হয় বলুন? গোয়ালঘরেই না?'

'গোয়ালঘরে?'

'আস্তাবলেই আমার চলে যাবে বেশ, কিন্তু ওর তো এখানে পোষাবে না। ওর জন্যেই বলছিলাম।'

'আপনার ভায়ের জন্যে গোয়ালঘর দেখতে বলছেন?'

'গোবরা ওর নাম! আর, গোবরা তো গোবরেরই অপভ্রংশ। ওরা গোয়ালঘরেই পরিত্যক্ত হয়। সেখানেই পড়ে থাকতে আমরা দেখতে পাই।—মানে, গোরুর ঐ যত অপভ্রংশদের।'

লোকটা কিন্তু এসব রসিকতার ধার দিয়ে যায় না, সে বলে—'তা যাই বলুন। গোয়ালঘরই হোক, আর আস্তাবলই হোক, আপাততঃ এখানেই আপনাদের গুম করে রাখতে হবে।'

'গুম!' কথাটা যেন বোমার মতই দুম করে পড়ে ওদের সামনে।

'আমাদের গুম খুন করা হবে নাকি গো?' জানতে চায় গোবরা। শুনে দুই ভাই-ই ভারী গুম হয়ে গেছেন।

'কেন, খুন করতে যাবো কেন? খুন খারাপি করিনে আমরা। ওসব আমাদের কাজ নয়।—বলেছি না আমরা চোর ছ্যাঁচোর নই...'

'কিন্তু আপনারা যে কী তাও তো বলেননি।' বলেন হর্ষবর্ধন।

'বলেছি না? যে আমরা চোরের ওপর দিয়ে যাই? চুরির ওপর বাটপাড়ি করি আমরা। তাই আমাদের পেশা। আমরা হচ্ছি গিয়ে বাটপাড়।'

'বুঝলাম এতোক্ষণে।' বললেন হর্ষবর্ধন। এবং বোঝার সঙ্গে ঘাড় থেকে যেন একটা একমনী বাটখারা নেমে গেলো।

'আর এ-জায়গাটাই বুঝি তাহলে আপনাদের সেই বাটপাড়া?'

হাসির ফোয়ারা

'বাটপাড়াও নয়, ভাটপাড়াও নয়। এমনকি আপনাদের গোঁদলপাড়াও না...' বেশ ভণিতা করেই জায়গাটার বুঝি পরিচয় দিতে যাচ্ছিলো সে, এমন সময়ে বাধা পেল গোবরার এক চিৎকারে —'ওমা!......'

দেয়ালের দিকে আঙুল বাড়িয়ে সে চেঁচিয়ে উঠেছে হঠাৎ—'ও দাদা! এটা যে আমাদের

হর্ষবর্ধন তাকিয়ে দেখেন সত্যিই দেয়ালে তাঁর শ্রীহস্তের লাঞ্ছনা।

পাড়াই বটে! এ তো আমাদেরই সেই বাড়ি গো! দেখছো না দেয়ালের গায়ে তোমার হাতের আখর...?'

হর্ষবর্ধন তাকিয়ে দেখেন সত্যিই! দেয়ালে তাঁর শ্রীহস্তের লাঞ্ছনাই বটে! পেনসিল দিয়ে লেখা তাঁর হাতের স্বাক্ষর উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে—শ্রীশ্রীহর্ষবর্ধন।

হাসির ফোয়ারা

আর ঠিক তার নীচেই গোবরার দেবাক্ষর—শ্রীমান্ গোবর্ধন! তাও সমানে জ্বলজ্বল করছে!

'আমাদের বাড়িই বটে তো! কিন্তু বাড়ির একী দশা!' বলতে গিয়ে প্রায় ডুকরে ওঠেন হর্ষবর্ধন—'আমাদের আসবাবপত্র, খাট, পালঙ্ক, আলমারি, দেরাজ, তক্তপোশ, পাপোশ, তোরঙ্গ বিছানা, সোফাসেট, চেয়ার, টেবিল—এসব আমাদের গেলো কোথায়?'

'কোথায় গেলো ফ্রিজ, ফ্যান, আলোর ফিটিংস—জানলা দরজা খড়খড়ির পাল্লারাই বা পালালো কোথায়...?' গোবরার অনুযোগ।

'চুরি হয়ে গেছে সব।' পরিষ্কার করে বাটপাড় ঃ 'কলকাতার বাড়ি খালি পেলে আর মালিক না থাকলে কিছু থাকে নাকি? যে পায় নিয়ে পালায়। বাড়ির মালিক বাড়িতে থাকলেই বলে রাখা যায় না, আর আপনারা তো বেশ ক'দিন ধরেই বেপাত্তা।'

'তাই বলে এই কলকাতা শহরের বুকের ওপর বসে এতোটাই বাড়াবাড়ি হবে?'

'মশাই, বাড়িটা যে ফিরে এসে দেখতে পেয়েছেন এটাই আপনাদের ভাগ্যি বলে ভাবুন। এখন তো শুধু আসবাবপত্তর আর দরজা জানালাই গেছে, আর দিনকতক দেরি করে ফিরলে বাড়িটারই পাত্তা পেতেন না, ভেঙে ফেলে এর ইট-কাঠ-কড়ি-বরগা সব লরি করে পাচার হয়ে যেতো—পাড়ার সবার চোখের ওপরেই! তখন এসে ফাঁকা জমিটাই দেখতে পেতেন খালি। আরো কিছুদিন দেরিতে এলে দেখতেন, কে এসে আপনার জায়গা বেদখল করে সাততলা বাড়ি হাঁকড়ে বসে আছে—নতুন প্যাটার্নের বাড়ি দেখে চিনতেই পারতেন না তখন। আপনার এই বাড়ির কোনো চিহ্নই থাকতো না একদম।' জানায় বাটপাড়।

'বৌদিও চলে গেছে বাপের বাড়ি। ঘরদোর সামলাবে কে?' গোবরার আফসোস হয়, 'আরে, আমাদেরই সামলাবার কেউ ছিলো না। বেওয়ারিশ অনাথ বালক পেয়েই না ধরে নিয়ে গেছলো চোরে...?'

'তবেই বুঝুন!' বাটপাড় বিশদ করে বুঝিয়ে দেয় আরো ঃ 'আর ঘরের বৌ ঘরে নেই বলেই ঘরদোর নোংরা! ঝাড় পোঁছ করবে কে? কে মুছবে ঘরদোর আসবাবপত্তর? কথায় বলে গৃহিনী গৃহ মুছ্যতে! সে না মুছলে আর মুছবার কেউ নেই কোথ্থাও।'

'ঘরদোর জাহান্নামে যাক, চোখের জলই বা মোছায় কে!' গোবরা যেন দাদার কাটা ঘা-য় নুনের ছিটে লাগায়।

'চোখের জল মোছানোর কী হয়েছে! আমি কি কাঁদছি নাকি তোর বৌদির জন্যে? প্রাণ চায় তুই কাঁদ। ডুকরে ডুকরে কাঁদ না হয়। ভেউ ভেউ করে...ঘেউ ঘেউ করে, হাউ হাউ করে যেমন তোর খুশি!'

'তা তো বুঝলাম, কিন্তু এর রহস্যটা বুঝছিনে...।' বাটপাড় আঙুল দেখায় দেয়ালের পানে —'ঐ আপনার শ্রীশ্রীহর্ষবর্ধন! ওর মানে?'

'ওর মানে উনি। ঐ তো আপনার সামনেই খাড়া। উনিই হর্ষবর্ধন আর আমি...আমি...... আমি হলুম গে তস্য ভ্রাতা...।'

'বলাই বাহুল্য!' বাধা দেয় বাটপাড়—'আপনাকে আর আমিত্বের বড়াই করতে হবে না। আপনিই তার পরেরটি। আমি খবর পেয়েছিলাম যে আপনারা খুব বড়োলোক, কিন্তু অ্যাতো বড়োলোক তা আমার ধারণা ছিলো না।'

'বড়োলোকের পেলেনটা কী?' গোবরার বিরক্তিভরা প্রশ্ন।

'ঐ শ্রীশ্রী! ওটা আমার ভারি বিশ্রী লাগছে। সামান্য মানুষের আগে শ্রীশ্রী? ও তো ঠাকুর দেবতার আগেই থাকে গো! যেমন শ্রীশ্রীকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ...।'

'কেন, উনি কি ঠাকুর নন? আমার বৌদির পতিঠাকুর তো উনিই...!'

'সে তো সবার বৌদিরই একটি করে আছে মশাই!'

'তাছাড়া উনি আমার বৌয়ের বটঠাকুরও তো বটেন!' বাৎলায় গোবর্ধন।

'না, মশাই না। এখনো আমি কারো বটঠাকুর টটঠাকুর নই। এখনও হইনি। বিয়েই হয়নি ওই ছোকরার। তবে হ্যাঁ, ওর একটা কনে দেখবার জন্যেই আমার বৌ বাপের বাড়ি গেছেন বটে। দেখা যাক এখন কদ্দুর কী হয়।' তিনি প্রাঞ্জল হয়ে বলেন।

'হলে তো খুব ভালোই হয়।' বাটপাড় সায় দেয় ওঁর কথায়—'নইলে ঘরদোরের যা ছিরি হয়েছে; দুদুটো গিন্নী না হলে এত বড়ো বাড়ির এতো সব মুছবে কে! এক জোড়াতেই কুলোয় কিনা কে-জানে!'

'আমার বৌদির কোনো জোড়া নেই মশাই। তুলনা হয় না।' জানায় গোবরা।—'বুঝলেন তো কেন উনি শ্রীশ্রী? ওই ঠাকুরগুষ্টির লোক বলেই।'

'তা, ঠাকুরগুষ্টির ঠিক না হলেও, এমন কি বটঠাকুরও যদি না বলা যায় আমায় এখনই...' হর্ষবর্ধন নিজের সাফাই গান এবার ঃ

'তাহলেও চেয়ে দেখুন, আমার এই চেহারাটা কি বিশাল বটগাছের মতোই নয়? আর বট অশথ এসব তো আমাদের দেশে দেবতাই। তাদের তো পুজোই করে থাকে পাড়াগাঁর লোকেরা! করে না?'

'তাহলে আপনি বটঠাকুরই বটেন মশাই! শ্রীশ্রী বটঠাকুর। আপনার ছিচরণে নমস্কার।' বাটপাড় দন্ডবৎ জানায় ঃ 'এবার কৃপা করে বটবৃক্ষের একটা পাতা যদি খসান। বেশ মোটা অঙ্কের একখানা চেকপত্র—এই অধীনের ওপরটায়।'

বাটপাড়ের নমস্কার পড়তে না পড়তেই নীচের থেকে ভারী শোরগোল উঠতে থাকে।

'ডাকাত পড়লো নাকিরে!' বলে বাটপাড়। ফাঁকা জানলায় উঁকি দিয়ে তাকাতে গিয়ে দেখে যে, সদরে এক ছ্যাকরা গাড়ি খাড়া হয়েছে—তার মাথায় যতো রাজ্যের মালপত্তর। গাড়ির থেকে জাঁদরেল গোছের এক মহিলা নেমেছেন, তিনি দাঁড়িয়ে থেকে আঙুল বাড়িয়ে সহিস গাড়োয়ানের সাহায্যে মালপত্তর নামাচ্ছেন। দোরগোড়ায় সে সব স্তূপাকার।

হাসির ফোয়ারা

আর সেই মহিলাটি বেজায় বচসা লাগিয়েছেন গাড়োয়ানের সঙ্গে—গাড়ির ন্যায্য ভাড়া কতো হতে পারে তাই নিয়ে। তিনি যেমন তাঁর কড়াক্রান্তিতে কড়া গাড়োয়ানের গলাও তেমনিই দস্তুরমতো চড়া। বিস্তর লোক দাঁড়িয়ে গেছে চারধারে। সারা মহল্লায় দারুণ হল্লা।

'ওমা! ডাকাতই ত বটে!' বলে ওঠে বাটপাড়—'না, ডাকাত পড়লে বাটপাড়রা আর সে তল্লাটে থাকে না!'

বলেই সে খিড়কির পথ দিয়ে সটান সটকান দেয়।

'কি রকম ডাকাত দেখি তো!' বলে গোবরা জানলার ফাঁকে ভয়ে ভয়ে উঁকি মারতে গিয়ে সোৎসাহে লাফিয়ে ওঠে—'ওমা! বৌদি যে! বৌদি এসে পড়েছে বাপের বাড়ি থেকে। বেঁচে গেলাম দাদা, আর কোনো ভয় নেই আমাদের। এসে গেছেন বৌদি!'

'কেবল তোর বৌদির ভয়টাই রইলো যা।' গোমড়া মুখে গোবরার দিকে তাকিয়ে বললেন দাদা—'সেই ভয়েই থাকতে হবে এখন থেকে।'

'বৌদিকে আবার ভয়টা কিসের! লোকটা বললেই হলো! বৌদি তো সত্যিই কিছু ডাকাতে নয়।' গোবরা গজরাতে থাকে, 'এমন ডাকসাইটে বৌদিকে আমাদের বলে কি না ডাকাত! লোকটা কী আহাম্মক।'

'ঠিকই বলে গেছে লোকটা। চোরে আর ডাকাতে তফাৎ থাকলেও বৌয়ে আর ডাকাতে কোনো তফাৎ নেই ভাইরে'

'তফাৎ নেই?'

'চোর কেবল চুরি করে নেয় আর বৌ নেয় সব কেড়ে কুড়ে। চোরের চুরি শুধু পরের ঘরে আর বৌয়ের ডাকাতি হচ্ছে নিজের বরের ঘাড়ে। এই যা তফাৎ!' বলতে গিয়ে হর্ষবর্ধনের দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়ে ঃ 'চোরের কাজ রাতবিরেতে আর বৌয়ের হচ্ছে দিনে ডাকাতি!'
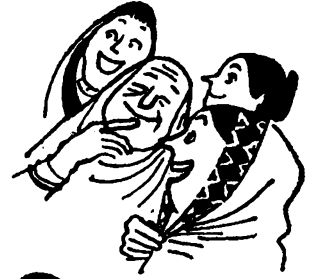
ব্রজবিহারীর ধনুর্ভঙ্গ!

ব্রজবিহারীর ধনুর্ভঙ্গ পণ ছিল না মাধবীকে বিয়ে করার, সেটা ছিল ধনুর ; তাই চিঠিটা পেয়ে একটু অবাক হয়েছিলাম বইকি!

বাড়ি-ঘর ছেড়ে এতকাল নিরুদ্দেশে থাকার পর ফিরে এসে অবশেষে মাধবীর মত একটা আধবুড়ীকে বিয়ে করা আমার কাছে একটু অভূতপূর্ব বলেই বোধ হয়।

ষাট বছর পেরিয়ে বিয়ের ছাঁদনাতলায় গিয়ে লটকানো কম বিস্ময়কর নয় তো!

অবাক তো হয়েছিলামই, আরো অবাক করে দিল সে নিজে এসে তার পরে।

চিঠির ল্যাজ ধরে স্বয়ং ব্রজ এসে হাজির হল শেষে।

'পাছে তুমি ভুল বোঝো ভাই, তাই আসতে হল আমাকেই এই সাত তাড়াতাড়ি...' এসে বলল সে।—'আমার চিঠির লেজুড় হয়ে। পুনশ্চ হয়ে আর কি!'

'না, ভুল বুঝাবুঝির কী আছে ভাই! এরকম তো হয়েই থাকে আকচার।' আমি বলতে চাই, 'প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে, কে কোথায়...'

হাসির ফোয়ারা

'প্রেম ফ্রেম নয় ভাই', সে বাধা দেয় আমার কথায়—'চিঠিটায় আমি ব্রজ বলে নামসই করেছি তো, সেই জন্যেই আসতে হল আমায়। শতং বদ মা লিখ, শাস্ত্রে বলেছে। সে কথাটা ভুলে গেছলাম বেমালুম। ওই স্বাক্ষরটা করা আমার ঠিক হয়নি। কিসের থেকে কী দাঁড়ায়, ফৌজদারী আদালত অবধিই বা গড়ায় কি না কে জানে! এই বয়সে কি জেল খেটে মরতে হবে শেষটায়, তাই...'

'বিয়ে করাও তো একরকমের জেলে যাওয়া ভাই', আমি জানাই, 'তাই নয় কি বলো?'

'জেল যে, তা এর মধ্যেই টের পেয়েছি বিলক্ষণ। কিন্তু তাহলেও আলিপুরের সশ্রমের চেয়ে তো ঢের ভাল। আরামপ্রদ কারাবাসই বলতে গেলে একরকম।'

'তা বলতে পারো বটে। কিন্তু আমি অবাক হচ্ছি এই ভেবে যে, মাধবীকে বিয়ে করার কথা ছিল ধনুর। তোমার তো নয়, কিন্তু তুমি যে...'

'ধনুই তো বিয়ে করছে। এই দ্যাখো না।' বলে সে একটা ছাপানো নিমন্ত্রণপত্র আমাকে দেখালো, তাতে শ্রীধনুর্ধর রায়ের সঙ্গে কুমারী মাধবী বসুর শুভবিবাহর কথাই ছাপার অক্ষরে লেখা রয়েছে বটে।

'তাহলে ধনুই বিয়ে করছে, তুমি নও। তাই বল তাহলে।' আমি হাঁপ ছাড়ি।

'ধনু ওরফে আমিই—এই শ্রীব্রজবিহারী বর্মণ।'

হেঁয়ালি রাখো। খোলসা করে বল সব!'

'হেঁয়ালি নয় ভাই, সত্যি কথাই। তুমি বন্ধুজন, তোমার কাছে প্রকাশ করতে বাধা নেই। জানি তুমি আবার তা পুনঃপ্রকাশ করে আমায় জেলে পাঠাবার ব্যবস্থা করবে না। তাই খোলসা করে সব তোমাকে খুলে বলার জন্যই এতখানি আমার ছুটে আসা।'

'তুমি ব্রজ না ধনু—কে তাহলে? ঠিক করে বল দেখি?' সঠিক ঠাওর না পেয়ে আমি বলি—'আমার নিজেরই কেমন খটকা লাগছে। তোমাদের দুজনের চেহারায় এমন আশ্চর্য মিল ছিল যে কে যে কোন্‌টা তা ঠাওর করতে পারতাম না আমরা। তুমি ধনু, না ব্রজ?'

'আমি ব্রজই।' বলে সে করুণ সুরে ধরে : 'কিন্তু, আর তো ব্রজে যাব না ভাই, যেতে মন নাহি চায়। মা পেয়েছি বাপ পেয়েছি...ব্রজের খেলা ভুলে গেছি...না, মা আমার মারা গেছেন সম্প্রতি। এখন থেকে আর আমি ব্রজ নই। অতঃপর, আমি শ্রীমান ধনুর্ধর—এখন থেকে বরাবর।'

'বুঝতে পারছি না কী ব্যাপার।'

সবটাই আমার কাছে যেন ধাঁধার মতন মনে হয়।

'ভাওয়ালের মেজকুমারের সেই কেসটা, ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলা গো! তোমার মনে আছে নিশ্চয়? আমার ব্যাপারটাও প্রায় সেই রকমই বলতে গেলে। তবে ভাওয়ালের বেলায়

● ব্রজবিহারীর ধনুর্ভঙ্গ।

সন্ন্যাসীর নিজের সাধু ইচ্ছা ছিল। আর এ ক্ষেত্রে আমার অনিচ্ছাসত্ত্বেই, ব্যাপারটা আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই যা তফাত।'

'অর্থাৎ?'

'আইন-বিরুদ্ধ কোন কাজ করার বাসনা কোনদিনই আমার ছিল না, এক্ষেত্রে তো নয়ই, কিন্তু পাকেচক্রে কেমন করে কী যে ঘটে যায়!' সে বলতে থাকে ঃ

'আমাদের সোনারপুর থেকে সেই কলেজে পড়বার সময়েই আমি আর ধনু নিরুদ্দেশ হয়ে গেলাম না? বছর চল্লিশেক হল তো? তারপর থেকে আমাদের কোন খবর পাওনি তোমরা— রাখওনি তেমন। ভাগ্যান্বেষণে সারা ভারত তারপর ঘুরলাম আমরা দুজনে, তারপরে কোথাও কিছু সুবিধা করতে না পেরে কপাল ঠুকে বর্মা মুলুকে পাড়ি দিলাম আমরা। বর্মায় গেলেই কপাল ফেরে, বলত লোকে তখন। অন্ততঃ, শরৎবাবুর উপন্যাস পাঠ করে সেই রকমের একটা ধারণা জন্মেছিল আমাদের।

মাঝপথে সমুদ্রে ঝড়ের মুখে পড়ে আমাদের যাত্রী জাহাজটা ডুবে যায়—সেই থেকেই ধনুর সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি। আরেকটা জাহাজ এসে নিমজ্জমান আমাদের কতকগুলোকে তুলে নেয়, তাদের ভেতরে ধনু ছিল না কিন্তু। মনে হয় সে তলিয়ে গেছে সেই ঝড়ে।

'যাক, আমি তো সেই জাহাজে বর্মায় গিয়ে পেঁছিলাম। এটা-সেটা করতে করতে টীকের ব্যবসায় লেগে গেলাম শেষটায়। টীক এক রকমের দামী কাঠ, জান বোধহয়? টীকের কারবারে অনেক টাকা কামিয়ে ছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর টিকে থাকা গেল না...'

'সে কি? টীকের জঙ্গল সব সাফ হয়ে গেল নাকি?'

'না না। আমরাই সাফ হয়ে গেলুম! বার্মার নয়া বিপ্লবী সরকার এসে বিদেশীদের যত ব্যবসাপত্তর সব বাজেয়াপ্ত করল, নিঃসম্বল উদ্বাস্তু হয়েই ফিরে আসতে হল স্বদেশে।

'কোথায় যাই? ভাবলাম বাড়িতেই ফিরে যাই, বাড়ি-ঘর কি আছে আর আমার? মা ছোটবেলায় মারা গেছেন, তারপর মামার বাড়িতেই আমি মানুষ—কিন্তু সেখানে যেতে মন চাইল না। ভেবে-চিন্তে নিজের গ্রাম সোনারপুরেই ফিরলাম।

'কিন্তু সোনারপুর আর সেই সোনার গ্রামটি নেই, শহরতলী হয়ে তার ভোল পালটে গেছে এখন। কোথায় যে আমাদের ভিটে ছিল তার কেন হদিসই মিলল না। আর মিললেই কী হত? তিন কুলে তো কেউ ছিল না আমার। শুনলাম মামারাও সেখান থেকে বহুকাল আগে উঠে গেছেন কোথায়!

'ভাবলাম, আপাততঃ আমার ইস্কুলের বন্ধু পার্থর বাড়িতেই উঠি গিয়ে। তারপর দিন কয়েক সেখানে কাটিয়ে ভাগ্যান্বেষণে বেরিয়ে পড়া যাবে ফের।

'সোনারপুরে পার্থদের বর্ধিষ্ণু পরিবার। তারা নিশ্চয় উঠে যায়নি আর কোথাও।

'গিয়ে দেখলাম, পার্থ তার বাড়ির রোয়াকেই বসে। কিন্তু সে আর সেই আগের পার্থটি

নেই—ছিমছাম সুশ্রী চেহারার সেই পার্থ। একেবারে অপদার্থ হয়ে গেছে। দিব্যি ভুঁড়ি বাগিয়েছে এখন, বুড়িয়েও গেছে বেশ।

—"পার্থ, চিনতে পারছিস আমায়?"

'শুধোতেই না তার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল কেমন। তারপর তার ভুঁড়ির পরিধিতে আন্দোলন দেখা গেল।

—"ওমা ধনু যে! অ্যাদ্দিন পরে? কী আশ্চর্য!"

'তারপরই সে হাঁক পাড়ল বাড়ির নেপথ্যে—"মা! মা! নেমে এসো একবারটি। ধনু ফিরে এসেছে আবার—পরলোক থেকে।"

'আর এই ভাবেই নতুন নাটকের যবনিকা উঠল আমার জীবনে। আমি বলতে যাচ্ছিলাম, না না, আমি ধনু নই, আমি ব্রজ। আমরা দুজনে যে দেখতে ঠিক এক রকম ছিলাম তা কি তোমার মনে নেই? এমন কি মাস্টারদেরও ভুল হত আমাদের দুজনকে নিয়ে। ধনুর অপরাধে আমাকেই বেত খেতে হয়েছিল কতবার। মনে পড়ছে না তোমার?...বলতে যাচ্ছি, কিন্তু বলতে দিলে তো! ফাঁকই পেলাম না কথাটা বলবার।

'ইতিমধ্যে পার্থের মা নেমে এসেছিলেন—আমাকে দেখে তাঁর আনন্দ আর ধরে না! পাড়ার আরও লোক সব জড়ো হল এসে, যেন হারানো মানিক ফিরে পেয়েছে সবাই—কারো আর আনন্দের অবধি রইল না। সেই উল্লাসের তোড়ে আমার কথাটা যেন উড়ে গেল কোথায়। পাড়ার ফুরসৎই পেলাম না।

'এরই ভেতরে পার্থ আমায় আড়ালে ডেকে নিয়ে বলল—"জান, তোমার মা ইতিমধ্যে লাখখানেক টাকা পেয়ে গেছেন লটারিতে? তবে বুড়ী আর বেশিদিন টিকবে না ভাই! শরীর এমন ভেঙে পড়েছে তাঁর। চোখেও ভাল দেখতে পান না আজকাল।"

'খবরটা পেতেই আমি চেপে গেলাম একেবারে। আমার মত বদলে গেল বেমালুম। ব্রজকে সলিল-সমাধিতে পাঠিয়ে ধনু বনে গেলাম দেখতে না দেখতে। আর, সবাই যখন আমাকে ধনু বলেই ধরে নিয়েছে, চিনতে ভুল হচ্ছে না কারো—তখন বৃথা এখন এদের কাছে ব্রজবুলি আউড়ে লাভ কী?

'পার্থ আমাকে খবর দিল আরো। মাধবীর খবরটাও দিল আমায়। মাধবী আমাদের সঙ্গেই পড়ত স্কটিশ চার্চ কলেজে, তাকে বেশ মনে ছিল আমার—যদিও আমার চাইতে ধনুর সঙ্গেই তার ভাব ছিল বেশি।

'পার্থ বলল—"মাধবী এখনো তোমার জন্যে অপেক্ষা করে বসে আছে। তাকে বিয়ে করবে বলে তুমি কথা দিয়েছিলে না? সেই কথা বিশ্বাস করে এখনো সে আর কাউকে বিয়ে করেনি।"

"তাই নাকি? কিন্তু এই বয়েসে—সেটা কেমনধারা হবে?......মানে, তাকে এই বিয়ে করাটা?" আমি বলি পার্থকে।

হাসির ফোয়ারা

"সে তুমি যা ভাল বোঝ। আমার মতে, তোমার ওকে বিয়ে করাই উচিত। তোমার মাকে সে-ই এতদিন দেখাশুনা করছে—সেবা-যত্ন করছে, আপন শাশুড়ির মতই। তার তো তিনকুলে কেউ নেই এখন আর। সে তোমার মা-র কাছেই থাকে। ঠিক তাঁর নিজের মেয়ের মতই।"

'ধনুর মাকে গিয়ে প্রণাম করতেই তিনি আমায় বুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে বসলেন—জানতুম তুই ফিরে আসবি একদিন। ঠাকুর-দেবতার দোর ধরে তোকে পেয়েছিলাম, জাহাজ-ডুবি হলেও তুই বেঁচে যাবি জানতাম। নিশ্চয় আর কোন জাহাজ তুলে নেবে তোকে...

"তাই হয়েছিল মা। আরেকটা জাহাজ কাছ দিয়েই যাচ্ছিল তখন—তুলে নিল আমাদের। কিন্তু ব্রজ-বেচারীর আর কোন পাত্তা পাওয়া গেল না তারপর।"

"আমার স্থির বিশ্বাস ছিল আমার মরবার আগে তোকে আমি দেখতে পাব। মাকে তোর মনে পড়বে একদিন। ফিরে আসবি তুই আমার কোলে আবার।"

'আমাকে পেয়ে মা যেন হারানিধি ফিরে পেলেন...

'মাধবীকে নিয়ে একটু বেগ পেতে হবে ভেবেছিলাম। কিন্তু সে কোন উচ্চবাচ্য করল না আদৌ। বিয়ে করার কথাটা পাড়লই না একেবারে। বেঁচে গেলাম আমি, বলতে কি!

'শৈশবের থেকে মা-হারা, মাতৃস্নেহ কাকে বলে জানি নে, তার স্বাদ ষোল আনাই পেলাম ধনুর মা-র কাছে। নিজের মায়ের সেবা করার কোন সুযোগ পাইনি, দুঃখ ছিল মনে, তারও কোন ত্রুটি রাখলাম না আমি। মাতৃভক্তির চূড়ান্ত করে ছাড়লাম।

'জানতুম তুই ফিরে আসবি একদিন।'

'বেশ সুখেই কেটে যাচ্ছিল দিনগুলো—স্বপ্নের মতই প্রায়। ইতিমধ্যে...'

● ব্রজবিহারীর ধনুর্ভঙ্গ।

'ইতিমধ্যে আমাদের তো ঘুণাক্ষরেও জানাওনি কিছু এসব।' বাধা দিয়ে আমি শুধাই—'কারণ কি? নতুন মা পেয়ে কি পুরনো বন্ধুদের সব ভুলে গেলে নাকি?'

'না। তা নয়। তবে আমার মা, মানে ধনুর মা মারা গেলেন কিনা হঠাৎ। তাঁর বিষয়-সম্পত্তির সাকসেসন সার্টিফিকেট, ব্যাঙ্কের হিসেব-পত্তর এই সব নিয়েই ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল এতদিন। তার পরে সে-সব ঝঞ্ঝাট মিটবার পর, অবশেষে কী হল তাই বলি...।'

বলে ব্রজ চুপ করে রইল। নিজের মনের সলিলসমাধিতে তলিয়ে গেল যেন।

'কী হল?' আমি ওকে উসকে দিই। ব্রজের লীলাখেলার উপসংহারটা জানবার জন্য আমি উদ্‌গ্রীব।

'ভাবলাম, আর কেন? সবকিছু এবার বেচে-টেচে দিয়ে টাকা-কড়ি নিয়ে এখানকার পাত্তাড়ি গুটোই। অন্য কোথাও গিয়ে নতুন করে ব্যবসাপত্তর ফাঁদি আবার। তাই ভেবে, তার আগে মাধবীর একটা ব্যবস্থা করা দরকার বলে আমার মনে হল। ও বেচারীরো তো কেউ নেই কোথ্থাও। আর এতদিন ধরে ধনুর মাকে দেখেছে শুনেছে—সেই ভেবে না, একটা থোক টাকা দিয়ে ওর কাছ থেকে বিদায় নিতে গেলাম।

'কিন্তু মাধবী এককথায় আমায় চমকে দিল। হেসে বলল, "ব্রজবাবু, আপনি কি ভেবেছেন যে আপনাকে আমি চিনতে পারিনি? কিন্তু ধনুর মা মনে কষ্ট পাবেন বলে সেই ভেবে এতদিন চুপটি করে থেকেছি। ভেবেছি যে মা যখন তাঁর হারানো ছেলে ফিরে পেয়ে সুখে আছেন, তাঁর জীবনের শেষ ক'টা দিন তিনি সেই সুখেই থাকুন। কেন আবার কষ্ট পান। তাই আমি কাউকে কিছু বলিনি। এমন কি, আপনাকেও আমি সে-কথা ঘুণাক্ষরে টের পেতে দিইনি। পাছে আপনি ধনুর মাকে ফেলে তাঁর প্রাণে দাগা দিয়ে ফের আবার ভেগে পড়েন। কিন্তু এখন তো আমার মুখ খোলার কোন বাধা নেই। থানায় আমি খবর দিতে চললাম।"

'শুনেই না আমার হয়ে গেছে! আবার যেন আমি বঙ্গোপসাগরে তলিয়ে যাচ্ছি...আমার সেই ভরাডুবির মধ্যেই শুনতে পাই সে বলছে..."ব্রজ, তোমার হয়তো মনে থাকতে পারে, কলেজের ক্লাসে আমি ঠিক তোমার পেছনের বেঞ্চিটিতেই বসতুম। তোমার মাথার পেছন দিকটা দেখে দেখে মুখস্থ হয়ে গেছল আমার। তাই, সামনে দেখে তোমাকে ঠিক চেনা না-গেলেও পেছন থেকে... যাক্, আর সবাইকে ফাঁকি দিতে পারলেও আমাকে তুমি ঠকাতে পারনি।"

'সলিল-সমাধি থেকে ভেসে উঠে আমি বললাম—"ঠকাতে চাইও না আমি। ধনু তোমাকে বিয়ে করবে বলে কথা দিয়েছিল। ধনুর সেই কথাটা আমি রাখব। যেকালে ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক ধনুর ভূমিকা নিতে হয়েছে আমায়, তার কথাও আমায় রাখতে হবে বইকি।"

'শুনে সে চুপ করে রইল। তারপর আমি আরও বললাম, "দ্যাখ মাধবী, আমাদের দুজনেরই যৌবন পেরিয়ে গেছে। এই শেষ বয়সে দুজনারই দুজনকে দরকার এখন। আমাকে ছেড়ে তুমিই

বা কোথায় যাবে আর তোমাকে ছেড়ে আমিই কি থাকতে পারব? পরস্পর মিলে-মিশে আমরা ঘর বাঁধি এস।"

'আর তারপরই তোমার এই ছাঁদনাতলা?' আমি বলি, 'এখন তাহলে নতুন ঘরাণায় তোমার নবীন ঘরোয়া সংগীত? নতুন ঘরে নতুন সঙ্গী এখন?'

"ব্রজবাবু, আপনি কি ভেবেছেন যে আপনাকে আমি চিনতে পারিনি?" [পৃষ্ঠা ১২৮

'মেয়েছেলের চোখকে কখনও ফাঁকি দেওয়া যায় না ভাই! অবিশ্যি, তার জন্য আমার কোন আপসোস নেই—তার প্রমাণ দেখচ তো এই—'

বলে ছাপানো কার্ডখানা সে আমার হাতে তুলে দিল।

হাসির ফোয়ারা

'এই কার্ডখানা তোমায় পাঠালেই আর কোন গলদ হত না। তুমিও আমায় ধরতে পারতে না তাহলে—আর কেউ যেমন পারেনি। কিন্তু ভাবলাম, তুমি আমার পুরোনো বন্ধু, অন্তরঙ্গ একজন, ছাপানো চিঠি দিয়ে ডেকে পাঠানো উচিত হবে না তোমায়। তাই হাতে লিখে বিয়ের কথা জানাতে গেছি; আর তার ফলেই আগের অভ্যাসবশে নিজের সাবেক নামটাই সই করে বসেছি শেষটায়। তাই এই গলদটা হল।'

'কিচ্ছু গলদ হয়নি। তোমার কোন ভাবনা নেই, কারু কাছে এ-কথা আমি ফাঁস করব না, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। তবে কোনদিন হয়তো তোমার কাহিনীটি, কাউকে গল্প না-করলেও গল্পচ্ছলে লিখে বসতে পারি। তাহলেও কোন ভয় নেইকো তোমার। গল্প-কথায় কেউ কখনো বিশ্বাস করে না। আর, আমার গল্প তো হেসেই উড়িয়ে দেয় সবাই।' আমি তাকে অভয় দিই—'বৃথা ভয় খেয়ো না ভাই ব্রজ!'

'না না না। আর আমি ব্রজ নই। ব্রজের লীলাখেলা ফুরিয়ে গেছে আমার। এখন আমি ধনু...ধনু...ধনু...ধনুই আমি এখন থেকে।'

বারংবার ও'র ধনুষ্টংকার শুনতে হয় আমায়।

পৃথিবীতে সুখ নাস্তি!

হেডমাষ্টার মশাই রোলকল করে চলেছেন—'থ্রি, ফোর, ফাইভ, সিক্স, সেভেন্…'

টেন-এ এসে তিনি হোঁচট খেলেন।

'টেন? নাম্বার টেন? সমীর? সমীর আসেনি? আজো আসেনি সে?'

সমীরের পাশের বাড়ির ছেলে অশোক দাঁড়িয়ে বললো—'তার অসুখ করেছে স্যার।'

'অসুখ? সমীরের অসুখ?' হেডমাষ্টার বিস্মিত হলেন খুব—'সে তো খুব হেল্‌দি ছেলে, তার আবার কী অসুখ হোলো?'

'আমি ঠিক উচ্চারণ করতে পারব না স্যার।' অশোক ইতস্ততঃ করে—'অপস্মার না—কী।'

'অপস্মার? সে আবার কী রকমের ব্যারাম?' হেডমাষ্টার মশাই অথই বিস্ময়ে হাবুডুবু খান।

'কি জানি স্যার! ও তো তাই বললো।' তারপর কি যেন ভেবে নিয়ে অশোক একটা

কৈফিয়ৎ দিতে যায়—'পরশু দিন একটা ষাঁড় ওকে তাড়া করেছিল, তাই থেকেই হয়েছে কিনা কে জানে!'

'ষাঁড় থেকে অপস্মার?' হেডমাষ্টার মশাই ঘাড় নাড়েন—'সে আবার কি? আচ্ছা, আমাদের ডাক্তারকে আমি জিগ্যেস করবো।'

পরের দিনও সমীর গরহাজির আবার। হেডমাষ্টার মশায়ের ফার্ষ্ট পিরিয়ড; রোলকল করতে গিয়ে আবার তাঁর চোট লাগে—'টেন? নাম্বার টেন? রোল নাম্বার টেন? আজো—আজো আসেনি সমীর?'

অশোক উত্তর যোগায়—'না, স্যার! তার শরীর আজ আরো খারাপ।'

'ও, হ্যাঁ! মনে পড়েছে। অপস্মার! ষাঁড়ের অপভ্রংশ না—কি! তুমিই কাল বলেছিলে না?'

'না স্যার, আজ অন্য অসুখ।' মুখখানা কিরকম করে অশোক রাফ খাতার একখানা পাতা বার করে।—'টুকে এনেছি আমি স্যার! আজ হচ্ছে হলীমক।' পত্রপাঠ জানায়।

'হলীমক? সে আবার কি?' হেডমাষ্টার মশাই এবার তো ঘাবড়েই যান—'সে আবার কী অসুখ—অ্যাঁ? হোলি খেলার থেকে কিছু হওয়া নাকি এটা?'

'আমিও তো তাই ওকে জিগ্যেস করতে গেছলাম। ও বললে—সে তুই বুঝবি নে। হলীমক ভারি শক্ত ব্যারাম। হোলির সঙ্গে কোনই সম্পর্ক নেই, ও একটা কোবরেজি অসুখ।' বিরস মুখে অশোক বিবৃতি দ্যায়।

'কোবরেজি অসুখ? আমাদের ডাক্তারকে যেতে বলবো আজ তাহলে ওদের বাড়ি। হেডমাষ্টার মশায়ের ভাবনা হয়—'কিন্তু কোবরেজি অসুখ কি ডাক্তারি-ওষুধে সারবে? আমি নিজেই একবার যাবো নাহয়।'

'যাবেন স্যার। নিশ্চয়ই যাবেন। ও ভারি ম্রিয়মাণ হয়ে পড়েছে।' অশোক জানালো।

সমীরের অসুখ নিয়ে সারা ইস্কুলে শোরগোল পড়ে গেল বেজায়, এমনকি মাষ্টারদের মধ্যেও। ফোর্থ ক্লাসে ভরতি হয়ে এই ফার্ষ্ট ক্লাসে ওঠা অবধি একটি দিনের জন্যেও তার কোনো অসুখ-বিসুখ করেনি, একদিনও তার ইস্কুল কামাই নেই। রেগুলার অ্যাটেণ্ডেন্সের প্রাইজ পর পর তিন বছর একা সমীরই মেরেছে। সেই সমীরেরই উপর্যুপরি তিন-দিন গরহাজির। অসুখের অজুহাত করে সমীরের মত ছেলের এই কামাই! একথা ভাবতেই পারা যায় না।

সমীর সে ধরনের ছেলেই নয় যে, যতই দশটার দিকে কাঁটা এগোয়, ততই তার গায় কাঁটা দিতে থাকে, কেমন যেন মাথা ধরে যায় আর পেট কামড়াতে লাগে। ডায়ারিয়া, ডিসেণ্ট্রি, আর ডিপথিরিয়া সব হৈ-চৈ করে একসঙ্গে এসে পড়ে। সেধরনের ছেলেই সে নয়। অসুখের ছুতোনাতা করে একটা বাঁধা প্রাইজ—একচেটেই তার—এমন হাতধরা বাৎসরিক পুরস্কার একখানা—সে যে এত সহজে হাতছাড়া করবে, তেমন ছেলেই নয় সে।

'হোলো কি তবে সমীরের?' ড্রিলমাষ্টার হেডমাষ্টার মশাইকে প্রশ্ন করলেন। বলতে কি,

হাসির ফোয়ারা

সমীর-বিহনে তাঁরও মন খারাপ, ড্রিল করানোর উৎসাহই হচ্ছে না তাঁর। সমীরের ড্রিল ছিল একটা দেখবার মতন। তার অ্যাটেনশান, তার অ্যাবাউট-টার্ন, তার ফল ইন্—সে যে কী জিনিস, না দেখলে বোঝা যায় না। এমনি এক মিলিটারী কায়দা যে, দেখলেই চমক লাগে ; এমনকি ড্রিলমাষ্টার মশাই নিজেই এক-একবার চমকে যান। বয়স্কাউট দলের সে-ই তো আদর্শ। সেই সমীরেরই এই কাণ্ড!

সমীরের অভাবে ড্রিলমাষ্টারের আর ড্রিলের কোন উদ্দীপনাই আসছে না। সমীরের ফল্ ইন্ ছাড়া সমস্তই যেন নিষ্ফল।

'হোলি হায়, না—কি যেন একটা বিদ্ঘুটে ব্যারাম হয়েছে তার, অশোক বললো আমায়।' গম্ভীর মুখে প্রকাশ করলেন হেডমাষ্টার।—'কাল বিকেলে দেখতে যাবো আমি, যদি কালকেও সে না আসে।'

তার পরদিন সমীর ক্লাসে এসে হাজির। সেই সমীরই বটে—কিন্তু অশোক যা বলেছিল, তার চেয়েও বেশী—তার ডবোল ম্রিয়মাণ।

হেডমাষ্টার মশাই তাকে দেখে রোলকল বন্ধ রেখেই বললেন—'এই যে সমীর! এসেছো আজ! কী খবর বলতো তোমার? হোলির হাঙ্গামা সব চুকে বুকে গেছেতো?'

'না, স্যার। হলীমক নয়। যা ভেবেছিলাম, তা নয়। আমার লক্ষণ-নির্ণয়ে ভুল হয়েছিল।' বিষণ্ণ মুখে সমীর বিস্তৃত করল—'খুব সম্ভব এটা আমার পাণ্ডুরোগ হবে, কিংবা গুল্মও হতে পারে পেটে।'

পাশ থেকে অশোক ফিসফাস করে—'কোন্ গুল্মরে? লতাগুল্ম নয়তো? পাদপ টাদপ জাতীয়? পেট ফুঁড়ে গাছ বেরোবে নাকি তোর? পা দিয়ে না মাথা দিয়ে কোন্ ধার দিয়ে বেরবে—যদি বেরোয়?' সবিস্ময়ে জানতে চায় সে।

'সে তুই বুঝবিনে! শক্ত কোবরেজি অসুখ যত।' সমীরের কণ্ঠস্বর করুণ।

'এক কাজ করো।' হেডমাষ্টার মশাই বলেন—'আমাদের ডাক্তারবাবুকে বলে রেখেছি। যেয়ো তুমি তাঁর কাছে। তিনি ভালো ক'রে তোমাকে পরীক্ষা ক'রে দেখবেন।'

সেদিন বিকেলেই ড্রিলমাষ্টার এসে জানালেন—'নাঃ, সমীরের গতিক সুবিধের নয়। সে সমীর আর নেই। ড্রিল করতে গিয়ে তার পা-ই ওঠে না আর। বলে যে—কি যেন বললে—কী নাকি হয়েছে তার পায়ে—কথাটা অশ্লীল কিনা জানিনে...' বলে কোনরকমে তিনি সেই বিপাকের কথাটা উচ্চারণ করলেন।

'শ্লীপদ?' হেডমাষ্টার মশাই হকচকিয়ে যান—'তবে যে বললো—গুল্ম নাকি হয়েছে তার পেটে? এর মধ্যেই—এই ক'ঘণ্টার ভেতরে—অসুখ আবার পালটে গেলো কিরকম?'

'কি ক'রে বলবো। সমীরই জানে!' বললেন ড্রিলমাষ্টার। 'বলছে যে শ্লীপদ।'

● পৃথিবীতে সুখ নাস্তি!

হাসির ফোয়ারা

'কি বললো সমীর?' হেডমাষ্টার চোখ কপালে তুলে তাকান—'কি হয়েছে বললো? এর মধ্যেই আবার কি বিপদ হলো তার?

'বিপদ নয়, শ্লীপদ। শ্লীপদই তো বললো সে।' ড্রিলমাষ্টার মশাই স্মরণ শক্তির সাহায্য নিয়ে ব্যক্ত করেন পুনরায়—বলছে যে—'স্যার, আমার বোধহয় শ্লীপদ হয়েচে, ভারী হয়ে গেছে পা, কই, পা তেমন ক'রে আর তুলতে পারছিনে তো!'

ড্রিলমাষ্টার জানালেন, নাঃ, সমীরের গতিক সুবিধের নয়!
[পৃষ্ঠা ১৩৩

'শ্লীপদ কি জিনিস?' বিশদরূপে জানতে চান হেডমাষ্টার মশাই—'কি জাতীয় অসুখ?'

'কি ক'রে জানবো?' ড্রিলমাষ্টার মশাই মুখ ব্যাঁকান—'বলছে যে শ্লীপদ কিংবা ধনুস্তম্ভ—এই দুটোর একটা কিছু হবে বোধহয়। শুনে তো মশাই! আমি নিজেই ধনুকের মতন স্তম্ভিত হয়ে গেছি!'

'এসব আবার কী ব্যামো—কোত্থেকে আসে?'

'কি করে জানবো মশাই? পক্ষাঘাত হলেও বুঝতুম। ধনুষ্টঙ্কার হলেও বোঝা যেতো।' ড্রিলমাষ্টার জানান—'আবার বলছে, এই শ্লীপদ থেকে শেষটায় নাকি গৃধ্রসীও দাঁড়াতে পারে! এই বলে ড্রিল ছেড়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছে সমীর। বসে আছে তখন থেকেই।' ড্রিলমাষ্টার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফ্যালেন—'মুখ চুন ক'রে এককোণে গিয়ে বসে রয়েছে। দেখে-দেখে এমন বিচ্ছিরি লাগছে আমার!'

'কী সর্বনাশ। কী বললেন—গৃধিনী, না—গৃধ্রসী? যাক্‌গে, তাহলে তো ওকে গাড়ি করে বাড়ি পাঠানো দরকার।' হেডমাষ্টার মশাই তক্ষুণি ওকে ছুটি দিতে ব্যস্ত হলেন।

পরদিন সমীর আবার অ্যাব্‌সেন্ট্‌। আবার কদিন তার পাত্তা নেই!

● পৃথিবীতে সুখ নাস্তি।

হাসির ফোয়ারা

অশোক বললো, রাফ খাতার পাতা উলটে, ভালো ক'রে পড়ে দেখে সে বললো—'ওর অশ্মরী হয়েছে স্যার। পাছে কথাটা আমার মাথায় না থাকে, তাই আমি খাতায় টুকে এনেছি স্যার!'

হেডমাষ্টার মশাই এবার আর ভড়কান না ; এমনই একটা বিজাতীয় বিচ্ছিরি কিছুর জন্যে তিনি প্রস্তুত হয়েছিলেন মনে হয়। সহজেই ধাক্কাটা সামলে নেন তিনি—'অশ্মরী? এবার কি কোন অশ্ব-টশ্ব তাড়া করেছিল নাকি তাকে?'

'কি ক'রে জানবো স্যার! আমিও তাই জানতে চেয়েছিলাম, কিন্তু—কিন্তু—কী বলবো! আগে কিছু জিগ্যেস করতে গেলে তেড়ে আসতো, এখন কেবল মুখ কাঁচুমাচু করে চুপ করে থাকে, আর ফ্যালফ্যাল করে তাকায়। আর বলে যে—বেশীদিন আমি আর বাঁচবো নারে।'

'আমি মানে—আমি নই স্যার, মানে, সে—থার্ড পার্সন সিংগুলার নম্বর।' অশোক খোলসা করে—'আমি নিজে মরতে যাচ্ছিনে স্যার। সমীর যাচ্ছে। সে খালি বলছে স্যার—তোদের সঙ্গে এই হয়তো আমার শেষ-দেখা!'

'অশ্মরী? কস্মিন্‌কালেও শুনিনি এমন! কোনো অমানুষিক ব্যাধি নিশ্চয়। মানুষের তো এসব রোগ হবার কথা নয়। অশ্ব-টশ্বরই এসব হয়ে থাকে সম্ভবতঃ।'

'গাধাদেরও তো হয় না, যদ্দুর জানা গ্যাছে, কি বলেন স্যার?' অশোক জানতে চায়—'আমিও তো সেই কথাই বলেছি ওকে—বলেছি যে তোর ও সব হবে না। তুই তো আসলে একটা...' বলে সে আর সেকথা বাড়ায় না।—'অশ্মরী কী অসুখ সার? সারে?'

'কি করে বলবো! নামও শুনিনি কখনো। বিলিয়াসফিভার, কি বিলিয়ারি-কলিক হলেও না-হয় বুঝতুম।' বলেন হেডমাষ্টার—'এমনকি, মেনিন্‌জাইটিস্‌-ফেলিন্‌জাইটিস্‌, হুপিং-কাফ, ব্রংকাইটিস—এসব হলেও কিছু-কিছুটা বোঝা যেত।'

ইস্কুল ছুটির পর বাড়ি ফিরে অশোক সমীরের কাছে গেলো।—'এই যে, তুই এখনো বেঁচে রয়েছিস দেখছি! মরিস নি তো এখনো তাহলে?'

'না, এখন পর্যন্ত না!' ম্লান মুখে সমীর জানায়।

'কেন? মরছিস না কেন? এমন সব শক্ত-শক্ত ব্যারাম তোর। ভারী ভারী উচ্চারণ শুনে হেডমাষ্টার মশাই পর্যন্ত উলটে গেছেন! কী হোলো রে তোর? মরছিস না যে বড়ো? অশোক জবাবদিহি চায়।

'কি করে বলবো।' সমীর বিষণ্ণ সুরে বলে—'আমিও তো তাই ভাবছি ভাই।'

'ভেবেছিলাম এসে দেখবো—তুই মারা গেছিস।' অশোক ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে ব্যক্ত করে। —'মরলে পরে একদিন ছুটি পাওয়া যেত ইস্কুলে!'

সমীর কিছু বলে না, শুধু দীর্ঘনিশ্বাস ফ্যালে।

'আচ্ছা, মরলি কিনা, কাল এসে খোঁজ নেবো আবার।' অশোক নিজের মুখখানা যদ্দুর সম্ভব করুণ করে আনে—'এখন খেলতে যাই? কেমন?'

● পৃথিবীতে সুখ নাস্তি!

হাসির ফোয়ারা

পরদিন ক্লাসে সমীরকে দেখতে পেয়েই হেডমাষ্টার মশাই উসকে ওঠেন—'আজ—আজ আবার কি অসুখ তোমার, বিসূচিকা নাকি?'

'অ্যাঁ? আজ্ঞে?' সমীর একটু চমকেই যায় বলতে কি!

'মানে, কলেরা-টলেরা হয়নি তো?' হেডমাষ্টার মশাইয়ের ব্যাখ্যায় একেবারে প্রাণ-জল-করা প্রাঞ্জলতা—'কলেরা আরো কঠিন হলে কোবরেজি হয়ে ওঠে কিনা। তখন বিসূচিকা হয়ে দাঁড়ায়—বিসূচিকা দাঁড়ালেই মারা পড়ে, বাঁচে না আর।'

বিসূচিকা বুঝি কিছুতেই সারে না স্যার?' জিগ্যেস করে অশোক।

'হ্যাঁ, সারে বই কি! বিশেষ সূচিকা দিয়ে নুন-জল ভরলে তবেই সারে। কিন্তু সে ভারী হাঙ্গাম।' হেডমাষ্টার মশাই জানান—'তার চেয়ে মারা যাওয়া ঢের সোজা। হ্যাঁ, ঢের—ঢের সোজা।'

'না স্যার। তেমন অসুখ না স্যার।' সমীর জানালো—'আমি ডাক্তারবাবুর কাছে গেছলাম। তিনি বললেন, ভালো করে পরীক্ষা করে দেখে বললেন, আমার নাকি কোন অসুখই হয়নি।' সমীর বললো। বেশ, একটু ক্ষুব্ধ স্বরেই বললো সে।

'অসুখ হয়নি? যাক, বাঁচা গেল!' হেডমাষ্টার মশাই উথলে উঠলেন—'তবে আর কি! তবে তো ভালোই! যাও, খাও-দাও, লাফাও গে! আর পড়াশুনা করো মন দিয়ে। আর হ্যাঁ, ড্রিল! ড্রিলটাও কোরো। ভাল হয়ে গেছ তো।'

'না স্যার, ভালো না। আমি নিজে বুঝতে পারছি—আমার শরীর ভালো না।' সমীর চিঁ-চিঁ করে জানায়।

'তোমার কিছু হয়নি সমীর। সত্যি কিছু হয়ে থাকলে ডাক্তারবাবু ধরতে পারতেন। এসব তোমার কাল্পনিক অসুখ। তুমি আমাদের ইস্কুলের আদর্শ ছেলে, তোমার কি এসব সাজে?' হেডমাষ্টার মশাই উদাত্ত কণ্ঠে ওকে উদ্দীপনা দেন।

তবুও সমীর কোনো প্রেরণা পায় না। কাতর দেহে সারা পৃথিবীর সমস্ত পীড়া বহন করে প্রপীড়িত সমীর মলিন মুখে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর সমীর—ইস্কুলের আদর্শ ছেলে সমীর উপরো-উপরি আরও চারদিন ইস্কুল কামাই করল।

আর অশোক তার রাফ খাতা উলটে, পাতার পর পাতা পালটে চার দিনে চার রকম অসুখের ফিরিস্তি দিল। শোথ, রক্তাতিসার, গলক্ষত আর কামলা। সেই সঙ্গে এও জানালো যে, এই চারদিনেই কেবল হাড় ক'খানা ছাড়া দেখবার মতো তার দেহে কিছুই নাকি নেই আর।

ড্রিলমাষ্টার বললেন—'অগ্নিমান্দ্য হলেও বুঝতুম। কমলা নেবু খেলে সারে, কিন্তু কামলা আবার কী ব্যামো মশাই?'

'কানমলা দিলেই সারবে!' জানালেন হেডমাষ্টার—'তবে মনে হচ্ছে, বেশ করে কষে মলাটা দরকার।'

● পৃথিবীতে সুখ নাস্তি!

হাসির ফোয়ারা

সেই মতলবে হাত কষে রোষকষায়িত হয়ে সেদিন বিকেলেই সমীরের বাড়ি গিয়ে হাজির হলেন তিনি।

'সমীর, বাড়ি আছো?' বলে ভারী রকমের একখানা হাঁক ছাড়লেন। হেডমাষ্টারি হাঁক!

'রয়েছি স্যার!' উপর থেকে কাহিল গলায় জবাব এলো সমীরের—'এখনো রয়েছি স্যার!'

জীর্ণ-শীর্ণ সমীর কম্পিত চরণে নীচে নেমে এসে দরজা খুলে দাঁড়ালো। শরীরে তার কিছুই নেই, এই গরমের দিনেও মোটা একটা কোট—সেই কোট ছাড়া আর কিছুই নেই তার শরীরে। আর তার সেই কোটের কোটরে এক-তাড়া কি-সব যেন! দেখলে তাকে চেনাই যায় না!

কান মলবেন কি, হাতই উঠলো না তাঁর। হেড-মাষ্টারের মনে হোলো, ডাক্তারেরই ভুল, একটা কোন শক্ত অসুখে নিশ্চয়ই সমীরের হয়েছে—না হয়ে আর যায় না। নইলে ওর চেহারা এমন হয়?

'এ-কি! কী হয়েছে তোমার?' তিনি আকাশ থেকে পড়ে জিগ্যেস করলেন।

'আজ আবার কি অসুখ তোমার, বিসূচিকা নাকি?' [পৃষ্ঠা—১৩৬

'কী যে হয়েছে, তাইতো ঠিক করতে পারছিনে স্যার! খুব যে শক্ত অসুখ, তার কোনো ভুল নেই, কিন্তু একটা তো আর অসুখ নয়—একসঙ্গে একশোটা আমাকে ঘিরে ধরেছে। একশোটা অসুখের সঙ্গে কি পারা যায়? আমি আর বাঁচবো না স্যার!'

'আরে না-না, বাঁচবে বই কি! অসুখ হলে কি আর সারে না? সারবার জন্যেই তো অসুখ! শরীরটাকে আরো ভালো করে সারাবার জন্যেই তো অসুখরা আসে।' হেডমাষ্টার মশাই ওকে উৎসাহ দ্যান।—'কী হয়েছে তোমার বলো তো?'

'কী হয়েছে, তাই তো জানিনে স্যার। আচ্ছা, আচ্ছা—' খানিক ইতস্ততঃ করে অবশেষে সমীর প্রবাহিত হয়—'আচ্ছা, আমার কি অকালবার্ধক্য হতে পারে?'

'অকালবার্ধক্য! তোমার? এই বয়সে?' তবু একবার ওর আগাপাশতলা ভালো করে তাকিয়ে তিনি দেখে নেন। 'অকালবার্ধক্য তোমার হতেই পারে না। অসম্ভব!'

'তাহলে কী যে হোলো, সেই তো এক মুশকিল!' সমীর ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে—'বাতরক্ত—না রক্তপিত্ত! এর কোন্‌টা যে—কি করে বলবো? আচ্ছা স্যার, আমবাত আর আমাশা কি একই ব্যাপার? ওরই একটা, কিংবা দুটোই হয়তো একসঙ্গে আমায় ধরে থাকবে। তা কি কখনো হয় না কারো?'

'কী রকম হয় বলো তো? পেট কামড়ায় খুব? পেটের ভেতর মোচড় দিতে থাকে?'

'হয়তো দ্যায়, কিন্তু কিছু টের পাই না।' সমীর জানায়—'তবে—তবে মনে হচ্ছে হয়তো সন্ন্যাস হওয়াও সম্ভব। আমার কি এ-বয়সে সন্ন্যাস হতে পারে না?'

'সন্ন্যাস? তা এমন আর অসম্ভব কি? শ্রীচৈতন্যের প্রায় এই বয়সেই তো হয়েছিল। কিন্তু এবার ম্যাট্রিক পাস করবার বছর, এখন সন্ন্যাসের কথা ভাবছো কেন তুমি?'

'না স্যার, সে সন্ন্যাস নয়! সন্ন্যাস-ব্যামো। হঠাৎ হয়—হলে মানুষ শ্রীচৈতন্য নয়, অচৈতন্য হয়ে পড়ে তক্ষুণি। কিন্তু স্যার, আজ ক'দিন ধরে আমার গলার ভেতরটা ভারি খুসখুস করছে, গলগন্ড হয়েছে কিনা কে জানে! নাকি গোদ—নাকি আপনি বলেন অন্য কিছু? গলার ভিতর কি গোদ হয় নাকি স্যার? গলগন্ড বুঝি পিঠেই হয় কেবল? গলগন্ড আর কুব্জ ব্যাধি কি এক জিনিস? এইসব ভেবেই আমি আরো বেশী কাহিল হয়ে পড়েছি। এত রকমের অসুখ আছে এই পৃথিবীতে—এত বিচ্ছিরি সব অসুখ—নাঃ, পৃথিবীতে বেঁচে সুখ নেই। চোখটাও কেমন যেন করকর করছে তখন থেকে।'

'কেন? চোখে আবার কি হলো তোমার?'

'কত কিছুই তো হ'তে পারে! ইন্দ্রলুপ্ত হলেই বা কে আটকাচ্ছে?

'ইন্দ্রলুপ্ত? চোখে ইন্দ্রলুপ্ত?' হেডমাষ্টার মশায়ের চোখ কপালে ওঠে—'আমার যতদূর ধারণা, চোখ যদিও একটা ইন্দ্রিয়—ইন্দ্রিয়ই বটে, তবু চোখে কদাচ ইন্দ্রলুপ্ত হয় না, হতে পারে না, কক্‌খনো না।'

'তাহলে ছানিই পড়েছে হয়তো!' সমীর করুণ চোখে তাকায়।

'হ্যাঁ, সেটা বরং সম্ভব। কিংবা চাল্‌সেও হতে পারে। আমার একবার হয়েছিল, কিন্তু তাতেই-বা হয়েছে কি? তার জন্যে অতো ভাবছো কেন তুমি? অতো ভয়ই বা কিসের? ছানার মতো ছানিও তো কাটানো যায়।'

'চোখ কাটালে কি আর বাঁচবো স্যার?' সমীরের দৃষ্টি আরও কাতর হয়ে আসে—'চোখ

● পৃথিবীতে সুখ নাস্তি।

গেলে আর কী থাকবে আমার? সেই জন্যেই বুঝি আজ ক'দিন ধরে চোখের জল পড়ছে খালি। সেই জন্যেই না—কি? না—চোখের মধ্যে উদরী হয়েছে আমার? আপনি কী বলেন?'

উদরীর উচ্চারণেই সমীরের উদরের দিকে হেডমাষ্টারের নজর পড়ে।

'তোমার পেটটা এমন উঁচু দেখাচ কেন হে? এটা কি তোমার পেট, না—তোমার কোটের পকেট? কোটের পকেটে উঁচু হয়ে রয়েছে ও কী? টেলিফোন-ডিরেক্টরী?' হেডমাষ্টার মশাই জিগ্যেস করলেন।

অত্যন্ত অনিচ্ছায় সমীর পকেটের জঠর থেকে মোটা একখানা বই বের করলো।

অত্যন্ত অনিচ্ছায় সমীর পকেটের জঠর থেকে মোটা একখানা বই বের করলো।

হেডমাষ্টার মশাই হাতে নিয়ে দেখলেন—বইটার মলাটে বড়ো-বড়ো, মেজো-মেজো, ছোটো-ছোটো হরফে লেখা—'শরীর সুস্থ রাখুন! পাঁচ শত শক্ত-ব্যাধির সরল কবিরাজি চিকিৎসা। প্রথম সংস্করণ—সন ১২৯২ সাল। মূল্য একমুদ্রা মাত্র।'

'বুঝেছি।' হেডমাষ্টার মশাই ঘাড় নাড়লেন—'কোনো পুরানো বই-এর দোকান কি ফুটপাথ থেকে কিনেছ নিশ্চয়? এতক্ষণে তোমার সব ব্যারামের হদিস পেলাম। আসল কারণ বোঝা গ্যালো এখন। রহস্য পরিষ্কার হোলো। এ-বই আমি বাজেয়াপ্ত করলুম। আজ থেকে তোমার কোনো অসুখই নেই আর। বুঝেছো?' হেসে-হেসে বললেন হেডমাষ্টার মশাই—'তোমার সব অসুখ বেহাত হয়ে গেল—আমি হস্তগত করে নিয়ে চললুম। বুঝলে? যাও খ্যালোগে এখন—খ্যালাধুলো করোগে।'

সমীর বললো—'হ্যাঁ স্যার!' মস্ত ঘাড় নেড়ে বললে সে। মাথা থেকে একটা বোঝা নেমে যেতেই ঘাড়টা যেন হালকা হয়ে গেছে তার।

● পৃথিবীতে সুখ নাস্তি!

হাসির ফোয়ারা

আর তার পরেই—হেডমাষ্টার মশায়ের অন্তর্ধানের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তিড়িং-বিড়িং করে লাফাতে-লাফাতে খেলতে চলে গ্যালো সমীর। ফুটবল মাঠেই সটান।

হেডমাষ্টার মশাই ফেরবার পথে ড্রিলমাষ্টারের বাড়ি গিয়ে চড়াও হলেন— সদ্যলব্ধ সেই 'শরীর ভালো রাখুন' খানা বগলদাবাই করে।

'এই দেখুন মশাই, আপনার সমীরের যতো আধিব্যাধি—এই দেখুন—এই আমার শ্রীহস্তে। দেখছেন?'

'ও বাবা! এ যে খালি অসুখ গো! অসুখেই ভরতি সব! পাঁচশো রকমের ব্যামো দেখছি এখানে! নিদারুণ যতো ব্যারাম! অ্যাঁ?' ড্রিলমাষ্টারের বাক্যনিঃসরণ হয় না।

'হ্যাঁ, সমীরের শুধু গোটা দশেকের ওপর দিয়েই গেছে! চারশো নব্বইটার বাকী ছিল এখনো—কিন্তু তাদের আক্রমণ থেকে ওকে বাঁচিয়ে দিয়েছি—এক ধাক্কায় সারিয়েছি সবগুলোই!' হেডমাষ্টার মশাই ড্রিলমাষ্টারকে হাসতে হাসতে জানান।

পরদিন প্রথম ঘণ্টা পড়বার ঢের আগেই সমীর ক্লাসে এসে হাজির।

সারা ইস্কুলে কেবল দু'জন সেদিন অনুপস্থিত। ড্রিলমাষ্টার মশাই আর হেডমাষ্টার মশাই। তাঁরা এখনো এসে পৌঁছতে পারেন নি, এবং আসতে পারবেন না, খবর পাঠিয়েছেন।

দুজনেই ভারী অসুস্থ।

ড্রিলমাষ্টার মশায়ের পিত্তবিকার হয়েছে। পিত্তশূলও হতে পারে—এমনকি জ্বরাতিসার হওয়াও আশ্চর্য না! আর হেডমাষ্টার মশায়ের—

কী হয়েছে, ভেবে তিনি কূল পাচ্ছেন না। বিছানায় শুয়ে তিনি কুলকুল করে ঘামছেন—সেই সকাল থেকেই! সারাদিন কিচ্ছুই খাননি, কেবল একবার বুকে, একবার পেটে, আরেকবার মাথায়—নিজের মাথাতেই হাত বুলোচ্ছেন থেকে-থেকে।

আর মাঝে মাঝে নিজের নাড়ী টিপে দেখছেন কেবল।

হৃদ্রোগ কিংবা উদারাধ্মান—দুটোর কোনো একটা যে তাঁকে পেয়ে বসেছে, সে-বিষয়ে তাঁর সন্দেহই নেই। এমনকি পিত্তশূলও হ'তে পারে। বিত্তবিকার হওয়াও বিচিত্র নয়!

খুব যে শক্ত অসুখ, তার আর সংশয় কি?

চোখের ওপর ভোজবাজি

সবার উপরে মানুষ সত্য—ঘোরতর সত্যি কথা। উপরওয়ালা যে প্রচন্ডভাবে অমোঘ, তা কে না জানে? কিন্তু মানুষ আর কতক্ষণ উপরে থাকতে পায়? উপরের মানুষটির কতক্ষণ আর উপরি উপায়ের সুযোগ থাকে? আপন কর্মদোষে আপনার থেকেই কখন নীচে নেমে পড়ে।

আমরা তো হর্ষবর্ধনকে অদ্বিতীয় বলেই জানতাম, কিন্তু তিনি যে নিজগুণে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করবেন, করতে পারেন, তা কখনো আমার ধারণার মধ্যে ছিল না।

ধরাণাটা পালটালো ওঁর গিন্নীর কথায়। যেতেই তিনি বেশ খাপ্পা হয়ে কথাটা জানালেন আমায়। বললেন যে, লোকটা তো অ্যাদ্দিন বেশ চৌকোসই ছিল কিন্তু আপনার সঙ্গে মিশবার পর থেকেই দেখছি কেমনধারা ভোঁতা মেরে যাচ্ছে। বুদ্ধিশুদ্ধি বলতে কিছু আর নেই।

'কিন্তু আমাকে তো আমি রীতিমত ধারালো বলেই জানতাম', মৃদু প্রতিবাদের ছলে বলি ঃ 'উনি যেমন ধার দিয়ে দিয়ে ধারালো, তেমনি ধার নেবার বেলায় আমারও তো আর জুড়ি হয় না।'

'ধারালো লোকের ধার ঘেঁষতে নেই কখনো।' পাশ থেকে ফোড়ন কাটে গোবরা ঃ 'ধারে ধারে ঘষাঘষি হয়ে ধার ক্ষয়ে ভোঁতা হয়ে যায় শেষটায়। তাই হয়েছে গিয়ে দাদার।'

হাসির ফোয়ারা

তারপর সমস্ত কথা জানতে পারলাম সবিশেষ। হর্ষবর্ধনের চোখের ওপর ভোজবাজিটা ঘটে গেল কেমন করে! যেন কোন জাদুকরের মায়াদণ্ডেই হাওয়া হয়ে গেল অমন গাড়িটা!

হয়েছিল কি, হর্ষবর্ধন গত সকালে চুল ছাঁটতে গেছলেন পাড়ার কাছাকাছি এক সালুনে। সালুনে কাল ভিড় ছিল বেজায়। তাঁকে অপেক্ষা করতে হয়েছে খানিকক্ষণ।

অপেক্ষমান হর্ষবর্ধনের সামনে কতকগুলো বইপত্র এনে দিয়েছে সালুনওলা—'চুপ করে বসে থাকবেন কেন বাবু! এই বইগুলো দেখুন ততক্ষণ। আপনার আগে তো আরো জনাতিনেক রয়েছেন, তাঁদের ছাঁটাই শেষ হলেই আপনাকে ধরব তারপর।'

বইগুলো নিয়ে তিনি নাড়াচাড়া করছেন এমন সময় অপরিচিত একজন এসে তাঁর পাশে বসল—

'নমস্কার হর্ষবর্ধনবাবু!' বসেই এক নমস্কার ঠুকল তাঁকে।

'নমস্—কার!' প্রতিধ্বনির সুরে বললেও লোকটা যে কে তা কিন্তু তাঁর আদৌ ঠাওর হল না।

'আপনি আমাকে চিনবেন না মশাই! আপনার প্রায় প্রতিবেশীই বলতে গেলে। দুটো গলির ওধারে আমি থাকি। তবে আপনাকে আমি বেশ চিনি। আপনি আমাদের পাড়ার শীর্ষস্থানীয়। আপনাকে না চেনে কে?'

'না না। কী যে বলেন, আমি নিতান্ত সামান্য লোক।' অপরের দ্বারা এভাবে স্তুত হয়ে হর্ষবর্ধন কেমন যেন অপ্রস্তুত বোধ করেন।

'আপনি অসামান্য আপনি অসাধারণ! জানেন, পাড়ার ছেলে বুড়ো সকলে, ইতর ভদ্র সবাই আমরা আপনার পদাঙ্ক অনুসরণ করি?' বলে লোকটি একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করে: 'এই দেখুন না, আপনাকে এই সালুনে ঢুকতে দেখে আমিও এখানে দাড়ি কামাতে এলাম। নইলে নিজের বাড়িতেই তো কামাই রোজ। নিজের হাতেই কামিয়ে থাকি।'

'আমি চুল ছাঁটতে এসেছি।' হর্ষবর্ধন কথাটা উড়িয়ে দিতে চান। নিজের দৃষ্টান্তস্বরূপ হওয়াটা যেন তাঁর তেমন পছন্দ হয় না।

বলেই তিনি বইগুলো ভদ্রলোকের দিকে এগিয়ে দেন—'পড়তে দিয়েছে এগুলো। দেরি হবে এখানে চুল ছাঁটবার, দাড়ি কামাবার। হাত খালি নেই কারো—দেখছেন তো। পড়ুন এগুলো ততক্ষণ।'

'এসব তো রহস্য রোমাঞ্চের বই।' দেখেশুনে নাক সিঁটকান ভদ্রলোক: 'ভুতুড়ে অ্যাডভেঞ্চারের গল্প যতো। পড়লে মাথার চুল খাড়া হয়ে ওঠে। কেন যে রাখে এগুলো সালুনে কে জানে!'

'ওই জন্যেই রাখে বোধহয়।' হর্ষবর্ধন বাতলান: 'মাথার চুল খাড়া হয়ে থাকলে ছাঁটবার পক্ষে ওদের সুবিধা হয় সম্ভবতঃ।'

হাসির ফোয়ারা

একটা গভীর রহস্যের রোমাঞ্চকর সমাধান করে ওঁকে যেন একটু উৎফুল্লই দেখা যায়।

'তা যা বলেছেন!' তাঁর কথায় সায় দেন ভদ্রলোক ঃ 'এই এলাকায় এই একটাই তো ভাল সালুন। তবে এই বড় রাস্তার ওপরে, পাড়ার থেকে অনেকটা দূরে—রোজ রোজ আর কে এখানে দাড়ি কামাতে আসছে বলুন! এধার দিয়ে যাচ্ছিলাম, আপনাকে ঢুকতে দেখলাম বলেই না...তা, আপনার গাড়িটা কোথায় রাখলেন?'

'গাড়ি! গাড়ি কই আমার!' হর্ষবর্ধন নিজের দাড়িতে হাত বুলান—'গাড়ি নেই বলেই তো. এত ঝামেলা, দুবেলা গিন্নী বাড়ি মাথায় করেছেন সেইজন্যে। গাড়ি আর পাচ্ছি কোথায়!'

'সে কি! আপনি পাচ্ছেন না গাড়ি?' ভদ্রলোক রীতিমতন হতভম্ব।

'কই আর পাচ্ছি মশাই! তিন বছর হল দরখাস্ত দিয়ে বসে আছি...তবে এবার একটু আশার সঞ্চার হয়েছে বটে। এতদিনে আমার নাম লিস্টির মাথায় এসেছে। সবার ওপরে আমার নাম, দেখে এলাম সেদিন। এইবার পাব মনে হয়।'

'পেলেও পেতে পারেন।' ভরসা দেন ভদ্রলোক, 'মাথায় মাথায় হলে পাওয়া যায় কিনা!'

'হ্যাঁ, এজেন্টও সেই কথাই বলল। বলল যে আপনার গাড়ি পেঁৗছে গেছে ডকে, দু'একদিনের মধ্যেই মাল খালাস হয়ে আসবে। দিন দুই বাদে এসে দাম চুকিয়ে গাড়ি নিয়ে চলে যেতে পারবেন, বলল এজেন্ট।'

'আপনি ভাগ্যবান।' উল্লসিত হন ভদ্রলোক, 'কী গাড়ি বলুন ত?'

'ফিয়াট তো বলল।' হর্ষবর্ধন জানান ঃ 'ফিয়াট না কী যেন!'

'ফি—য়া—ট।' উপচে ওঠা উৎসাহ হঠাৎ যেন চুপসে গেল লোকটার—'ফিয়াট!'

'কিরকম গাড়ি মশাই?' হর্ষবর্ধন জানতে উদ্‌গ্রীব।

'যাস্‌সেতাই! ফিয়াট না বলে আপনি ফীয়ারও বলতে পারেন।'

'তার মানে?'

'ফীয়ার মানে ভয়। ভয়ংকর গাড়ি মশাই।'

'সে কি! তবে যে খুব ভালো গাড়ি বলল এজেন্ট?'

'ওরকম বলে ওরা। বেচতে পারলেই তো ওদের কমিশন। মোটামুটি লাভ যাকে বলে।'

'তাই নাকি?'

'বেশ বড়ো গাড়িই তো পেয়েছেন? বিগ ফিয়াট, নাকি বেবি ফিয়াট?' জানতে চান ভদ্রলোক।

'না, তেমনটা নাকি বড় হবে না বলল লোকটা। তবে নেহাত ছোটও নয় তাবলে। মাঝামাঝি সাইজের বলছে এজেন্ট।'

'কজন চাপবার লোক বাড়িতে আপনার?'

হাসির ফোয়ারা

'তিনজন আমরা। আমি, আমার গিন্নী আর আমার ভাই গোবরা—এই তো মোট! ড্রাইভারকে ধরে জনা চারেক স্বচ্ছন্দে যেতে পারে, সেইরকম জানা গেল।'

'কুলিয়ে যাবে তাহলে আপনাদের।'

'তা যাবে। গোবরা ড্রাইভারের পাশেই বসবে নাহয়, তার কী হয়েছে! আমরা কর্তা গিন্নী দুজনায় ভেতরে বসলাম। দুজনেই অবিশ্যি আমরা একটু মোটার দিকে, তাহলেও মোটামুটি আমাদের চলে যাবে মনে হয়।'

'মোটামুটিই হন আর পাতলাপাতলিই হন, আপনাদের চলে যাবে বুঝলাম।' বলার সময় ভদ্রলোকের মুখ বেশ ভার হয়—তবে গাড়িটা যদি চলে—তবেই না!'

'কেন, গাড়ি কি চলবে না নাকি?'

'কেন চলবে না। চালালেই চলবে। ঠেলেঠুলে চালাতে হবে। ঠেলেঠুলে চালালে কী না চলে বলুন? বাড়িতে আপনারা ক'জন আছেন বললেন? ড্রাইভারকে বাদ দিয়ে অবশ্যি, সে তো ধর্তব্যের বাইরে, কেননা সে তো স্টিয়ারিং ধরে বসে থাকবে কেবল। কজনা আছেন বললেন আপনারা?

'আমি, আমার বৌ, আমার ভাই—তাছাড়া একটা বাচ্চা চাকর—এই চারজন মোটমাট।'

'চারজনায় মিলে ঠেললে গাড়ি চলবে না আবার!' ভদ্রলোক মুক্তকণ্ঠ: 'বলেন কি; চারজনায় চার্জ করলে...বলে, ঠেলেঠুলে হাতিকেও চালিয়ে দেয়া যায়।'

'ঠেলেঠুলে নিয়ে যেতে হবে গাড়ি, তার মানে ঠেলাগাড়ি নাকি মশাই?' অবাক হন হর্ষবর্ধন।

'না, না, তা কেন? মোটরগাড়িই, আর দম দিয়ে চালাবার মত না হলেও, একটু উদ্যম লাগবে বইকি!...তবে ওই যা—একটু ঠেলা আছে।' তিনি বিশদ করেন—

'ঐ গোড়াতেই যা একটু ঠেলতে হবে। তারপর একবার ইঞ্জিন চালু হয়ে গেলে গড়গড় করে গড়িয়ে যাবে গাড়ি। এগুলোর অ্যাকসিলেটার তত ভালো নয় কিনা, তাই এরকমটা। আপনার থেকে স্টার্ট নেয় না তাই।'

'নতুন গাড়ির এমন দশা কেন মশাই?' হর্ষবর্ধন জিজ্ঞাসু।

'নতুন গাড়ি কি এদেশে পাঠায় নাকি ওরা? সেকেণ্ডহ্যাণ্ড সব।' জানান ভদ্রলোক: 'বলে সেকেণ্ডহ্যাণ্ড, আসলে কতো হাত ঘুরে এসেছে কে জানে! তাকেই আনকোরা বলে চালায় এখানকার বাজারে।'

'এই রকম! জানতাম না তো।' হর্ষবর্ধনকে একটু ম্রিয়মাণ দেখা যায়। 'ওদের শো রুমে ঐ ফিয়াট ছিল আরো দু-একখানা। এজেণ্ট ভদ্রলোক নমুনা দেখালেন আমায়—ঝকঝকে নতুন—খাসা চমৎকার দেখতে কিন্তু।'

'ঐ ওপর ওপর।' সমঝদারের হাসি হাসেন ভদ্রলোক। —'উপরে চাকনচিকন ভিতরে খড়ের আঁটি! উপরটা ঝকঝকে, ভিতরটা ঝরঝরে।' একটু দম নিয়ে নবোদ্যমে তিনি লাগেন

তারপর পাতায় পাতায় বসে গেল সব একে একে।
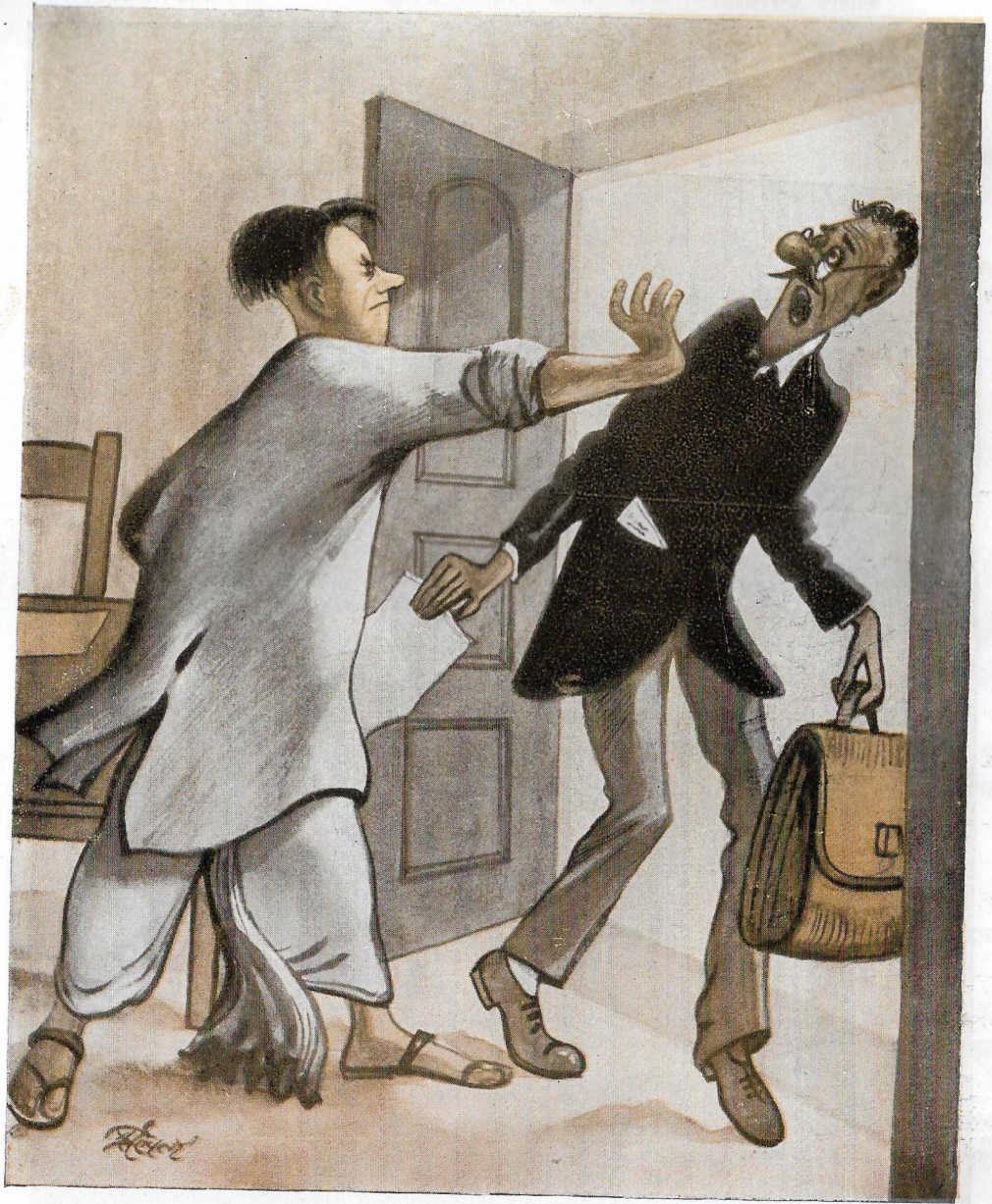
প্রাণকেষ্ট আর অধিক বাক্যব্যয় না করে প্রাণপণ কঠোরতায় একরকম ধাক্কা দিতে দিতেই লোকটিকে............................ পাঠিয়ে দেয়।

আবার—'তা ছাড়া, এই গাড়িগুলোর আরেকটা দোষ এই, পেট্রল কনজাম্‌পসন বড্ড বেশি। পেট্রল খায় খুব।'

'তা খাক। খাইয়ে লোকদের আমরা পছন্দ করি। আমরাও খুব খাই।'

'শুধুই কি পেট্রল? তাছাড়া হোঁচোট—?'

'হোঁচোট?' হর্ষবর্ধন বুঝতে পারেন না। চোট খান হঠাৎ।

'যেতে যেতে হোঁচট খায় যে গাড়ি। ভয়ঙ্কর স্কিড্‌ করে।'

'ছাগলছানা সামনে পড়লে আর রক্ষে নেই বুঝি?' হর্ষবর্ধন শুধান ঃ 'চাপা দিয়ে চলে যায়—বলছেন তাই?'

'ছাগলছানা পাচ্ছেন কোথা থেকে?' ভদ্রলোক হতবাক।

'ঐ যে বললেন ইস্‌কিড? ইস্‌কিড মানে তো ছাগলছানা। বিড এ ম্যান গো টু দি ইস্‌কিড্‌। পড়েনি নাকি ফাস্‌টবুকে?'

ছাগলছানা অব্দি যে তাঁর বিদ্যের দৌড় সেকথা অম্লানবদনে প্রকাশ করতে তিনি কোনো কুণ্ঠাবোধ করেন না।

'না না। সে তো হোলো গিয়ে কিড। এটা স্কিড। তার মানে, যেতে যেতে হঠাৎ লাফিয়ে যায় গাড়িটা। টক করে বেটক্করে গিয়ে পড়ে। আর এই করে বেমক্কা মানুষ খুন করেও বসে মাঝে মাঝে।'

'অ্যাঁ?' আঁতকে ওঠেন হর্ষবর্ধন।

'মারাত্মক গাড়ি মশাই—তবে আর বলছি কি!'

'কী সর্বনাশ!'

'সর্বনাশ বলতে! গাড়ির ব্রেক্‌টাই আসলে খারাপ। হাড়ে হাড়ে টের পাইয়ে দেবে আপনাকে। রাস্তায় যত খুন জখম হবে আপনার গাড়ির তলায়—তার খেসারত গুনতে গুনতে দুদিনেই আপনি ফতুর হয়ে যাবেন—লাখটাকার ক্ষতিপূরণ গুনেও আপনি পার পাবেন না!'

'লাখ লাখ টাকা ফাঁক হয়ে যাবে ঐ গাড়ির জন্যেই। বলছেন আপনি?'

'ঐ ব্রেকের জন্যই ব্রোক হতে হবে আপনাকে শেষতক।' ভদ্রলোকের শেষ কথা।

ব্রোক হবার আগেই যেন ব্রেক ডাউন হয় হর্ষবর্ধনের, ভেঙে পড়েন তিনি—শুনেই না!

'আর কলিশন হলেই ত হয়েছে। যদি আর কোনো গাড়ি কি ল্যাম্‌প্‌পোস্‌টের সঙ্গে একটুখানি ধাক্কা লাগে তাহলেই তক্ষুনি ভেঙে চুরমার! যা ঠুনকো গাড়ি মশাই!

'তাহলে আমরাও তো খতম্‌ হয়ে যাবো সেই সঙ্গে?'

'খতম্‌ না হলেও জখম তো বটেই। তবে গাড়িটা কিনেই ইনসিওর করিয়ে নেবেন, আপনারাও লাইফ ইনসিওর করে রাখবেন নিজেদের—তাহলেই কোনো ভয় থাকবে না আর। দুদিকই রক্ষা পাবে তাহলে। কোম্পানির থেকে দুটোরই খেসারত পেয়ে যাবেন তখন।'

এ গাড়ি আমি নেব না।

'মারা গিয়ে টাকা পাওয়ার কি কোনো মানে হয়?' তাঁর কথায় হর্ষবর্ধন তেমন ভরসা পান না ঃ 'আর নাই যদি বা মরি, কেবল হাত পা-ই হারাই—কিন্তু তা হারিয়ে অর্থলাভ করাটা কি একটা লাভ হোলো নাকি?'

'সেটা দৃষ্টিভঙ্গীর তারতম্য। যে যেমনটা দ্যাখে। কেউ টাকা উপায় করার জন্য সারা জীবন ব্যয় করে। কেউ বা জীবন রক্ষা করতে গিয়ে দু হাতে টাকা ওড়ায়।—যার যেমন অভিরুচি।'

'ইস্। ফেঁসে গিয়েছিলাম ত আরেকটু হলেই। ফাঁসিয়ে দিয়েছিল গাড়িটা। কী ভাগ্যি আপনার সঙ্গে দেখা হল আজ, আপনি বাঁচিয়ে দিলেন মশায়। আমাকেও আর—আমার টাকাকেও।'

'না, না, তাতে কী হয়েছে। আপনি ঘাবড়াবেন না। চাপবার জন্যে কি আর গাড়ি? তার জন্যে তো ট্যাক্সিই রয়েছে। রাস্তায় পা দিয়েই যদি ট্যাক্সি মিলে যায় তাহলে তার চেয়ে ভালো আর হয় না। আর তা সস্তাও ঢের। এধারে দেখুন এসব গাড়ির পেছনে খর্চাটা কি কম? ঠুনকো গাড়ি, পচা কলকব্জা, একটুতেই বিকল। আদ্ধেক দিন কারখানার গ্যারেজেই পড়ে থাকবে—তারপরে মেরামত হয়ে এলেও, দুদিনেই আবার যে কে সেই।'

'এমন গাড়িতে আমার কাজ নেই। এ গাড়ি আমি নেব না।'

'না না, নেবেন না কেন? বললাম না, চাপবার জন্য ত গাড়ি নয়, গাড়ি হচ্ছে বাড়ির শোভা, বাড়ির ইজ্জৎ বাড়াবার। বাড়ির সামনে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকলে পাড়া-পড়শীর কাছে মান বেড়ে যায় কতো।'

'আমার গিন্নীও সেই কথা বলেন বটে। বলেন যে, একটা গাড়ি নেই বলে পাড়া-পড়শীর কাছে মুখ দেখানো যাচ্ছে না।'

'ঠিকই বলেন তিনি। বাড়ি গাড়ি এসব ত লোককে দেখানোর জন্যেই মশাই! দেখে যাতে পাড়ার সবার চোখ টাটায়। তবে এ যা গাড়ি—চোখে আঙ্গুল দিয়ে তো দেখানো যাবে না পড়শীদের।' বলেন ভদ্রলোক ঃ 'তেমন করে দেখাতে গেলে তো তাদের চাপা দিয়ে দেখাতে হবে। নিদেন চাপা না দিলেও গা ঘেঁষে গিয়ে কি গায়ে কাদা ছিটিয়ে গেলেও চলে কিন্তু তাতো আর এ গাড়িতে সম্ভব হবে না। গাড়ি চালু হলে তবেই না কাদা ছিটোবার কথা! তবে হ্যাঁ, পড়শীদের কানে আঙুল দিয়ে দেখাতে পারেন বটে।'

'কানে আঙুল দিয়ে?' তিনি অবাক হন ঃ 'সে আবার কিরকম ধারা?'

'কেন, ঐ ঘচাং ঘচ্! ঐটা করতে পারেন আপনারা। ঐ ঘচাং ঘচ্।'

'ঘচাং ঘচ্?'

'হ্যাঁ। আপনারা চারজন আছেন বললেন না? কর্তা, গিন্নী, দেওর আর বাড়ির চাকর, চারজন ত রয়েছেন। বাড়ীর দেউড়িতে থাকবে তো গাড়ি, গাড়ির চার দরজায় আপনারা চারজন দাঁড়াবেন। তারপর ঐ ঘচাংঘচ।'

'ঘচাং ঘচ্ কী মশাই?' বারবার শুনে বিরক্ত হন হর্ষবর্ধন।

'আপনারা চারজনায় মিলে গাড়ির চারটে দরজা খুলুন আর লাগান—ঘণ্টায় ঘণ্টায়—ঘণ্টার পর ঘণ্টা। কেবল ঘচাং ঘচ—ঘচাং ঘচ...ঘচাং ঘচ...চলতে থাকুক পরম্পরায়! রীতিমতন কানে আঙুল দিয়ে টের পেতে হবে পড়শীদের...যে হ্যাঁ, গাড়ি একখানা আছে বটে পাড়ায়। চালান দিনভোর ঐ ঘচাংঘচ।'

'কিন্তু নাহক ঘচাংঘচ করাটা কি ভালো?'

'তাহলে ঘচাংঘচ-এর ফাঁকে ফাঁকে প্যাঁ পোঁ চালাবেন। তাও করতে পারেন ইচ্ছে করলে।'

'প্যাঁ পোঁ?' একটু যেন ভড়কেই যান তিনি।

'হ্যাঁ, প্যাঁ পোঁ। গাড়ির সবকিছু বাজে হলেও ওর হর্নটা কিন্তু নিখুঁত। সেটাও বেশ বাজে। মাঝে মাঝে তাই বাজান। চলুক ঐ প্যাঁ পোঁ আর ঘচাংঘচ!'

'দূর মশাই ঘচাং ঘচ্! আমি এক্ষুণি চললাম অর্ডার ক্যানসেল করতে—অমন ঘচাংঘচে গাড়ি আমার চাই নে।'

চুল না ছেঁটেই তীর বেগে বেরিয়ে পড়লেন হর্ষবর্ধন। গাড়ি খারিজ করে দিয়ে বাড়ি ফিরলেন তারপর।

● চোখের ওপর ভোজবাজি

হাসির ফোয়ারা

'না গিন্নী! ঘচাংঘচ করা পোষাল না আমার পক্ষে।'

বলে বাড়ি ফিরে গিন্নীর কাছে পাড়তে গেছেন গাড়ির কথাটা, তিনি তো বাড়ি তোলপাড় করে তুললেন। কর্তার বোকামির বহর মাপতে না পেরে কিছু আর তিনি বাকী রাখলেন না তাঁর।

দূর মশাই ঘচাং ঘচ্। আমি এক্ষুণি চললাম অর্ডার ক্যানসেল করতে— [পৃষ্ঠা ১৪৭

বৌয়ের বকুনি খেয়ে আজ সকালেই আবার তিনি মুখ চুন করে গেছেন সেই এজেন্টের কাছে—'গাড়িটা চাই মশাই। আমি মত পালটেছি আমার।'

'গাড়ি আর কোথায়! আপনি অর্ডার ক্যানসেল করে যাবার পর যিনি দু নম্বরে ছিলেন—আপনার ঠিক পরেই ছিলেন যিনি—পেয়ে গেছেন গাড়িটা। ঐ যে তিনি ডেলিভারি নিয়ে বেরিয়ে আসছেন এখন।' তিনি দেখিয়ে দেন—'তবে যদি বলেন, আপনার নাম আমি দ্বিতীয় স্থানে রাখতে পারি অতঃপর। এর পরের পর যে গাড়ি আসবে সেইটা আপনি পাবেন। ফের আবার তিন বছরের ধাক্কা হয়ত।'

হর্ষবর্ধনের চোখের ওপর দিয়ে প্যাঁ পোঁ করতে করতে চলে গেল গাড়িটা। তাঁর মুখ দিয়ে বেরুতে শোনা যায় শুধু—'সেই ভদ্রলোক দেখছি! সালুনের আলাপি কালকের সেই ঘচাংঘচ্......!

অদ্বিতীয় সেই ভদ্রলোককে দেখে আপন মনেই তিনি খচ্‌খচ্ করেন।

শনিবারের ট্রামে যা ভিড়! প্রাণকেষ্ট যদিও বুদ্ধি খরচ করে অণুকে আসতে বলেছিল, আপিস-ফেরতা এক সঙ্গে ফিরবে, কিন্তু তার ফলে একটুও সুবিধে হোলো না, মেয়ে সঙ্গীর খাতিরে মহিলা আসনে বসবার পাসপোর্ট পেল না, অকৃত্রিম মেয়েদের দ্বারাই তা প্রায় ভরতি হয়েছিল। একটু পরেই অবশ্য একটি মেয়ে উঠে যেতেই প্রাণকেষ্ট অণিমার পাশে বসতে পেল।

"আঃ, বাঁচলাম!" হাঁপ ছেড়ে বলল সে ঃ "লোকে যে বলে পরের ওপর নির্ভর কোরো না, মানুষ হতে চাও তো নিজের পায়ে দাঁড়াও,—তার কি কোনো মানে হয়? বাব্বাঃ যা ভিড়! এর মধ্যে পরের পা আলাদা রাখি কি করে? পরের পায়ে না দাঁড়ানো কি সোজা ব্যাপার রে দাদা? বলে, কত লোক আমার পায়েই দাঁড়িয়ে গেল মজা করে—তার কি করছি?"

"কী বলছো?" প্রাণকেষ্টর স্বগতোক্তি অণু ঠিক শুনতে পায় না।

"এই ভিড়ের কথাই বলছিলাম। গাদাগাদির মধ্যে দাঁড়িয়ে ঘেমে নেয়ে প্রাণ যায়। ইস্, যতবার রুমাল বার করার চেষ্টা করছি অন্যের পকেটে হাত ঢুকে যাচ্ছে।"

"কী বলছ?" অণু জিজ্ঞেস করে।

"সত্যি ভারি অদ্ভুত কান্ড, সেই কথাই বলছি।" প্রাণকেষ্ট বলে।

হাসির ফোয়ারা

"কী বললে?" অণু জানতে চায়ঃ "কিসের অদ্ভুত কাণ্ড?"

যেমন ভিড়—তেমনি গোলমাল ট্রামে। ভালো করে কিছু শোনাও যায় না।

"এই পরের পকেটে হস্তক্ষেপ করা—ইচ্ছে এবং প্রয়োজন না থাকলেও। যারা পকেট মারতে ভালবাসে তারাও বোধহয় এমন ঠাসাঠাসি পছন্দ করবে না। এ ধরনের গায়ে পড়া ভিড় তাদেরও নিশ্চয় দমিয়ে দেয়—আমি হলপ করে বলতে পারি।"

"তুমিই জানো।" অণুর একবাক্যে সায়।

"এক মিনিট অন্তর ট্রাম থামছে, কেনই বা থামছে কে জানে! একজনেরও তো নামবার নাম দেখিনে, সতের জন করে ঢুকছে তার ওপর। ঢুকছে তো, কিন্তু কোথায় যে সেঁধুচ্ছে তা খোদাই জানেন!"

ট্রাম এবং ট্রামযাত্রী—উভয়ের গতিবিধির ব্যাপারে প্রাণকেষ্টকে ভারী খাপ্পা দেখা যায়।

"কোথায় সেঁধুচ্ছে আমি কি তা জানতে চেয়েছি?" অণুর বেখাপ্পা প্রশ্ন।

কিন্তু অণুর ঐ ধরনের প্রশ্ন প্রাণকেষ্টকে নিরুত্তর করে দেয়! ওর সমস্ত উন্মুখরতা যেন অভাবিত তুষারপাতে অকস্মাৎ জমে আসে। প্রাণকেষ্ট চুপ করে থাকে। সামনের আসনের লম্বাপানা এক ছোকরার ঘাড়ের দিকে অণু একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে।

"দেখেছ?" অণু যুবকটির ঘাড়ের দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায়।

"দেখেছি। কালীঘাটে নিয়ে গিয়ে কোপ দেবার মতোন বটে।" প্রাণকেষ্ট দস্তুরমতন কোপান্বিত।

"দেখে আমার মনে পড়ল।" অণু জানায়ঃ "ভালো করে তাকিয়ে দ্যাখো না!"

"কী দেখব?" প্রাণকেষ্টর বিষদৃষ্টি দেখা যায়—"দেখছি তো, দেখবার কী আছে?" অনুরোধের উত্তরে অনুযোগ না করে সে পারে না।

"ভদ্রলোকের কানদুটো—একটু অদ্ভুত নয় কি? লক্ষ্য করেচ?"

"স্‌স্‌স্‌—! চুপ্‌! শুনতে পাবেন ভদ্রলোক।"

ভালো করে তাকিয়ে দেখলে ভদ্রলোকের হাতলদুটি বেশ একটু বেমানান বলেই বোধ হয় বটে, পঠদ্দশায় দারুণ গুরুমশাই-সুলভ হওয়ার দরুন কিনা বলা কঠিন। রাম-শ্যাম-যদুরা যে ধরনের কান সচরাচর ব্যবহার করে, এ দুটি তার চেয়ে একটু বড় মাপের। এতাদৃশ লম্বা-চৌড়া কানের বোঝা ঘাড়ে বয়ে বেড়ানোর কোনো মানে হয় না, সে কথা ঠিক, কিন্তু কান তো এখন অবধি মানুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তির মধ্যেই সাব্যস্ত? কানের ওপরে সরকার তো এখনো কোনো ট্যাকসো বসাননি। যদিও অদূর ভবিষ্যতে বসাবেন কিনা এখনকার দিনে সেকথা জোর করে বলা যায় না; তাহলেও, কানকেষ্টর দিকে তাকিয়ে প্রাণকেষ্ট, দৃশ্যটির যতই খুঁৎ থাক্‌, খুঁৎ খুঁৎ করার কোনো কারণ খুঁজে পায় না।

"দেখে কী মনে হচ্ছে তোমার?" জিজ্ঞেস করে অণিমা।

"কী মনে হবে?" প্রাণকেষ্ট বলে। "মনে হওয়া-হওয়ির কী আছে?"

"রবিবারের খবরের কাগজের একটা ছবির কথা আমার মনে পড়ছে,"—অণু ব্যক্ত করে। "কিসের ছবি বলো দেখি?"

"আমি কি করে জানবো?"

"খরগোশের।" খবর দেয় অণু।

"খরগোশ?"

"এখন এই ভদ্রলোকের কান দেখে মনে পড়ল। কিন্তু তখনিই, সেই ছবি দেখেই আমি এঁচে রেখেছিলাম, কয়েকটা খরগোশ আমাদের—চাইই—না হলেই নয়।"

"তাই নাকি?" প্রাণকেষ্ট হাঁপ ছাড়ে।

খরগোশের ছানা পোষার—এখন থেকেই ছাঁপোষা হবার কিছুমাত্র উৎসাহ যে ওর নেই, এই কথাই প্রাণকেষ্ট প্রতিবাদ-ছলে বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু নামবার জায়গা এসে পড়ায় তাকে থামতে হোলো। কিন্তু নামবার পরেও অণু থামল না। বাড়ি অবধি সারা পথ খরগোশের রূপগুণের ব্যাখ্যা করতে করতে চলল।

প্রাণকেষ্ট চুপ করে চলেছে, কথা বাড়ায় নি। কী থেকে কিসে গড়ায়, কিছুর কি ঠিক আছে? রবিবারের কাগজ থেকে ভদ্রলোকের কান, তার থেকে খরগোশের দোকান, আবার তার থেকে এখন কোথায় এসে হাজির! এক্ষুণি আবার খরমুজ পেলেই হয়তো খরগোশকে ভুলে যাবে।

কিন্তু পরের রবিবারে অণুদের বাড়ি গিয়েই চোখে পড়ল খাঁচার মধ্যে আনকোরা একজোড়া খরগোশ! আর অণুর উৎসাহ দ্যাখে কে?

উত্তেজিত অণু একতলার থেকে টানতে টানতে চিলকোঠায় খরগোশের খাঁচার কাছে তাকে ধরে নিয়ে যায়।

"এই—এই! করচ কি? জামা ছিঁড়ে যাবে যে!" প্রাণকেষ্ট বিব্রত হয়ে পড়ে। কিন্তু অণুর কোনো হুঁশ নেই। কে বলছে আর কেই বা শোনে?

"আহা দেখেচ! কী সুন্দর, দ্যাখো দ্যাখো!" অণু দেখতে দেখতে উছলে উঠে : "তোমার সারা জীবনে এমন একজোড়া দেখেচো কখনো? আমি তো দেখিনি।"

প্রাণকেষ্ট যে কখনো দ্যাখেনি, তা মিথ্যে নয়। ওরা যে দর্শনীয়ের মধ্যে গণ্য তাও কখনো তার মনে হয়নি।

"মাত্র বারো টাকা সাড়ে ছ আনা!" অণু বলতে থাকে : "কেবল তাতেই খরগোশ দুটো আমায় দিয়ে দিল অমনি। অমনি ছাড়া কি? বারো টাকা সাড়ে ছ' আনা কি একটা দাম নাকি আবার?—কেমন, লাভ করিনি খুব? এখন, বলো দেখি, এদের দুজনের মধ্যে কাকে তোমার পছন্দ?"

অগত্যা, বারো টাকা সাড়ে ছ' আনার বাহুল্যে বিনামূল্যে প্রাপ্ত খরগোশদের সম্মুখে একটা বালতি উপুড় করে প্রাণকেষ্টকে বসতে হল।

"বড্ড ছেলেমানুষ। এখনো কোনো জ্ঞানবুদ্ধি হয়নি এদের।" অণু বাৎলায়।

"তা বটে! সংসারকে চিনতে শেখেনি এখনো।" প্রাণকেষ্ট বলে ঃ "তা বেশ, এখন যখন আমাদের পরিচয় হয়ে গেল তখন আর আলাপ জমতে দেরি কি? তুমি গিয়ে রান্নাঘরের খবর নাও গে, আমি ততক্ষণ দেখি এদের।"

"কী দেখবে শুনি?" প্রাণকেষ্টর বলার ধরনে ওর খটকা লাগে।

"মানে, সংসারকে এদের চেনানো যায় কি না দেখা যাক।"

"তার অর্থ?"

"তার অর্থ অচিরে স্যাণ্ডউইচের মধ্যেই টের পাবে।"

"য়্যাঁ—য়্যাঁ—কী বললে?" আর্তনাদ করে ওঠে অণিমা।

"কী হোলো?" অণুর চিৎকারে সেও চমকে ওঠে। "হোলো কি?"

"কী বললে তুমি? তুমি—য়্যাতো নিষ্ঠুর হতে পারো? এই ননীর পুতুলি দুটোকে—প্রাণ ধরে—উঃ, তুমি কী নিষ্ঠুর! উঃ!" অণু ওর বেশী আর এগোতে পারে না।

এমন একজোড়া দেখেচো কখনো? [পৃষ্ঠা ১৫১

"অতো কেন ভাবছো তুমি? আমি এমন করে কাজ সারবো যে ওরা টেরটিও পাবে না। একটুও লাগবে না ওদের।" প্রাণকেষ্ট আশ্বাস দেয় ঃ "তুমি নির্ভয়ে আমার হাতে ছেড়ে যেতে পারো।"

"ছেড়ে যাবো? তোমার হাতে?" অণু গজরে ওঠে। "আর আমার চোখের আড়ালে তুমি ওদের ধরে খুন করবে? ইস্! কি করে যে তুমি বলতে পারলে আমি অবাক হয়ে তাই ভাবছি।"

"কিন্তু—"

"এক্ষুণি তুমি আমার চোখের সামনে থেকে সরে যাও। চলে যাও। এ জীবনে আর আমি তোমার মুখ দেখব না।"

"একথা মন্দ নয়।" প্রাণকেষ্ট বললে ঃ "কিন্তু দেখো, যেন একলা মুখে তুলো না। ওদের অন্ত্যেষ্টির দিনে আমি যেন খবরটা পাই। শ্রাদ্ধের ভোজে বাদ যাইনে যেন।"

"আশ্চর্য! কি করে যে ভাবতে পারো।" অণু গালে হাত দিয়ে ভাবে ঃ "ওদের আমি প্রাণ ধরে কখনো গালে হাত পুরতে পারি, একথাটা ভাবাই যে ভয়ানক। ওদের আমি কতো ভালোবাসি তা তুমি জানো? ওদের এক গরাস মুখে তুলতে গেলে দুঃখে আমার বুক ফেটে যাবে।" বলতে বলতে ওর চোখে জল এসে পড়ে।

জল প্রাণকেষ্টরও এসেছিল, তবে চোখে নয়, অন্যত্র। জিভের জলাঞ্জলি দিয়ে খরগোশ-স্যাণ্ডউইচের স্বপ্ন দেখছিল সে। কিন্তু জিনিসটা এমন, স্বপ্নে ঠিক দেখা যায় না—চেখে দেখলেই ঠিক হয়।

কয়েক রবিবার কেটে গেছে তারপর। অণু আর একদিন প্রাণকেষ্টকে নিতে এসেছে আপিস থেকে।

"একি! গলায় তোমার এটা কিগো? এ যে মহারানীর মতো সেজে এসেছ!" অণুর পারিপাট্যে প্রাণকেষ্ট চমৎকৃত।

"এ তো আমার গত বছরের লেডিজ কোটটা, তুমি ধরতে পারছো না? কেবল এর কলারের কাছটা চামড়া দিয়ে বাঁধিয়ে নিয়েছি—কিসের চামড়া বলো দেখি?" অণু জিগ্যেস করে। —"চামড়া নয় ঠিক, ফারই বলতে হয়।"

"কি করে বলবো? হরিণের চামড়া হয়তো! তাই না?"

"হোলো না, হোলো না। হরিণের কি এত সুন্দর আর এমন লম্বা লম্বা রোঁয়া হয়? হরিণকে আর এমন চামড়া পেতে হয় না।"

হরিণের না হলে বাঘ, ভাল্লুক, গণ্ডার—আর কার হতে পারে প্রাণকেষ্ট ঠাওর পায় না। তার নিজের চামড়া যে নয়, এইটুকু জেনেই সে আপ্যায়িত।

"আমার......আমার সেই—আমার সেই খরগোশের"......অণু আস্তে আস্তে ভাঙে।

"য়্যাঁ? তুমি—তুমি বলেছিলে না যে—"

"বলেছিলাম ঠিক। বলেছিলাম যে ওদের আমি ভয়ংকর ভালোবাসি। সে কথা আমার মিথ্যে নয়।" অণুর গলার স্বর গাঢ় হয়ে আসে ঃ "তাইতো ওদের স্মৃতিচিহ্ন আমার বুকের

ওপর জড়িয়ে রাখলাম। কোনোদিন কি ওদের কথা আর আমি ভুলতে পারব—তুমি ভাবো? আহা, কী মিষ্টিই যে ছিল ওরা!"

"য়্যাঁ—চেখেও দেখছো নাকি?" প্রাণকেষ্ট অবাক আরো ঃ "কেবল গলদেশেই নয়, গলার তলদেশেও ঠাঁই দিয়েছো তাদের?"

"পাগল? তা কখনো পারা যায়? এতোদিন ধরে এতো ভালোবাসাবাসির পর? আমি কি মানুষখেকো নাকি? বলেছি না যে, ওদের এক গ্রাসও আমি মুখে তুলতে পারব না? পারলামও না। মা খুব ভালো করেই রেঁধেছিলেন—কী চমৎকার গন্ধ যে বেরিয়েছিল! কিন্তু মুখে তুলতে গিয়ে আমার চোখে জল এসে গেল।"

"আহা, বেচারীরা!" প্রাণকেষ্টর দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে। ভালোবাসা এমনই মারাত্মক যে, তার ছোঁয়াচ পাত্রাপাত্র বিচার করে না। প্রায় বসন্তর মতই ছোঁয়াচে ব্যারাম—বলতে কি!

"পাশের বাড়ির মেয়েটি আমার বন্ধু। তাকে ডেকে এনে খাইয়ে দিলাম। তার খরগোশের চামড়ার কোটটা দেখেই জামার আইডিয়াটা আমার মাথায় খেলল কি না?"

ফিরিওয়ালার অত্যাচারে ফেরারীই হতে হয় বুঝি। কলকাতার দাক্ষিণাত্য—বালিগঞ্জে এসেও নিস্তার নেই। উত্তরাপথে যাদের শুধু হাঁকডাকই শোনা যেত—রকম বেরকমের স্বরে আর ব্যঞ্জনায় এবং তাতেই ত্রাহি ত্রাহি ছিল, এখানে তারা ভদ্রবেশ ধরে বাড়ির ভেতরে এসে হানা দেয়। উপরচড়াও হয়ে হামলা করে। ঝামেলা বাধায়।

দূরের বিকটাসুররা এখানে নিকট। কানের আওতার আরো কাছে। মূর্তিমান হয়ে চোখের সামনে আরো চোখা হয়ে হাজির। চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন করে নিজমূর্তিতে প্রকট—এখানে তাদের ক্যান্‌ভাসাররূপ। এবং এখানেও তারা তেমনি মুহুর্মুহু। আর তদ্রূপ দয়ামায়াহীন। চোখাচোখি হলেই মুখোমুখি এবং—তারপরে, হয়তো বা হাতাহাতি কাণ্ডই এক! খবরের কাগজের ওপরে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে প্রাণকেষ্ট। "কী পড়চ এত?" জিজ্ঞেস করল অণিমা।

"একটা নতুন খবর—"

"নতুন খবর? কী এমন নতুন খবর শুনি?"

"একজন লোক বিজ্ঞাপন দিয়েছে—"

"বিজ্ঞাপন?" অণিমার নির্মল মুখে বিকার দেখা গেল ঃ "বিজ্ঞাপন কি একটা খবর নাকি আবার?"

"তাহলে কি খবর—তোমার ঐ যুদ্ধ? সে তো কালকেও যা বেরিয়েছে আজকেও তাই—আবার কালপরশুও সেই একই খবর পাবে অবিকল। তারিখ-পালটানা একটানা একঘেয়ে ব্যাপার—তার মধ্যে নতুনত্ব কী আছে? ওকেই বরং বিজ্ঞাপন বলতে পারো। ওর চেয়ে বিজ্ঞাপনের ভেতর অনেক নতুন খবর থাকে—অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় জানা যায়—তা জানো? তাছাড়া, পড়তেও বেশ লাগে।"

হাসির ফোয়ারা

"তোমার মাথা! তোমার মত বোকাদের ঠকাবার জন্যেই বিজ্ঞাপনের ফাঁদ পাতা হয়, তা বোঝো? বিজ্ঞাপনের কথায় ভুলে তোমরা যাতে—"

"যা পড়ছিলাম সেটা সেরকমের বিজ্ঞাপন না। খুব দরকারী—অবশ্যজ্ঞাতব্য একটা খবর। প্রত্যেক গৃহস্থেরই নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস। ইঁদুর ধরবার আশ্চর্য এক কল—"

"ইঁদুর নয়, তোমাকে ধরবার জন্য।" অণু বাধা দিল ঃ "বেছে বেছে আমাদের এই ধেড়ে ইঁদুরটিকে ধরবার এক কল বের করেছে তা কি আর আমি জানিনে?"

প্রাণকেষ্ট মুষড়ে পড়ে। একটা ইঁদুরের চেয়েও ওকে বেশী ম্রিয়মান দেখা যায়।

সেই মুহূর্তে বাইরের কড়াটা নড়ে উঠল হঠাৎ। কড়া আওয়াজ শোনা গেল দরজার।

একটু কর্কশধ্বনি করেই দরজাটা দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছে। এবং তার উন্মুক্ত পথে প্রবেশ লাভ করে অত্যন্ত পরিচিতের মতো আপ্যায়িত-করা-হাসি হেসে—অণিমাকে সম্বোধন করে এগিয়ে এসেছে এক অভিব্যক্তি।

"নমস্কার গিন্নীমা—"

"দরকার নেই। বলল অণিমা। সম্বোধনে প্রথমা হয়েই সে সম্বন্ধ চুকিয়ে দিতে চায়।

"নতুন ডিজাইনের ভালো ভালো—"

"নতুন ডিজাইনের ভালো ভালো—" তবুও সে লোকটা বলতে ছাড়ে না।

"কোনো দরকার নেই।" আরম্ভের সূচনাতেই তার আড়ম্বর থামাতে চায় অণু।

"খুব পছন্দসই কতকগুলো জিনিস এনেছিলাম বড়দি!" আদৌ দমবার পাত্র নয় আগন্তুক।

"একদম দরকার নেই—বলছিনে?" সেও যেমন মরীয়া অণিমারও তেমনি মারমূর্তি।

"যদি দেখতেন একবারটি দয়া করে। এমন সব জিনিস এত সস্তায় এর পরে আর পাবেন না।"

"পেতেও চাইনে। একেবারেই দরকার নেই আমাদের। তুমি অন্য বাড়ি দ্যাখো বাপু।" দৃঢ়স্বরে এই বলে অণু ততোধিক দৃঢ়তার সঙ্গে এগিয়ে, প্রায় মাছি তাড়ানোর মতই লোকটাকে ভাগিয়ে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে এল।

প্রাণকেষ্ট এতক্ষণ বিস্মিত নেত্রে অণিমার ক্রিয়াকলাপ দেখছিল। ওর শক্তিমত্তায় একটু ঈর্ষাও বোধ করছিল বুঝি। সপ্রশংস গলায় সে গলে পড়ল এবার ঃ

"তুমি বাহাদুর বটে অণু!"

"ওদের সঙ্গে এ ছাড়া আর কোনো ব্যাভার নেই। ও পাড়ায় কেবল কানের মাথা খেতো—এ পাড়ায় ভোল বদলে চোখে ধুলো দিতে আসে!"

"বলেছ ঠিক। কিন্তু আমি বোধ হয় অতটা কাঠোর হতে পারতুম না।"

"তাই তো ভুলিয়ে ভালিয়ে যত রাজ্যের ভ্যাজাল সব গছিয়ে যায় তোমায়। সেদিন এমন এক মুগো কিনলে"—ক্ষোভে অণিমার গলা বুজে আসে।

বাস্তবিক, সে দুঃখ ফুরোবার নয়। আড়াই টাকা গজের মুগা, এক আধ গজ নয়—পুরো একটি থান—একটা ধোপেই ছোলা হয়ে এলো। কাপড়ের সর্বাঙ্গে চাকা চাকা গুটি বেরিয়ে গেল—এমন চাকচিক্য যে, তার দিকে তাকানোই যায় না। গুটিদার বসন্ত-লাঞ্ছন সেই বুটিদার চেহারা দেখলে তাক লাগে। তার শার্ট পরে প্রাণকেষ্ট বাড়ির বাইরে বেরুতে পারে না, আর ব্লাউজ গায়ে দিয়ে ঘরের মধ্যেও অণিমা লজ্জায় ঘেমে ওঠে।

"মুগার কথা আর বোলো না।" প্রাণকেষ্ট সকাতরে বলে।

মুগার কথা আর বলে না অণিমা। এখন আর বলে না। আপাততর মতন ক্ষান্ত দেয়।

"আমি সেলাইটা শেষ করিগে। তুমি ততক্ষণ বসে বসে কাগজ পড়বে তো এখানে? আবার যদি কোনো হতভাগা এখানে মরতে আসে ফের—ফেরি করতে আসে কিছু, হাঁকিয়ে দিতে দেরি কোরো না। বুঝেছ?"

প্রাণকেষ্টও বুঝেছে, আর তার একটু পরেই বোঝা হাতে আর একজনা হাজির।

"আপনার বন্ধু চৌধুরী মশাইয়ের কাছ থেকে আসচি। আপনি—আপনিই কি—?"

"হ্যাঁ, আমিই শ্রীপ্রাণকেষ্ট পতিতুণ্ডি। আমার বন্ধু চৌধুরী মশাই?—" প্রাণকেষ্ট একটু বিস্মিত হয়েই বন্ধুবর চৌধুরী মশাইকে স্মরণ করার চেষ্টা করে। "কে—চৌধুরী মশাই?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। তিনিই আমাকে আপনার খবর দিলেন। বললেন আমার বন্ধুর উপকারটাও তাহলে করুন, এই কথা বললেন তিনি।"

উপকারের কথা শুনে বন্ধুকে স্মরণ করার দুশ্চেষ্টা প্রাণকেষ্ট ছেড়ে দিল ঃ "কী? কিসের উপকার?"

হাসির ফোয়ারা

"আজ্ঞে, চেহারার উপকার। সেটাই কি কম কথা? আজকের দিনে অন্যান্য নানান সমস্যার ন্যায় চেহারা ভালো রাখাও কি একটা দায় হয়ে দাঁড়ায় নি মশাই?"

"তাই নাকি?" অবাক হয়ে গেল প্রাণকেষ্ট। নতুনতর কথা শুনে।

"মুখের থেকেই শুরু করুন না। দাড়ি যে ভালো চেহারার একটা বিরাট অন্তরায়, এটা তো আপনি মানবেন? অথচ নিয়মিতভাবে না কামালে দাড়ি আপনার থেকেই বাড়বে, বাড়বে না কি?"

"বাড়বে বই কি!" সায় দেয় প্রাণকেষ্ট: "টাকা না কামালে বাড়ে না কিন্তু দাড়ি না কামাতেই বাড়ে।"

"ঠিক বলেছেন।" লোকটি বলে: "কিন্তু দাড়ি তো কামাবেন, কিন্তু নিয়মিতভাবে কামাতে হলে ব্লেড চাই। এই যুদ্ধের বাজারে সেই ব্লেড পাচ্ছেন কোথায়?"

"পাচ্ছি না তো! কামাচ্ছিও না।" প্রাণকেষ্ট নিজের দাড়িতে হাত বুলিয়ে দেখালো। হাতে হাতেই প্রমাণ!

"তা তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু দেখে কোনো সুখ নেই। দাড়ি কেবল মুনি ঋষিদেরই শোভা পায় মশাই! আর স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের শোভা পেত।

আমাদের ব্লেডের দ্বারা কামাতে আরম্ভ করুন!

আপনি কি ঋষিত্ব পেতে চান? না, রবীন্দ্রনাথের মতন কবি হবার অভিলাষী?"

"না, না, কক্ষনো না, কক্ষনো না।" প্রাণকেষ্টর ভীষণ আপত্তি দেখা যায়।

"তবে? তবে এই দাড়ি কেন? আমাদের ব্লেডের দ্বারা কামাতে আরম্ভ করুন। কামিয়ে ফেলুন পত্রপাঠ। এ-ব্লেডে যাঁরাই কামিয়েছেন তাঁরাই কিরূপ আরাম পেয়েছেন নিজমুখেই তার

গুণগান করে গেছেন। মুক্তকণ্ঠেই স্বীকার করেছেন, এমন কি, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত। তাঁদের প্রশংসাপত্র আপনি দেখতে চান?"

"আপনাদের ব্লেড, তার মানে?" প্রাণকেষ্ট বাধা দিয়ে জানতে চায়।

"আমাদের তৈরি স্বদেশী ব্লেড। আপনার বন্ধু চৌধুরী মশায়ের ধারণা, নিয়মিত দাড়ি না কামিয়ে আপনি ভারী বদ্‌খৎ হয়ে গেছেন। অবিলম্বেই কামানো আপনার পক্ষে নাকি অত্যাবশ্যক। আর, এই ব্লেড ব্যাভার করলে আপনি অতিশয় উপকার লাভ করবেন! এইজন্যেই তিনি আমাকে আপনার ঠিকানা দিলেন। আমাদের এই ব্লেড—বাজারে এর তুলনা নেই।"

"কিন্তু না কামিয়ে তো আমার কোনো কষ্ট হচ্ছে না।" প্রাণকেষ্ট জানায়।

"কষ্ট আমাদের। কষ্ট চৌধুরী মহাশয়ের। আপনার বন্ধুবান্ধবদের কষ্ট। মানে, যাঁদের আপনার মুখদর্শন করতে হয়—উঠতে বসতে আপনাকে দেখতে হয়ে থাকে—"

প্রাণকেষ্ট আর সহ্য করতে পারে না, তাড়াতাড়ি বলে ঃ "আচ্ছা, দাও তাহলে এক ডজন, দিয়ে তাড়াতাড়ি পালিয়ে যাও। গিন্নী এসে পড়তে পারে।"

বেশি বলতে হয় না। বারোখানা ব্লেড, প্রত্যেকটা আট আনা হিসেবে ৬৲ টাকা, কেবল চৌধুরী মশায়ের খাতিরে ১৲ টাকা কমে, নামমাত্র পাঁচ টাকা দামে দান করে ব্লেড সরবরাহকারী চক্ষের পলকে সরে পড়ে।

'পাঁচ পাঁচটা টাকা, জলে ঠিক নয়, দাড়িতে ফেলে দিলাম! অণু কী বলবে কে জানে!' অণুমাত্র ভাবনায় ভাবিত প্রাণকেষ্টকে বিচলিত হতে হয়। নাঃ—এই বাইরের ঘরে বসে থাকলেই বিপদ। এক্ষুণি কোন্ মজুমদার মহাশয়ের প্রেরিত কে আবার এসে পড়বে হয়তো। মজা করে আর কিছু গছিয়ে আরো কিছু খসিয়ে নিয়ে যাবে। তার চেয়ে বিছানায় গিয়ে লম্বা হয়ে খবরের কাগজ নিয়ে শুয়ে পড়াই শ্রেয়ঃ। ফিরিওয়ালা সামলানো সহজ কর্ম নয়, সবার কম্মো না, অণুই পারে কেবল, আর, যার কর্ম তাকেই সাজে, অন্য সবার পক্ষে তা সাজা ছাড়া আর কিছুই নয়কো।

প্রাণকেষ্ট লোকটার পেছনে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে ফিরতেই অণুর মুখোমুখি পড়ে যায়।

"উঃ, লোকটাকে ভাগাতে এত সময় লাগলো তোমার? তবু তাড়াতে পেরেচ যে তাই রক্ষে! তোমাদের কথা শেষ হচ্ছে না দেখে ভাবলাম, লোকটা বুঝি তোমাকে শেষ করেই যাবে। তাই সাত তাড়াতাড়ি...কি...ও কি—...হ্যাঁগা...লুকোচ্চো কি তুমি? তোমার হাতে ও কি গা?"

"ওঃ...অণু! আমি ভেবেছিলাম সেলাই করতে করতে তুমি বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছ!" অপরাধীর সুরে বোকার মতো প্রাণকেষ্ট শুরু করে।

"কী কিনেচ দেখি।" অণু এগিয়ে আসে। প্রসঙ্গান্তরে যাবার বিন্দুমাত্র উৎসাহ দেখা যায় না তার।

"কী আবার কিনব! এই সামান্য—এই ক'খানা ব্লেড—লোকটা বলল, এর দ্বারা আমার

চেহারার নাকি যারপরনাই উন্নতি হবে। বিলিতি ব্লেড তো আজকাল মিলচে না বাজারে সেই বিবেচনায় দামও খুব বেশী নয়—এক ডজন পাঁচ টাকা মাত্র।"

"মাত্র পাঁচ টাকা?" অণুর কণ্ঠস্বর মাত্রা ছাড়িয়ে যায় বুঝি। "পাঁচ টাকা...মাত্র? এধারে খেটে খেটে আমার হাড় কালি হয়ে গেল, পুরনো ব্লাউজ সেলাই করে জোড়াতালি মেরে পরতে হচ্চে আমায়, গয়লার দুধের দাম বাকী, লাইফ ইন্সিওরের টাকা দেয়া হয়নি—আর তুমি কিনা এদিকে মনের সুখে নিজের চেহারা বাগাচ্ছো? বলি কে দেখবে তোমায় শুনি? পাঁচ পাঁচ টাকা জলে দিয়ে ময়ূরপুচ্ছ কাক না সাজলে শোভার খোলতাই হচ্ছিল না তোমার?"

এহেন ঝাপটার সামনে প্রাণকেষ্ট দাঁড়াতে পারে না আর। বলতে পারে না, পুচ্ছসংগ্রহ নয়, পুচ্ছকে তাড়িয়ে তুচ্ছ করতেই চেয়েছিল ও। বাড়ি ছেড়ে তাড়াতাড়ি সে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে।

প্রাণকেষ্ট চলে গেলে অণু হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকে খানিকক্ষণ। তারপর গাল থেকে হাত নামিয়ে সেলাইয়ে হস্তক্ষেপ করতে যাচ্ছে এমন সময়ে প্রাণকেষ্ট-পরিত্যক্ত মুক্তদ্বারপথে আরেক-জনের আবির্ভাব হল।

আরেক আনকোরা লোক। আজকের সুপ্রভাতের তৃতীয় আরেক প্রাদুর্ভাব! লম্বা মিশকালো ছুঁচোলো গোঁফওয়ালা একজন।

"আমাদের কিছু কেনবার দরকার নেই।" অণু জানায়। প্রথম দর্শনেই জানিয়ে দেয়।

"আপনি ভুল করছেন। আমি কোনো জিনিস বেচতে আসিনি। আপনি...আপনিই কি শ্রীমতী পতিতুণ্ডি, আমার ভুল হচ্ছে না বোধ হয়?" সেই তৃতীয় ব্যক্তির প্রশ্ন শোনা যায়।

"হ্যাঁ!" বেচারাম নয় জেনেও বেচারার ওপর অণুর অণুমাত্র সহানুভূতি জাগে না।

"আমি আপিস থেকে আসচি। অ্যাটর্নির আপিস থেকে। আপনার ঠাকুরদার ভাই—মানে, আপনার খুড়তুত ঠাকুরদা—হরিমোহন রায়কে আপনার মনে আছে নিশ্চয়ই? প্রাতঃস্মরণীয় লোক ছিলেন তিনি। তাঁর সাম্প্রতিক পরলোক গমনের সংবাদ আপনাদের কানে এখনো পৌঁছয়নি বলেই মনে হচ্ছে!"

"কই না—আমি—আমরা তো কিছু শুনিনি।"

"তাকে এখন ভালো করে আপনার মনে পড়ে না বোধ হয়?

"সত্যি বলতে আমি ঠিক ঠাওর করতে পারছিনে।"

"আশ্চর্য নয়! এমন কি, মনে পড়াটাই আশ্চর্য। আপনার অতি শৈশবে হয়ত আপনার জন্মাবার আগেই, তিনি বর্মায় চলে যান। সেখানে কাঠের ব্যবসা ফেঁদে বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হয়েছিলেন—সেই সম্পত্তির সমস্তই—প্রায় দেড় লক্ষ টাকা—উইল করে আপনাকে তিনি দিয়ে গেছেন!"

অণুর পরমাণুতে গিয়ে যেন ধাক্কা লাগে—বিদ্যুৎ-ঝলকের মতই তীক্ষ্ন—তীব্র আঘাতটা! আর সঙ্গে সঙ্গেই তার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়—

"ও—হ্যাঁ। মনে পড়েছে বটে। আমার হরিদাদুর কথা একটু একটু মনে পড়ে বৈকি! বাবাকেই বলতে শুনেছি কতোবার। আমাকে তিনি বড্ড ভালোবাসতেন নাকি!"

"বর্মাতে তিনি দেহ রাখলেও তাঁর নগদ টাকার অধিকাংশই তাঁর কলকাতার ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে দিতে পেরেছিলেন—জাপানীরা আসবার আগেই। এই যা রক্ষে! যাতে বেশী হাঙ্গামা না করে টাকাটা আপনার হাতে পড়ে, তার সব ব্যবস্থাই আমাদের আপিস থেকে করা হবে। আমরাই তাঁর একমাত্র অ্যাটর্নি ছিলাম—আর আপনিই তো তাঁর পরিত্যক্ত সম্পত্তির একমাত্র ওয়ারিশ তাঁর উইলের মর্ম থেকে যদ্দুর জানা গেছে। এখন আপনাকে করতে হবে কি, এই ডকুমেণ্টে টিকিটের উপর একটা সই করে দিতে হবে এবং দিন কয়েকের মধ্যে আমাদের আপিসে আপনাকে যেতে হবে একবারটি। রেজেস্ট্রী আপিসে যাবার প্রয়োজন হবে কিনা। আশা করি, আপনার খুব অসুবিধা হবে না এর জন্যে?"

"না—না অসুবিধা কি? এ তো খুব সুখের কথাই!" অণু সই করবার জন্যে তৈরি।

"হ্যাঁ, এইখানে।—দেখি, বাঃ, দিব্যি সই হয়েছে। এইবার রেজেস্ট্রী করার স্ট্যাম্পো খরচা বাবদ কুড়ি টাকা আপনাকে দিতে হবে। আর এক টাকা মুহুরি ফি, সই করার সাথে সাথে ওটা দেয়—জানেন বোধ হয়?"

"তা আর জানিনে? নিশ্চয় জানি।" অণিমা এক গাল হেসে জানায়ঃ "অ্যাটর্নি ফি মুহুরির দস্তুরি এসব যে দিতে হয় তা কে না জানে?"

"তাহলে টাকাটা একটু তাড়াতাড়ি—" ভদ্রলোকের তাড়া দেখা যায়।

অণু হেসে বলে, "এক্ষুণি আমি এনে দিচ্ছি আপনাকে। বসুন। যাতে রেজেস্ট্রী করার হাঙ্গামাগুলো চটপট চুকে যায়, আপনাদের আপিস থেকে আশা করি দয়া করে সেটা—"

"না না, এতে দয়া করাকরির কী আছে? আমাদের কর্তব্যই হোলো এই। রামের সম্পত্তি শ্যামকে দেওয়া, এই তো আমাদের কাজ! আপনাকে দেড়লক্ষ টাকা ধরে দিতে আমাদের কোন দুঃখ নেই, যত শীঘ্র দিতে পারি ততই ভালো। কেবল আমাদের অফিসিয়াল প্রাপ্য একুশ টাকা নিয়েই আমরা খুশী।"

"না না, এ কথা কেন বলছেন? পরে আপনাদের আমি আরও খুশি করে দেব।" অণু বাধা দিয়ে বলে।

ভদ্রলোক কিন্তু ততোধিক বাধা দেন ঃ "না না, অমন কথা বলবেন না। অন্যায় হবে। বেআইনি কোনো অর্থ নিতে আমরা একান্ত অপারগ জানবেন। ভগবানের দয়ায় আইনমতই আমরা যা পেয়ে থাকি, চুরি ডাকাতি রাহাজানি করেও তার বেশী পাওয়া যায় না।"

"আপনি একটু দাঁড়ান, টাকাটা আমি নিয়ে আসিগে।"

অণুর অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণকেষ্টর অনুপ্রবেশ ঘটে। সে প্রস্তুত হয়েই ফিরেছে এবার। এর পর অদূর ভবিষ্যতে কোনো একটা ফেরিওয়ালাকে ফের একবার বাড়ির চৌহদ্দীর ভেতর পেলে হয়। তাকে উচিত মতো শিক্ষা দিতে এক মুহূর্ত তার বিলম্ব হবে না।

আর মেঘ না চাইতেই জল! দরজা ঠেলে ঢুকতেই আস্ত একজন মূর্তিমানকে দণ্ডায়মান দেখা যায়। ভদ্রবেশী ফেরিওয়ালা ছাড়া আর কী?

"মাপ করতে হবে মশাই! দয়া করে সরে পড়ুন দিকি। আমার কিংবা আমার পত্নীর পার্থিব বা অপার্থিব কোন পদার্থে বিন্দুমাত্র আসক্তি নেই। আপনাকে সাফ কথা বলে দিচ্ছি শুনুন!" এই বলে সেই ছদ্মবেশী ফেরিওয়ালাকে সে সাফ করতে যায়।

"আপনিই বোধ হয় শ্রীপ্রাণকেষ্ট পাতিতুণ্ডি! তাই না?"

তাড়া খেয়েও ভদ্রলোক খাড়া থাকেন।

"ঠিক তাই। আমার নামের প্রতি আপনার এমন অকারণ মোহ কেন তা তো আমি ঠিক ঠাওর করতে পারছি না এবং সেটা আমি ভালো-ও বোধ করছি না। এই দণ্ডেই এখান থেকে চলে যেতে আপনাকে আমি সবিনয়ে সানুনয় অনুরোধ জানাই।"

হ্যাঁ, এইখানে।—দেখি, বাঃ, দিব্যি সই হয়েছে। [পৃষ্ঠা ১৬০

"কিন্তু প্রাণকেষ্টবাবু, আপনার স্ত্রীর ঠাকুরদা—মানে—ঠাকুরদার ভাই—"

"ঠাকুরদার ভাই? ওরকম কোনো ভদ্রলোকের অস্তিত্বের কথা তো কোনোদিন শুনিনি আমার স্ত্রীর কাছে। আপনি দয়া করে আপনার পথ দেখবেন?" প্রাণকেষ্ট রেগেমেগে এগোয়।

"আপনার পত্নীর ঠাকুরদা ছিল না—আপনি বলচেন কী?"—তথাপি ভদ্রলোক বলতে চেষ্টা করেন।

"ঠিকই বলছি।" প্রাণকেষ্ট সোজাসুজি বলে ঃ "আমার পত্নীর তিন কুলে কেউ ছিল না, এবং আমারও নেই। আপনি স্বেচ্ছায় যাবেন, না কি, আমাকে বাধ্য হয়ে বলপ্রয়োগ করতে হবে?"

"আপনার ভাগ্য ফেরাতেই আমি এসেছিলাম,—কিন্তু আপনি ভুল বুঝে—" তাড়না লাভে ভদ্রলোক ভারী হতাশ হয়ে পড়েন শেষটায়।

"ভাগ্য ফেরাতে? চেহারা ফেরাতে নয়? আমার দুর্ভাগ্য!" প্রাণকেষ্ট আর অধিক বাক্যব্যয় না করে প্রাণপণ কঠোরতায় একরকম ধাক্কা দিতে দিতেই লোকটিকে দরজার বাইরে পাঠিয়ে দেয়। দিয়ে সদরে খিল এ'টে প্রত্যাবৃত্ত অণুর প্রতি সগর্বে সে ফিরে তাকায় ঃ "কেমন? কি রকম তাড়িয়ে দিলাম? আমি নাকি শক্ত হতে পারিনে? দেখলে তো এবার?"

"তাড়িয়ে দিলে? কী সর্বনাশ! করেছ কি তুমি?"

"কেন, কি করলাম আবার? একটা বাজে লোক ধাপ্পা মেরে আমাদের ভাগ্য বদলাতে এসেছিল—এক নম্বরের জোচ্চোর—কথা শুনলেই তো বোঝা যায়—"

"হায় হায়, কোথায় গেল, ঠিকানা-টিকানা কিছুই দিয়ে যায় নি যে!...আর কি ও ফিরবে?"

"যাতে আর না ফেরে—এ পথ না মাড়ায় আর—তার দাবাই দিয়ে দিয়েছি। যাকে বলে কাবুলি দাবাই—এইসা কসে এক গাঁট্টা লাগিয়েছি যে—!"

"তোমার ঘটে কি একফোঁটা বুদ্ধি হবে না কোনোদিন? আমার ঠাকুরদা—হরিদাদুর উইল—" অণু হায় হায় করে।

"হরিদাদুর উইল। উইলের কথা কি বলছগো?"

"দেড় লক্ষ টাকার বিষয়ের আমাকেই উত্তরাধিকারী করে গেছেন দাদু। তাঁর অ্যাটর্নি আপিসের কাগজপত্র নিয়ে এসেছিল লোকটা। সই করে একুশ টাকা দিতে হবে স্ট্যাম্প খরচা—অ্যাটর্নি ফি—না কি। আমি টাকা আনতে ওপরে গেছি আর তুমি এই ফাঁকে—"

অণুর ক্ষোভ দুঃখ রাগ সব এক সঙ্গে মিক্‌শ্চার হয়ে বেরয়—"ওঃ? কী সর্বনেশে লোক তুমি গো!"

প্রাণকেষ্ট হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

কিন্তু সেদিনকার প্রাতঃকালের সেই শেষ আগমনী নয়। তারপরে আরো একজন আসে। আরেকবার করাঘাত শোনা যায় দরজায়।

"ইস্! বোধ হয় সেই লোকটাই!"

অণু ছুটে গিয়ে খিল খোলে।

কিন্তু না। একজন পুলিসের লোক এবার।

"আপনাদের বিরক্ত করতে হচ্ছে বলে দুঃখিত।" আগন্তুক পুলিস কর্মচারী বলেন—"লম্বা কালো ছুঁচোলো গোঁফওয়ালা কোনো ভদ্রলোকের সঙ্গে কি একটু আগে দেখা হয়েছে আজ আপনাদের?"

"হ্যাঁ, এই মাত্রই তো তিনি চলে গেলেন! আমার ঠাকুরদার অনেক টাকা উনি আমাকে পাইয়ে দিতে এসেছিলেন"—বলতে গিয়ে অণু যেন কান্নায় ভেঙে পড়ে।

"কেবল আপনাকেই না। এই পাড়ায় আরো আটজন ভদ্রমহিলাকে তিনি রাজা করে দিতে এসেছিলেন। রাজা কিংবা রানী যাই বলুন। ললিতা দেবীকে গোলকুণ্ডার হীরার খনি দিয়ে গেছেন, যমুনা দেবীকে বিপুল জমিদারি,—তা আপনার উইলের টাকাটা কতো?"

অণু কিছু বলতে পারে না।

"স্ট্যাম্প খরচা কিংবা অ্যাটর্নি ফি বাবদে একুশটা টাকাও নিতে তিনি ভোলেননি আশা করি?" দারোগাবাবু শুধান।

"আজ্ঞে আমার একটু ভুলের জন্যেই টাকাটা ওঁকে ভুলতে হয়েছে।" প্রাণকেষ্টই অণুর হয়ে জবাবটা দিয়ে দেয়।

'নাঃ, বিজ্ঞাপনে কাজ হয় সত্যিই!'

হর্ষবর্ধন এসে ধপ করে বসলেন আমার ডেকচেয়ারে। হাঁফ ছেড়ে বললেন কথাটা।

'হ্যাঁ, কথাটা আপনার যেমন বিজ্ঞাপনসম্মত তেমনি বিজ্ঞানসম্মতও বটে।' বিজ্ঞজনের মতই তাঁর কথায় আমার সায়।

'সেদিন আপনাকে দিয়ে আনন্দবাজারে বার করার জন্যে সেই বিজ্ঞাপনটা লিখিয়ে নিয়ে গেলুম না?......'

'হ্যাঁ, মনে আছে আমার!' আমি বললাম ঃ 'রাতের পাহারাদের জন্যে লোক চাই—সেই ত?'

'আমাদের কাঠের কারখানায় রোজের বিক্রির বহুত টাকা পড়ে থাকে ক্যাশ বাক্সে, বাড়ি নিয়ে আসা সম্ভব হয় না, পরদিন সে টাকা সোজা গিয়ে জমা পড়ে ব্যাঙ্কে—সেই কারণে, রাত্রে টাকাটা আগলাবার জন্যেই কারখানায় থাকবার একজন সুদক্ষ লোক চেয়েছিলাম আমরা।...'

'রাতের চার প্রহর পাহারা দেবার জন্য সুদক্ষ এক প্রহরী। বেশ মনে আছে আমার।' আমি বলি ঃ 'আমিই ত লিখে দিলাম কপিটা। তা, কিছু ফল পেয়েছেন বিজ্ঞাপনটা দিয়ে?'

'পেয়েছি বইকি ফল। বলতে কি, সেই কথাটা জানাতেই ত আপনার কাছে ছুটে আসা।'

'ফল বলতে! গোবরাও এসেছিল দাদার সঙ্গে ঃ 'রীতিমতন প্রতিফল পাওয়া গেছে বলা যায়।'

হাসির ফোয়ারা

'কটা সাড়া এলো?' আমি শুধাই।

'আপাততঃ একটাই।' ওর দাদা বলেন ঃ 'ক্রমশঃ আরও সাড়া পাবো আশা করছি। আপাততঃ এই একটাই।'

'ওই একটাতেই সাড়া পড়ে গেছে।' সাড়া পাওয়া যায় গোবরারও!—'সাড়া পড়ে গেছে সারা চেতলায়।' সে জানায়।

'দু ইঞ্চি বিজ্ঞাপনের দরুন দুশো টাকা। তা নিক তাতে দুঃখ নেই। সেই দু ইঞ্চিরই বা দাম দেয় কে?'

'দু শো টাকার বিজ্ঞাপন দিলে অন্ততঃ তার দুশো গুণ লাভ ত হয়ই কারবারে—তা নইলে লোকে দেয় কেন?'

'এখানেও বেশ লাভ হয়েছে লোকটার। দুশো গুণেরও ঢের বেশী।'

'প্রায় ছয়শো গুণ—তাই না দাদা?' হিসেব করে বলে ভাইটি ঃ 'ষাট হাজার টাকার মতই ছিল না বাক্সটায়?'

আশি হাজার টাকা হ'লে কত হয়?

'প্রায় আশি হাজারের কাছাকাছি। বিলকুল ফাঁক!'

'আশি হাজার টাকা হলে কত হয়?' গোবরা আঙুল দিয়ে আকাশের গায় পারসেণ্টেজের আঁক কষতে লাগে।

আমার সামান্য বুদ্ধির আঁকশি দিয়ে ওদের হিসেবের নাগাল পাই না—'বিলকুল ফাঁক! তার মানে?' শুধাই দাদাকে।

'মানে কাল সকালের কাগজে বিজ্ঞাপনটা বেরুল না আমাদের? আর কাল রাত্তিরেই কারখানায় সিঁধ কেটে চোর ঢুকে সমস্ত টাকা নিয়ে সরে পড়েছে। আজ কারখানা খুলতে গিয়ে দেখি ক্যাশবাক্স ভাঙা।'

'অ্যাঁ?' আঁতকে উঠি আমি : 'তা, খবর দিয়েছেন পুলিসে?'

'পুলিসে খবর দিয়ে কী হবে? আমাদেরই পাকড়ে নিয়ে যাবে থানায়। এইসা টানা হ্যাঁচড়া লাগাবে যে বাপ বাপ ডাক ছাড়তে হবে। এখন নিজেদের কারবার দেখব না থানা-পুলিস করব?' বলেন হর্ষবর্ধন : 'আর চোর যা ধরবে ওরা, তা আমার জানা আছে বিলক্ষণ!'

'আমি ধরতে পারি চোর।' বলল গোবরা : 'তা দাদা আমায় ধরতেই দিচ্ছে না।'

'হ্যাঁ বললেই হোলো চোর ধরবো! ওদের কাছে ছোরা-ছুরি থাকে না? ধরতে গেলেই ছুরি বসিয়ে দেবে ঘ্যাচাং করে! ভুঁড়ি ফাঁসিয়ে দেবে এক কথায়। ওর মতন নাবালক একটা ছোঁড়াকে আমি ছুরির মুখে ঠেলে দেব—আপনি বলছেন?'

'কি করে বলি!' বলতে হয় আমায় : 'ওসব ছোরাছুরির ব্যাপারে আমাদের বয়স্কদের না থাকাই ভালো।'

'আমি কিন্তু অক্লেশে ধরে দিতাম। কোনো ছোরাছুরির মধ্যে না গিয়েও—স্রেফ গোয়েন্দাগিরি করেই।'

'কি করে ধরতিস?'

'ঐ মাটি ধরেই।'

'ও! মাটিতে বুঝি পায়ের ছাপ পড়েছে চোরের?' আমি কৌতূহলী হই : 'কারখানার মাটিতে পায়ের দাগ রেখে গেছে চোররা?' কবরখানা খুঁড়ে গেছে নিজের?'

'দাগ না ছাই!' মুখ বিকৃত করেন হর্ষবর্ধন : 'সিগ্রেটের ছাইও ফেলে যায়নি একটুক্। কী নিয়ে গোয়েন্দাগিরি করবি শুনি?'

'কারখানার মাটি নয়, সেই মাটি। বলে না যে—যে-মাটিতে পড়ে লোক ওঠে তাই ধরে? সেই মাটি ধরেই আমি চোর ধরব।' ফাঁস করে গোবরা। 'বিজ্ঞাপনটা দিয়ে মাটি হয়েছে ত! ঐ মাটি দিয়েই আমার কাজ হাসিল করব আমি।' হাসিখুশি হয়ে সে জানায়।

ওর রহস্যের আমি থই পাই না। এমন কি ওর দাদাও থ হয়ে থাকেন।

'হ্যাঁ চোর ধরবে গোবর!' বলে তিনি উসকে উঠলেন একটু পরেই : 'তাহলে...তাহলে তখন ধরলো না কেন? এর আগেও ত জিনিস চুরি গেছল আমাদের।'

'এর আগেও গেছে আবার?'

'হ্যাঁ আমিই তো চুরি গেছলাম।' হর্ষবর্ধন ব্যক্ত করেন।

'তোমার জিনিস নাকি?' প্রতিবাদ করে গোবরা : 'বৌদির জিনিস না তুমি? তুমি কি তোমার নিজের জিনিস—নিজস্ব?'

'ওই হোলো।' বলে ফোঁস করলেন দাদা : 'কেন তুইও কি চুরি যাসনি আমার সঙ্গে? তুই ত আমার জিনিস। আমি তোর অভিভাবক না? তখন চোর ধরতে কী হয়েছিল তোর?'

'তারপর? চোরের হাত থেকে উদ্ধার পেলেন কি করে?' আমি জিজ্ঞেস করি।

'যেমন করে পায় মানুষ।' তিনি জানান ঃ 'চুরির ধন বাটপাড়িতে যায় শোনেননি? **তারপর চোরের হাত** থেকে বাটপাড়ের হাতে গিয়ে পড়লাম আমরা।'

'বটে বটে?' আমার সকৌতুক কৌতূহল ঃ 'তা শেষ মেষ উদ্ধার পেলেন ত? পেতেই **হবে** উদ্ধার শেষপর্যন্ত। গোয়েন্দাকাহিনীর দস্তুর। তা উদ্ধার করল কেটা?'

'ডাকাত এসে পড়ল শেষটায়। ডাকাত আসতে দেখেই না বাটপাড় ব্যাটা ভোঁদৌড়!'

'ডাকাত এসে পড়ল আবার তার ওপর?'

'হ্যাঁ, ওর বৌদি বাপের বাড়ি থেকে ফিরে যেই না দোরগোড়ায় এসে হাঁক ডাক শুরু করেছে তাই না শুনে নীচে উঁকি মেরে দেখেই না, সেই বাটপাড়টা সঙ্গে সঙ্গে উধাও! খিড়কির দোর দিয়ে সটাং!...বৌ না তো ডাকাত!'

'আমার ডাকসাইটে বৌদির নামে যাতা বলো না, বলে দিচ্ছি।' গোসা হয় গোবর্ধনের।

'ওই হোলো! তোর কাছে যা ডাকসাইটে আমার কাছে তাই ডাকাত-সাইটে।'

'যেতে দিন।' পারিবারিক কলহের মাঝখানে পড়ে আমি মিটিয়ে দিই ঃ 'আপনাদের চুরি যাওয়ার কাহিনীটা বলবেন ত আমায়। সেবারকার আপনাদের যুদ্ধে যাওয়ার গল্পটা বলেছিলেন, তাই লিখে দু পয়সা পিটেছিলাম, এবারও এটার থেকেও...'

'বলব আপনাকে এক সময়। কারখানার জন্য এখন একটা লোহার সিন্দুক কিনতে যাচ্ছি। চোর বাবাজী আবার ঘুরে এলেও সেটা ভাঙা আর সহজ হবে না তার পক্ষে এবার।'

পরদিন সকালে শ্রীমান গোবর্ধন এসে হাজির। 'দেখুন এই বিজ্ঞাপনটা দিতে যাচ্ছি আজ আনন্দবাজারে, দেখুন ত ঠিক হয়েছে কিনা?'

গোবর্ধন তার কালজয়ী সাহিত্যকীর্তিটি আমার হাতে দেয়।

বিজ্ঞাপনের কপিটিতে ওদের চেতলার বাসার ঠিকানা দিয়ে লেখা আছে দেখলাম—'প্রাইভেট ডিটেকটিভ আবশ্যক। আমাদের বাড়ির একটি ঘরে বহুমূল্য তৈজসপত্র রক্ষিত আছে, সেই ঘরের গা-লাগাও একটা জলের পাইপ উঠে গেছে সোজা উপরে—সেই নল বেয়ে কেউ যাতে না উঠতে পারে সেই দিকে সারা রাত্রি নজর রাখার জন্য বিচক্ষণ এক গোয়েন্দার প্রয়োজন। উপযুক্ত পারিশ্রমিক।'

'বুঝেছি। জলে যেমন জল বাধে' আমি ঘাড় নাড়লাম, 'তেমনি বিজ্ঞাপনটা দিয়ে ঐ রকম আরেকটা কান্ড বাধাবে তুমি দেখছি। চোরটা যেই পাইপ বেয়ে উঠবে আর তোমার ঐ ডিটেকটিভ গিয়ে হাতে নাতে পাকড়াবে তাকে। এই তো?'

'সে আপনি বুঝবেন না। সেসব আপনার মাথায় খ্যালে না।' বলে চলে গেল গোবরা।

দিনকয়েক বাদে একটা লোক এসে ডাকছে আমায়—'আসুন আসুন। চটপট চলে আসুন আমার সঙ্গে।'

অপরিচিত আহ্বানে আমি থতমত খাই—'আপনি...আপনাকে তো আমি...।'

'চিনতে পারছেন না আমাকে? ছদ্মবেশে রয়েছি কিনা,' বলে লোকটা তার গোঁফদাড়ি খুলে ফ্যালে।

হাসির ফোয়ারা

'ওমা! গোবরা ভায়া যে! এমন অদ্ভুত বেশ কেন হে?—এর মানে?'

'চোর ধরতে যাচ্ছি না? ডিটেকটিভকে ছদ্মবেশে ঘোরাফেরা করতে হয় না তো? আপনার জন্যেও একজোড়া দাড়িগোঁফ এনেছি, পরে নিন চট্ করে...'

আপনার জন্যও একজোড়া দাড়িগোঁফ এনেছি।

'আমি, আমি আবার পরব কেন?'

'আপনাকেও ছদ্মবেশ ধারণ করতে হবে না? আপনি আমার শাগরেদ তো এ যাত্রায়। ব্লেকের যেমন স্মিথ, বিমলের যেমন কুমার। তেমনি আমার সহযোগী গোয়েন্দা যখন তখন আপনাকেও ত...'

'তুমি পরলেই হবে। আমাকে আর পরতে হবে না ছদ্মবেশ।' বললাম আমি ঃ 'দাড়িওয়ালা লোকের ছায়া আমি মাড়াই নে, জানে সবাই। তোমার সঙ্গে ঘুরলে কেউ আর আমায় আমি বলে সন্দেহ করবে না।'

'তাহলে চলে আসুন চটপট। এই ফাঁকে চেতলার বাজারটা ঘুরে আসি একবার।' বলল সে ঃ 'দাদাও আবার বাজার করতে বেরিয়েছেন কিনা এখন। পাছে আমায় চিনতে পারেন, আমার ছদ্মবেশধারণের সেও একটা কারণ বটে—বুঝলেন?'

'বুঝেছি।' বলে বেরুলাম ওর সঙ্গে। বাজারের মুদীখানাগুলোর পাশ দিয়ে যাবার সময় হঠাৎ একটা লোককে জাপটে ধরে চেঁচিয়ে উঠেছে গোবরা—'ধরেছি—ধরেছি চোর। পাকড়েছি ব্যাটাকে। একটা পাহারোলা ডেকে আনুন তো এইবার।'

কোনই দোষ করেনি লোকটা। মুদীর সঙ্গে তেজপাতার দরকষাকষি করছিল কেবল, এমন সময় গোবরা ঝাঁপিয়ে পড়েছে তার ঘাড়ে। এমন খারাপ লাগল আমার!

লোকটা বাবারে মারে বলে হাঁক পাড়তে লাগল। আর গোবরাও দাদাগো! বৌদিগো! বলে চেঁচাতে থাকে।

হাসির ফোয়ারা

কাছেই কোথাও বুঝি বাজার করছিলেন দাদা। ভায়ের হাঁক-ডাকে এসে হাজির—'**কী** হয়েছে রে? এমন ষাঁড়ের মতন চিল্লাচ্ছিস কেন?'

'পাকড়েছি তোমার চোরকে—এই নাও। ধরো।'

লোকটা তখন হর্ষবর্ধনের পা জড়িয়ে ধরে—'দোহাই বাবু! আমাকে পুলিসে দেবেন না। দোহাই! সেদিন আমি দু বচ্ছর খেটে বেরিয়েছি এবার গেলে ছ-বচ্ছরের জন্য ঠেলে দেবে জেলে।'

'বেশ দেব না পুলিসে। বের করে দাও আমাদের মালপত্তর।' গোবরার তম্বি।

'সব বার করে দেব বাবু—চলুন!' সকৃতজ্ঞ লোকটা আমাদের সঙ্গে নিয়ে তার বস্তির কুঠুরীতে যায়। বের করে দেয় হর্ষবর্ধনের আশি হাজার টাকার নোটের বাণ্ডিল।

'আর আমার তৈজসপত্র? সেসব গেল কোথায়?'

গোবরার রোয়াব।

'ওই যে ওই কোণায় ধরা রয়েছে বাবু! নিয়ে যান দয়া করে।'

ঘরের কোণে দুটো বস্তা পাশাপাশি খাড়া-করা দেখলাম। এগিয়ে গিয়ে উঁকি মেরে দেখি ...

গিয়ে উঁকি মেরে দেখি......

দেখছি যে......এই কি তোমার......'

'তৈজসপত্র।' জানায় গোবর্ধন। 'তেজপাতাকে সাধু ভাষায় কী বলে তাহলে? তৈজসপত্র বলে না? লেখক মানুষ হয়ে আপনি বাংলাও জানেন না ছাই?'

'একি! খালি তেজপাতা দেখছি যে।'

অবাক করল গোবর্ধন! কী বলে ও? বাঙালী লেখক হতে হলে আবার বাংলা ভাষা জানতে হয় নাকি? আশ্চর্য!

মহা-পাকিস্থানের পথে

‘চল্‌তি ট্রামে কদাপি উঠো না।’—আধুনিক দশবিধ অনুশাসনের একটি। উক্ত বিধান উল্লম্ফন করতে গিয়ে হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছিলাম। এবং হাড়ভাঙা পরিশ্রমে গলা যে ভাঙবে, সে আর বেশী কি!

স্বাধীনতা-প্রাক্কালের কাহিনী—ভারত-বিভাগের আগেকার আনকোরা হাওড়া পুলের ওপর দিয়ে গঙ্গার শোভা দেখতে-দেখতে চলেছি। চলেছি পদব্রজেই।

পুল পেরিয়ে ট্রামখানাকে প্রায় হাতের নাগালেই পেয়ে গেলাম। আর সঙ্গে সঙ্গেই লাফিয়ে উঠেছি। ব্রজলীলার পরেই আমার সেই Rush লীলা!

ট্রাম-বোঝাই মানুষ, তবু ওরই মধ্যে গুঁতো-গুঁতি করে বসা গেল। ট্রামযাত্রা আর জীবনযাত্রা —দুই আজকাল কষ্টেসৃষ্টে চালাতে হয়। গা'সওয়া হয়ে গেছে।

অবশ্যি, হাওড়া পুলের কাছ থেকে চোরবাগান এমন কিছু দূর ছিল না, কিন্তু ট্রাম পেয়ে

গেলে কে আবার পায়ে হাঁটে? অন্ততঃ, তারপরে হাঁটবার আর তেমন জোর পাওয়া যায় না। ওজোরও থাকে না কোনো।

বড়বাজারের সম্মুখে এসে পড়তেই গাড়িসুদ্ধ সবাই সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠেছে। চিৎকারের গোড়ার দিকটা বোঝা গেল না ঠিক, তবে ব্যাপারটা বেশ নাড়া দেওয়া। লড়ায়ের তদ্‌বিরের মতই।

তাহলেও, ওর শেষাংশ আমার অশ্রুতপূর্ব নয়। চিৎকার-শেষটা হচ্ছে, "...আল্লা হো আক্‌বর!"

আমার জানা কথা। খিলাফৎওয়ালা প্রথম অসহযোগের যুগে গান্ধিজীর ভলান্টিয়ার হয়ে নিজেই কতো চেঁচিয়েছি!

চুপ করে আল্লার নামগান শুনছিলাম, হঠাৎ সামনের একজন আমাকে লক্ষ্য করল—

"কী হে! তুমি চেঁচাচ্ছো না যে?"

"আমি! আমি আবার কী চেঁচাবো?"

"বাহ্‌! জান্‌ কবুল করেছো, নিজের জান্‌ দেবে, আর আওয়াজ দিতে পারবে না? সে কী?"

ওর কথায়, ওর মতো অনেকেই কটমট করে আমার দিকে তাকালো।

কখন জান্‌ কবুল করলাম কিসের জন্যই বা করলাম তা ঠিক মনে না পড়লেও, জান্‌ নিয়ে যে নগ্‌দাই টান পড়তে পারে, তা জানাবার লোকের অভাব যে সেই ট্রামে নেই, তখনই মালুম হোলো।

"কী বলতে হবে?" সংকুচিত হয়ে শুধাই।

"আমরা যা বলছি তুমিও তাই বলবে।" আমার পাশের ছেলেটি আমাকে উদ্বুদ্ধ করে।

তারপর আমাদের মধ্যে (ক্রমাগত প্ররোচনায়) এই ধরনের বলাবলি হতে লাগল ঃ

"আমরা চাই—"

"পাকিস্থান।"

"আমরা চাই—"

"পাকিস্থান।"

"আমরা চাই—"

"পাকিস্থান।"

একজন প্রথম বাক্যটি উচ্চারণ করছে ; অপর দলের কেবল পাকিস্থান-ধ্বনি। কি করে যে ওরা নিজেদের মধ্যে এরূপ শ্রমবিভাগ করেছিল, সে রহস্য আমার অজানা। এবং অজানা বলেই পদে পদে আমার গোল বাধছিল। ওদের 'আমরা চাই' শুনে আমিও বলতে যাচ্ছিলাম—"আমরা চাই—" কিন্তু তখন আর সবাই আমরা চাই ছেড়ে দিয়ে পাকিস্থান নিয়ে পড়েছে।

যাই হোক্‌, এইভাবে বাক্যালাপ চলছে, এমন সময়ে "উহুঁ হুঁ, তুমি আবার চাইছো কেন হে?—" আমার পাশের ছেলেটি বাধা দিয়ে বল্লে।

"আমরা সবাই মিলে না চাইলে কি পাকিস্থান হবে?" আমি জানতে চাই।

হাসির ফোয়ারা

"তুমি শুধু বলো 'পাকিস্থান'—তাহলেই হবে।" ওরা অতো জনে মিলে চাইছে, ওর মতে, তাই না কি যথেষ্ট।

অগত্যা, জিনিসটা ঠিক হচ্ছে না, নিখুঁত তো নয়ই, মনে-প্রাণে জেনেও ওর কথামতো আমি কেবল পাকিস্থানের তাল সামলাতে লাগলাম।

যন্ত্র-চালিতের মত আর সব মন্ত্রোচ্চারকের সঙ্গে তাল দিচ্ছি। সবার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে ক্রমান্বয়ে পাক খেয়ে চলেছি—পাকিস্থান...পাকিস্থান...পাকিস্থান...

গলায় গলায় গলাগলি, এমন সময়ে শুনলাম, সারা ট্রামের সুর বদলেছে। পূর্ববক্তারাই উলটে পাকিস্থান আওড়াতে শুরু করেছেন, উত্তর-ভারতীরা কী উতোর গাইছেন বোঝা যাচ্ছে না ঠিক।

হঠাৎ এরকমের উলটো পাকে আমার তো বিপাক! তবু, ভদ্রলোকের এক কথা! আমি পাকিস্থানকেই আঁকড়ে রইলাম। (যার জন্য জান্ কবুল করেছি তাকে প্রাণপণে পাকড়ে থাকা এমন কিছু শক্ত নয়।)

"এই, তুমি পাকিস্থান বলছো কেন হে? পাকিস্থান তো আমরা বলছি।"

আমার সামনের আওয়াজদার আমাকে ধমক দিয়ে উঠলো, "পাকিস্থানের উপর পাকিস্থান—সে আবার কি?"

তাও তো বটে, সত্যি কথাই! পাকিস্থানের উপরে পাকিস্থান—বিপ্লবের উপর উপ-বিপ্লব কখনই সমর্থনযোগ্য নয়। আমি বল্লাম : "আমি তাহলে কী বলবো?"

"তোমার দলের সবাই কী বলছে শুনছো না? তাই বলো।"

ভালো করে কান পাতলাম এবার। পাশের ছেলেটি আমার কাছে ফাঁস করলো—ফিসফিস করে বললে।—"তুমি বলো কেবল জিন্নাবাদ।"

চললো তখন আরেক ধারার আর্তনাদ :

এবার ওরা : "পাকিস্থান—"

আর আমরা : "জিন্নাবাদ!"

ওরা : "পাকিস্থান—"

আমরা : "জিন্নাবাদ!"

ধারাবাহিক চালানো। বলতে কি, এই ধরনের বাদানুবাদে এতক্ষণে আমার বেশ উৎসাহ জাগছিল। এতগুলো ধারালো কণ্ঠের জিন্নাবাদ সত্যিই রোমাঞ্চ হবার মতই—জয়োল্লাস এমনই ছোঁয়াচে!

জিন্নাবাদ, বাস্তবিক! আমাদের কায়দে-আজম কাল আমাকে যা বেকায়দায় ফেলেছিলেন—

এই কালকেই তো আরেক পাকিস্থানি ধাক্কায় পড়েছিলাম। সালুনে কামাতে গেছি। ষণ্ডামার্কা গোছের একজন লোক কামাচ্ছিল আমায়।

● মহা-পাকিস্থানের পথে

হাসির ফোয়ারা

আধখানা গাল কামিয়ে গলার কাছাকাছি এসে—কামাতে কামাতেই—হঠাৎ সে জিজ্ঞেস করে বসল ঃ "পাকিস্থান সম্বন্ধে আপনার কী মত?"

"তোমরো যা আমারও তাই।" বল্লাম—অম্লানবদনে।

"আমার কী মত—আপনি জানলেন কি করে?"

তাকে যেন একটু অবাক্ দেখা যায়।

"জানিনে, তা ঠিক।" আমি জবাব দিলাম ঃ "কিন্তু ক্ষুরটা যে তোমার হাতে সেটা তো জানি।"

অদ্ভুত সেই সালুনওয়ালা—দাড়ি এবং পাকিস্থান এক ক্ষুরে কামাচ্ছে। দুটি বিভিন্ন রণক্ষেত্রে যুগপৎ লড়াই—ধন্য বটে!

মনে মনে সেই সালুনওয়ালাকে সাবাস্ দিচ্ছি আর মুখে মুখে আউড়ে চলেছি, হঠাৎ আমার খটকা লাগলো, সে কি, পাকিস্থান থেকে জিন্নাবাদটা কি রকম? পাকিস্থান তো জিন্না সাহেবেরই আবাদ। তাঁরই চাষ-করা আমদানি, এই তো জানি। তাহলে তাঁর নিজস্ব স্বত্ব থেকে তিনি বরবাদ কেন?

আমার সমস্যাটা পাশের ছেলেটির কানে গুজগুজ করতেই—

"জিন্নাবাদ কেন হে? জিন্দাবাদ তো!" সে ফোঁস করে উঠেচে। রীতিমত বিরক্ত হয়েই—বলতে কি!

আধখানা গাল কামিয়ে গলার কাছাকাছি এসে......
আপনার কি মত?

তাই নাকি? তাহলে তো আমি বেশ করছিলাম! এতক্ষণ ধরে জিন্না-সাহেবকেই বাদ দিচ্ছিলাম! অবশ্যি, আমার দোষ ছিল না। আমাদের গান্ধীবাদ থেকে যেমন গান্ধিজী বাদ, খৃষ্ট ধর্মে যেমন খৃষ্টানি আছে কিন্তু খৃষ্ট নেই, খাজা সার নাৎসিমুদ্দিন যেমন খাজা নন, নাৎসি নন, (এবং অসার নন), ফজ্লুল হক্ যেমন নিতান্তই নাহক্, তেমনি জিন্নাসাহেবের বাদ যাওয়াটা তেমন বিস্ময়কর ছিল না। মহাপুরুষরা শেষ পর্যন্ত প্রবাদ হবার জন্যেই জন্মান—কে

না জানে? তবে কি না, অতো বাদ সাদেও তাঁদের যা বাকী থাকে—বাতিল হবার পরেও তাঁদের যে তিলমাত্র—তার ঠ্যালাই কিছু কম নয়! তাতেই কুরুক্ষেত্র!

গলা ছড়াতে ছড়াতে চিত্তরঞ্জন এভিনিউর মোড়ে এসে পড়া গেল। আমার চোরবাগান এখান থেকেই শর্টকাট্। 'বাঁধকে বাঁধকে' বলে ট্রাম থেকে নামতে যাচ্ছি, আমার সহযাত্রীদের থেকে বাধা পেলাম সটকানোর পথে।

"এখানে কেন? এখানে নামছো যে?"

"এইখানেই তো!—" বল্লাম আমি।

"না না। এখানে নয়। পার্ক-সার্কাস্। আমরা সবাই সেখানেই চলেছি যে।" পাশের ছেলেটি আমার পিরান ধরে টান মারে।

পরানের চেয়েও পিরান আমার প্রিয়—এই বাজারে। সে-টান সামলাতে না পেরে বসে পড়লাম আমি—"বহুৎ খানা আছে।" ছেলেটি কানে কানে জানায়।

খানা আছে? খানার কথায় চাঙ্গা হয়ে উঠি তক্ষুণি। সে কথা বলতে হয়! তাহলে তো সার্কাস্ পর্যন্ত না যাওয়াটাই বোকামি। এতক্ষণ ধরে যা চেঁচিয়েছি তার কিছুটা তো উসুল হওয়া চাই। গলাটা ভেঙে খান্ খান্ হয়ে গেছে, এখন খানা-জাতীয়-কিছু সেখান দিয়ে না গড়ালে জোড়া লাগবে বলে মনে হয় না।

"আগে বলতে হয়।" তাকে বল্লাম। বলেই "পাকিস্থান জিন্দাবাদ!" বলে জোরালো এক আওয়াজ ছেড়ে দিলাম। ঘোষণাটা উদর থেকে উদিত হয়ে আগাপাশতলা ঠেলে আমার হৃদয় বিগলিত করে গলার দোনলা দিয়ে গলে এল, বলতে কি!

চেঁচাতে চেঁচাতে পাকিস্থানে এসে পেঁছালাম। পাকিস্থানের প্রায় সমস্তটাই পার্ক, মাঝখানে সার্কাস। পাকিস্থানীদের ভিড় নেহাত মন্দ নয়! আমাদের দলটিও তার একধারে গিয়ে ভিড়ে গেছে।

ঝাঁকের কই ঝাঁকে গিয়ে পড়লে যা হয়, ঠিক তেমনি মিশ্ খেয়েছি। দুটি গোরু বা দুজন ইয়াঙ্কিকে যেমন আলাদা করা যায় না, বিভিন্ন চীনেম্যানকে যেমন পৃথক্‌রূপে চিনে রাখা দায়, তেমনি পাকিস্থানীদের ভেতর আমার হিন্দুস্থানী ভ্যাজাল—খাঁটী ঘিয়ে সাপের চর্বির মতই—অবলীলায় মিলে মিশে গেছে। চেহারায় কিংবা চালে আমাকে পাক্‌কা না বলে ধরে—কার চাচার সাধ্যি! জিন্না সাহেব যে আমাদের স্বতন্ত্র দুটি জাতি বলে সন্দেহ করেন, তা মিথ্যে নয়। একেবারে পাকি ওজনের, তার মধ্যে কোনো ফাঁকি বা চালাকি নেই।

তবে এটা আমার চেহারার গুণও হতে পারে। হয়তো এই ব্যক্তিগত গুণের জন্যেই আমার রূপের অভাবটা তেমন কারো নজরে পড়ে না হঠাৎ।

এই পেটেন্ট চেহারার মধ্যে এমন কিছু আছে যা সব স্থানেই খাপ খায়—এমন কি, এই পাকিস্থানেও বেখাপ্পা নয়। হয়তো আমার এই কপিরাইট-হীন প্যাটার্নটাই কারো সন্দিগ্ধ

ভ্রূ-কুঞ্চন না হবার একমাত্র কারণ। অবশ্যি, নিজমুখের এই মোগলাই কারিকুরির পক্ষে আমার নিজের কোনো বাহাদুরি আছে আমি মনে করি না। আমার বংশগত কোনো কৃতিত্বও নেই। কেন না, আমার পূর্ব-চক্রবর্তীদের মধ্যে কেউ মোগল ছিলেন বলে আমার জানা নেই—এইদিক থেকে বহুৎ পাকিস্থানীর সঙ্গে আমার অদ্ভুত মিল।

আদিম এবং অকৃত্রিম চক্রবর্তীদের আর্যাবর্তের বাসিন্দা বলেই আমি জানি। তাঁদের সেই আদিনিবাস থেকে সুদীর্ঘ পথ দেশকালক্রমে টক্কর খেতে খেতে অবশেষে এই সুতানুটিতে এসে পেঁাছোনো—একটানা দীর্ঘসূত্রীতার ইতিহাস। আর্যাবর্ত থেকে পূর্বপাকিস্থান—এতটা পথব্যাপী কার্যের আবর্ত বড় কম ছিল না, পথে দাক্ষিণাত্যও পড়েছে, এবং আত্মায় দাক্ষিণ্য আর দেশে দেশে কলত্রাণি থাকলে যা হয়, আর্যদের বর্তমানেও ভালো মানুষরা ভার্যার আবর্তে পড়তে পারেন! চলার আনন্দে, অপচয়ের অনুপাতের সঙ্গে পাল্লা রেখে সঞ্চয়ের বোঝা তাঁরা বাড়িয়ে গিয়েছেন—চলার ফুর্তির সাথে—যাকে বলে ফুর্তির চাল! সমস্ত চালের মোট—সে-ই সঞ্চিত কর্মফল আমাদের উত্তরাধিকার। ফলতঃ, এই সব কারণে হেথায় আর্য হেথা অনার্য এট্‌সেট্‌রা যদি ভিড় করে এক দেহে এসে লীন হয়ে থাকে এবং এই চেহারার মধ্যে মোগলাই আর পাটনাই, মঙ্গোলীয় এবং দ্রাবিড়িয়, চেক্‌ এবং উজবেক, হট্টমালা আর হাওয়াই—সবাই মিলে খাপ খেয়ে খাপ্‌সুরৎ ঠিক না হলেও কেমন যেন হনলুলুমার্কা হয়ে গেছে বলে বোধ হয়, তার জন্য আর যেই হোক্‌, আমি নিশ্চয় দায়ী নই মশাই?

এবং এ বিষয়ে যে পাকিস্থানীদের ঈর্ষা করব, তারও বিশেষ যো ছিল না। নাম গোত্রে বহু হলেও আকৃতিতে তাঁরা হুবহু—এবং আমার সঙ্গে একাকার! অবশ্যি, তারা আমাদের চেয়েও আরো পশ্চিমের, খোদ্‌ আরব মুল্লুকের আমদানি। (আরব্য-উপন্যাসে আমি অবিশ্বাস করিনে।) কিন্তু হলে কি হবে, এ দেশের জল-হাওয়ার এমনি গুণ, এমুল্লুকে এলে কালের ঘূর্ণীপাকে সমস্তই জলাঞ্জলি—ঘুণ লেগে আসলটাই হাওয়া!

আশ্চর্য বই কি! আমাদের সকলের চেহারায় এক ট্রেডমার্ক—তাকিয়ে দেখলে তাক্‌ লাগে। আগেকার দিনে ট্রেড ইউনিয়ন ছিল না একথা যাঁরা বলেন, এবং এর পরেও হয়ত হলফ করে বলবেন, তাঁদের মতবাদের আমরা যেন মূর্তিমান প্রতিবাদ। বেশ বোঝা যায়, আরব্যের থেকে রপ্তানির পর, এ দেশের নানান খপ্পরে পড়ে একই ধারায় রপ্ত হতে হতে অবশেষে তাঁরাও সেই একইরূপ পরাকাষ্ঠায় এসে পেঁাছেচেন। আসলে সেই এক রকমের পোড়াকাঠ।

দুটি স্বতন্ত্র নেশন্‌ হয়েও শেষ পর্যন্ত এই শোচনীয় একজাতীয়তা—উভয়ের এই এক কন্‌ডেম্‌নেশন, ভাবতে ভারী কষ্ট লাগে। এবং এজন্য, জনাব জিন্নার জন্য দুঃখ হয়, যথার্থই!

ভূগোল এবং ইতিহাসের কিরূপ বিজাতীয় চক্রান্ত, ভাবুন একবার!

ইতিমধ্যে আবার সেই আগেকার শোরগোল শোনা গেল। ট্রামে উঠতেই শোনা নাড়া-চাড়া

দেয়া সেই গগনভেদী আল্লাহো-আকবর-নিনাদ! আমার পার্শ্বর্তী ছেলেটির কাছে জয়ধ্বনিটার পুরোপুরি ভাষ্য জানতে চাইলাম।

তক্‌বির বলে কোন কথা নেই যদ্দুর আমি জানি।

"নারায়ে তক্‌বির...আল্লাহো আকবর।" সম্পূর্ণটা সে প্রকাশ করল।

"তক্‌বির নয়, তদ্‌বির।" আমি ওর ভ্রম সংশোধন করলাম : "তক্‌বির বলে কোনো কথা নেই, যদ্দুর আমি জানি। তবে তদ্‌বির হলেও হতে পারে, ও কথাটা আমার জানা। আমাকেও মাঝে মাঝে কতো রকমের তদ্‌বির করতে হয় তো!"

"তদ্‌বির নয়—তক্‌বির।" বেশ দৃঢ়তার সঙ্গেই সে বল্ল। আমার প্রুফ-কারেক্‌শন গ্রাহ্যই করল না।

"হতেই পারে না।" আমি বল্লাম : "বরং তক্‌দির বলো তো মানতে রাজি আছি। তক্‌দির মানে অদৃষ্টই বোধ হয়......কে জানে!"

বড় গলা করে বল্লেও তবু আমার কেমন সন্দেহ থেকে যায়। "না—কি, তুমি বলছো তস্‌বির? তস্‌বির বলেও একটা কথা আছে তার মানে ছবি।" আমার বিদ্যা জাহির করে একথাও আমি জানাই।

"তক্‌দিরও না তস্‌বিরও না। নারায়ে তক্‌বির।" তার সেই এক কথা। (ভারী একগুঁয়ে ছেলে বলতে আমি বাধ্য।)

"তক্‌বির মানে কী, শুনি তাহলে?" আমি জানতে চাই।

"তোমার মাথা।" তার জবাব আসে।

"জানো না, তাই বলো।" আমি বল্লাম ঃ "আল্লাহো আকবর, ভালো কথা। এবং তক্‌বিরও না হয় হোলো। তোমার কথাই মেনে নিলুম। কিন্তু এত নাড়ানাড়ি কিসের জন্য, বলো দেখি?" আমার আরেক প্রশ্ন।

"তোমার মুণ্ডু।"

একটার পর একটা ট্রামগাড়ি আসছে—ভিড়ছে এসে পার্ক সার্কাসে—পাকিস্থানীতে ঠাস্‌ বোঝাই। এক একটা ট্রামের পুরোভাগে—ড্রাইভারের সামনের পাদানি পর্যন্ত পাকিস্থানীরা খাড়া—সেই নামমাত্র জায়গায় দাঁড়িয়ে তারা হাত পা ছুড়ছে—"লড়কে লেঙ্গে পাকিস্থান!..." একরোখা লড়ায়ের ধারাবাহিক আস্ফালন।

আমি লক্ষ্য করে দেখলাম আগন্তুক ট্রামগুলির সম্মুখে কিছু নেই—কোনো জনমনিষ্যি না। মশা মাছি হয়ত থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু থাকলেও তারা আমার ক্ষুদ্র দৃষ্টির বাইরে ছিল।

"লোকগুলো হাওয়ার সঙ্গে লড়ছে বলে মনে হয়।" পাশের ছেলেটিকে বলতে আমি বাধ্য হলাম।

"না লড়লে কি পাকিস্থান মিলবে? লড়তে তো হবেই আমাদের?" বলতে গিয়ে ছেলেটির বুক ফুলে ওঠে!—"লড়েই তো নিতে হবে আজাদী।"

"তাহলে তো ইংরেজের সঙ্গেই লড়তে হয় আমাদের। আগে তার পাক খুললে তার পরে তো পাকিস্থান? আগে দেশ স্বাধীন—"

"উজবুকের মতো বকছো কেন? তুমি কি পাকিস্থানের বাসিন্দা না? পাকিস্থানের জন্য জান্‌ কবুল করোনি?" ছেলেটি আমাকে তিরস্কার করে।

পাকিস্থানের জন্য জান্‌ কবুল করেছি কি করিনি আমি ভেবে দেখি। একবার যেন খিলাফতের জন্য করেছিলাম স্মরণ হয়—অসহযোগের সময় দু একবার এক আধ মাসের জেল খেটেছি। ভারত কিংবা তুর্কী—কার জন্য এই কারাবরণ ঠিক না জানলেও, বন্দে মাতরমের সঙ্গে আল্লাহো আকবর ডাকতে ডাকতেই সেখানে যাওয়া গেছল মনে আছে বেশ।

তবে যদি আমি কোথাকার বাসিন্দা এই প্রশ্ন ওঠে, তাহলে সত্যি কথাই বলতে হবে। পাকিস্থানেই আমি থাকি। চোরবাগানের কাছাকাছি যেখানটায় আমার আস্তানা সেটাকে পাকিস্থানই বলা উচিত। এমন কি, কাঁচিস্থানও হয়ত বলা যায়—বললে অত্যুক্তি হয় না—তেমন চুল-চেরা খতিয়ে যদি দেখি ঃ চোরবাগান আর কলাবাগান যাবতীয় বিজাতীয়তা ভুলে যেখানে গলাধরাধরি করে এসে মিশেছে সেইখানে এক বস্তির পাশেই আমার এই শ্রাবস্তি! আমার আলাপী প্রায় সকলেরই সেখানে কাঁচির কাজ। পকেটের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে অমন উদারতার কাজ আর হয় না। আমার দোস্তরা খুব জবর লোক হলেও কোনো জবরদস্তি নেই—কলাবাগানের বাগানোর কলাই মর্ত্য-মানের চূড়ান্ত! শিল্পের সাক্ষাৎ প্রয়াগধাম—প্রয়োগে নৈপুণ্য আছে, কিন্তু ধুমধাম

নেই! খাঁটী আর্টিস্টের একনিষ্ঠ তপঃ-সাধনা তাদের। কোনো আওয়াজ কুচকাওয়াজ নেই, কোনো লড়ালড়ি কড়াকড়ি না। চুপচাপ খুচখাচ কাজ—খুচরো কারবার—কাঁচির কাজই বটে, কিন্তু কারুকাজ—মোটেই কাঁচা কাজ নয়।

পাশের ছেলেটি কোত্থেকে একটা পতাকা জুটিয়ে এনেছিল। অর্ধচন্দ্রলাঞ্ছিত সবুজ রঙের প্রকান্ড এক নিশান। ওই ধরনের আরো বহুত ঐ জনতার মধ্যে ছড়ানো ছিল, তবে এইটেই সবার চেয়ে লম্বা চওড়া। বাঁশের দিকে লম্বা আর পতাকার দিক থেকে চওড়া। এসে বলল, "এটাকে পাকড়াও।"

বলতে না বলতে তিন পাক ঘুরে পতাকাসমেত সেই পাকিস্থানের ওপরে আমি আছাড় খেলাম।

"আমি কি পারবো?" আমার সন্দেহ জাগে।

দ্বিধা হওয়া স্বাভাবিক। বাঁশটা বয়সে আমার চেয়ে বড়ো কি না জানিনে কিন্তু বেড়েছে বেআক্কেল রকম। লম্বায় আমার মাথা ছাড়িয়ে গেছে। প্রায় তিনতলা সমান উঁচু হবে। আমার দুর্বল দুই বাহু দিয়ে গগনচুম্বী এই নিশানাকে শানাতে পারবো বলে আমার মনে হয় না। আদাজল খেয়ে লাগলেও জিনিসটা জেয়াদা।

"এই ঝাণ্ডার জন্য জান্ কবুল করেছো আর একে ধরতে পারবে না? বাহ্!" ধমক্ খেতে হোলো ওর।

অগত্যা, ধরলাম—জান্ কবুল করেই। কিন্তু পারবো কেন? বাহুবল কোনোদিনই আমার তেমন নয়,—তথাপি, প্রাণপণে পতাকা আর টাল একসাথে সামলাতে লাগলাম।

"পতাকাটা হয়তো আমি রাখতে পারি কিন্তু এই বংশরক্ষা করাই আমার মুশকিল। তুমি যদি বাঁশটাকে আগলাও, তাহলে আমি না হয়—" বলতে না বলতে তিন পাক ঘুরে পতাকাসমেত সেই পাকিস্থানের ওপরে আমি এক আছাড় খেলাম।

ভাগ্যিস্, বাঁশটাকে সে পাকড়ে ফেলেছিল, নইলে অমন আছাড়ের উপরে উক্ত দণ্ডের মার খেতে হলে, পতাকার মতো আমারও লাঞ্ছনার অবধি থাকত না।

"আল্লা মেহেরবান্!" বলে আমি গা ঝাড়া দিয়ে উঠলাম।

"এখন আমি ধরছি," ছেলেটি বল্ল, "কিন্তু মিছিলের সময় তোমাকে এটা বয়ে নিয়ে যেতে হবে—সবার আগে আগে। বিশ জনে মিলে কাজ। মনে থাকে যেন।"

"বিস্‌মিল্লার মর্জি।" বলতে গিয়ে আমার সুদীর্ঘ নিশ্বাস পড়ল। সেই পতাকাবাহী মিছিল সারা কলকাতা ঘুরবে, আর সমস্ত দিনই আজ এই কাজ, একথাও জানা গেল, ছেলেটির শ্রীমুখ থেকে। তার উৎসাহ দেখবার মতো।

এদিকে আমার উদ্দীপনা কিন্তু নিভে এসেছে। আণবিক বোমার বিনা সাহায্যে, একমাত্র পতাকা দ্বারাই আমার হিরোশিমা রচিত হতে দেখি। খানায় লোভে এতদূর এসে আমার হিরোইজমের সীমান্তদশা এখন।

আমার গলার কাছটায় কী যেন ঠেলে ঠেলে ওঠে, ডাকছাড়া কান্নাই হবে হয়তো। 'পড়েছি মোগলের হাতে, খানা খেতে হবে সাথে।' কিন্তু যে-খানার লালসায় মোগলদের হাতে পড়া গেল তার তল্লাশ তো কোনো খানেই পাচ্ছি না। তা এক আধটু পেটে পড়লেও এই সময় বুকে বল পেতাম। কোথাও একটু খানাতল্লাশি করে দেখব নাকি?

কথাটা ছেলেটার কাছে পাড়তেই—"ওঃ, খানা? বলতে হয়! সেতো ওই—ঐখানে মিলছে বেরাদর!" বলে একটা ঘেরাটোপ দেয়া জায়গা দেখিয়ে দিল আমায়।

রসগোল্লা কিনে কুচি কুচি করে শিরনির সঙ্গে মিকচার করলাম।......তারপর তার একটুখানি মুখে তুলি। পৃঃ ১৮০

যেতেই প্রকাণ্ড এক প্লেট শিরনি পাওয়া গেল। একেবারে হাতে হাতে। হিন্দুস্থানের গোদুগ্ধে পাকিস্থানী চালের সিদ্ধিলাভ—দিব্য জমজমাট ব্যাপার। চেখে দেখলাম—বেশ খেতে। কিন্তু তাহলেও, পায়েস হলেও খুব আয়েস করে খাবার মতো না। আমার পাকিস্থানসুলভ জিভ নয় বলেই কিনা কে জানে, জিনিসটা তেমন শেন মিঠে হয়নি। ঘনীভূত দুধের স্বাদ মধুর হলেও, চিনির সাধ কি তাতে মেটে? এমন খাসা জিসিনটায় একেবারেই মিষ্টি

দেয়নি—দিলে এমন চোস্‌তো হোতো যে পাকিস্থানের জয়ধ্বনি দিয়ে আরো দু' পেয়ালা আমি চেয়ে নিয়ে খেতাম।

"আচ্ছা, আমি যদি নিজের পয়সায় সন্দেশ কিনে এই উম্‌দা চীজের সঙ্গে মিশিয়ে খাই, সেটা কি আমাদের ইস্‌লাম-বিরোধী কোনো কাজ হবে?" পায়েসদাতাকে আমি ভয়ে ভয়ে জিগ্যেস করি।—"যদি তা না হয়তো—" বিপন্ন ইস্‌লামকে নিজের হঠকারিতার দ্বারা আরো বেশী বিপন্ন করার আমার বাসনা ছিল না।

"তুম্‌হারা খুসী।" পরিবেশক আমায় তক্ষুণি ছাড়পত্র ঝাড়ে।

পার্ক পার হয়ে রাস্তার মোড়েই খাবারের দোকানটা। রসগোল্লা কিনে কুচি কুচি করে শিরনির সঙ্গে মিকচার করলাম—হিন্দু-মুসলমানের মধুর মিলন রচিত হোলো। তারপরে তার একটুখানি মুখে তুলি—আহা, এমন উপাদেয় আর হয় না! এমন মুখরোচক খানা খাইনি কখনো। রসগোল্লা এবং পায়েস আলাদা আলাদা খেয়েছি, ঢের ঢের, কিন্তু উভয়ের মিলনে-মিশ্রণে এমন একখানা—যাই বলুন আপনারা—যেন রসনায় মক্কা আর রসের মোক্ষ এক হয়ে—নবজীবনপ্রদ কোনো রসায়ন!

হিন্দুস্থান এবং পাকিস্থানের পাকা-দেখার খাওয়াই যেন,—তুলনাই হয় না! তার তার্‌ই আলাদা।...তারিয়ে তারিয়ে খাচ্ছি একটু একটু করে—চেখে চেখে। খাওয়া সারা করার কোনোই আমার তাড়া নেইকো।...

পার্কের সিংহদ্বার দিয়ে লম্বা এক মিছিল বেরিয়েছে। দেখছি দোকানের আড়ালে দাঁড়িয়ে! পায়েসের পেয়ালার পিছনে গাঢাকা দিয়ে।

প্রকাণ্ড শোভাযাত্রা। সবার মুখেই মুস্‌লিম লীগ্‌ জিন্দাবাদ! সবার আগে আগে সেই ছেলেটি—অভ্রভেদী পতাকা হাতে—উদ্দীপ্ত মুখ।

মিছিল বেরিয়ে গেলে আমি উঠলাম। কিছুদূর গেলাম পিছু পিছু। তারপরে ফিরলাম। এবার সোজা আমার কাঁচিস্থানের দিকেই পাড়ি।

সেই দীপ্তমুখ ছেলেটির কথা ভাবতে ভাবতে চলেছি।...'তোমার পতাকা যারে দাও তারে বহিবারে দাও শকতি।' বাস্তবিক!

আর, যাকে সে-শক্তি দাও না তাকে তোমার পতাকাও দাও না। বোধহয় ভালোই করো।

উঠতি বয়সে আমি একটা চলতি সাপ্তাহিকের সম্পাদক হয়েছিলাম। কাগজটা আমি ফিরি করতাম তখন!

রাজদ্রোহের দায়ে কাগজের সম্পাদকের কারাদণ্ড হয়েছিল। অফিস থেকে কাগজ আনতে গিয়ে জানলাম, কাগজ আর বেরুবে না, সম্পাদকের জেল হয়েছে।

পরিচালক স্বয়ং কথাটা বললেন আমায়।

'কেন, সম্পাদক কি আর পাওয়া যাচ্ছে না?' জানতে চাইলাম আমি।

'পুলিসে সম্পাদকদের ধরছে কিনা ভয়ানক। কেউ বিশেষ রাজি হচ্ছে না জেলে যেতে।

'জেলে বুঝি ঘানি টানায় ভারী? খেতে দেয় না একদম?'

'না, সেরকম নয়। সম্পাদকদের জেলে এ-ক্লাসে রাখে। খাওয়া দাওয়া খুব খাসা। ঘানি টানতে হয় না।'

'তাহলে আর কেউ যদি সম্পাদক হতে না চায় আমি রাজি আছি হতে।'

'তুমি! তুমি কি লিখতে জানো?' পরিচালক মশাই অবাক হয়ে গেলেন।

'এক আধটু পারি বোধহয়। এই কাগজেই প্র্যাকটিস করেছি তো।'

হাসির ফোয়ারা

'কি লিখেছ এই কাগজে?'

'গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা—তবে কবিতাই বেশির ভাগ। আমার নাম ছাপা রয়েছে সেসব লেখার মাথায়। দেখতে পাবেন। তবে যেগুলো সম্পাদকীয় হয়ে বেরিয়েছে তাতে আমার নাম নেইকো।'

'সম্পাদকীয়ও লিখেছ নাকি আবার?'

'না, লিখিনি। লিখতে চাইও নি। নাম হবে না এমন লেখা লিখতে কে চায়? কিন্তু সম্পাদকমশায়ের কোনদিন দাঁত কনকন, মাথা টনটন, হাত ঝনঝন করলে তাঁর কাছে জমানো আমার প্রবন্ধের থেকে কোনো কোনোটার ল্যাজা মুড়ো ছেঁটে সম্পাদকীয় করে তিনি চালিয়ে দিয়েছেন।'

'বটে?'

'তবে, বলতে কি, নাম না হলেও দাম পেয়েছি; কাজ দিয়েছিল সেই লেখাগুলোতেই। সেগুলোর জন্যই মাঝে মাঝে যা দু পাঁচ টাকা রোজগার হয়েছে।'

'এখন তুমি কী করো?'

'আপনার এই কাগজ ফিরি করি! এতেই আমার চলে যায় কোনোরকমে। তা, চার পাঁচ শো কাগজ আমি চালিয়ে থাকি হপ্তায়!'

'তাই নাকি? তাহলে তো কাগজ চালাবার অভিজ্ঞতা তোমার বেশ অছে। তোমাকেই সম্পাদক করে দেওয়া হলো আজ থেকে। লেগে যাও এক্ষুণি।'

তৎক্ষণাৎ আমি লেগে গেলাম।

গোড়াতেই লাগলাম কাগজটার মোড় ঘোরাতে। নতুন নতুন ফীচার বার করতে লাগলাম। হপ্তায় হপ্তায় আনকোরা নতুনত্ব।

যত সব নামকরা লেখক, বৈজ্ঞানিক, সমাজসেবক, দেশনেতার সঙ্গে দেখা করে তাঁদের সাক্ষাৎকার নিয়ে একটা ফীচার করা গেল।

প্রথমেই গেলাম একজন নামকরা লেখকের কাছে—তাঁর ইণ্টারভিউ নিতে।

রবীন্দ্রনাথই তখন শীর্ষস্থানীয়। তাঁর পরেই আর যাঁরা নাম কিনেছিলেন তাঁদের ভেতর থেকে একজনকে বেছে নিয়ে গেলাম তাঁর কাছে।

'আমার কাছে কী দরকার?' যাওয়া মাত্রই জিজ্ঞাসিত হলাম।

'আজ্ঞে, আপনার ইণ্টারভিউ নিতে এসেছি।'

'অ্যাঁ? কী বললে কথাটা? ইন্ ইন্ ইন্—?' তিনি ভয়ানক বিচলিত হয়ে পড়লেন। —'কিসের মধ্যে বললে হ্যাঁ?'

'আজ্ঞে কিছুর মধ্যে বলিনি। কথাটা হচ্ছে ইণ্টারভিউ। অর্থাৎ কিনা, আপনার জীবনের ইতিহাস এবং আরো নানান বিষয়ে আপনাকে জিজ্ঞাসা করব। আপনার মতামত জানতে চাইব, তার উত্তরে আপনি যা যা বলবেন সেইসব জবাব টুকে নিয়ে গিয়ে হুবহু আমার কাগজে ছেপে দেব।'

'ছেপে দেবে? কাগজে ছেপে দেবে? বটে?' তিনি কী যেন চিন্তা করে বললেন—'এরকম আর কেউ ছাপিয়েছে এর আগে?'

'আজ প্রথম আপনার কাছেই এসেছি। অবিশ্যি, রবীন্দ্রনাথই আমাদের সবার মাথা। কিন্তু তিনি তো বোলপুরে থাকেন, নাগালের বাইরে। তাই আপনার কাছেই এলাম। আপনিও কিছু কম নন মশাই। আপনি হলেন আমাদের টিকিস্থানীয়।'

'তা বেশ বেশ। এসেছো ভালোই করেছ।' তাঁকে বেশ খুশিই দেখা গেল। 'মাথা তো মাথা। সেই মাথার ওপরেই টিকির স্থান। তা, এর জন্য কত টাকা দেবে আমায়?'

'টাকা! ইনটারভিউয়ের জন্য টাকা দেওয়ার প্রথা নেই তো।' আমি প্রকাশ করলাম। 'অবশ্যি ছাপানোর জন্য আপনাকেও কোনো টাকা দিতে হবে না।'

'উহু, তাহলে হবে না। টাকা ছাড়া আমি বাক্যব্যয় করিনে।'

'বেশ, দেব তাহলে কিছু আপনাকে।' মনিব্যাগে মোট দুখানা নোট ছিল, অনেক ইতস্ততঃ করে একখানা বিসর্জন দিতে তৈরি হলাম।

'ওখানাও দাও।'

দ্বিতীয় নোটখানা, আমাকে সতর্ক হবার সুযোগ না দিয়েই, একরকম তিনি ছিনিয়েই নিলেন বলতে গেলে।

'বেশ, এইবার কী জানতে চাও বলো। পুলিসে ধরে এমন কিছু জিজ্ঞাসা করো না যেন। পুলিসের আমার ভারী ভয়। জেলে যেতে আমি চাইনে।'

'জেলে যাবার কোনো ভয় নেই আপনার। ধরলে কাগজের সম্পাদককেই ধরে পুলিস। লেখককে ধরে না।'

'ভালো কথা, তোমাদের কাগজের সম্পাদক কে?'

নাম জানালাম আমার।

'শিব্রাম চকরবরতি। শিব্রাম চকরবরতি। নামটা যেন শোনা শোনা, কিন্তু ভদ্রলোকের সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় কখনো হয়নি।'

ততক্ষণে পদে এসেছি। বললাম, 'এই যে চোখের সামনেই দেখছেন। আমিই সেই হতভাগ্য নরাধম।'

'ওঃ, তুমি? তুমিই। তা বেশ বেশ। তুমিই সম্পাদক, আবার রিপোর্টারও?'

'আজ্ঞে, এমন কাগজ আমি জানি যার সম্পাদক, লেখক, কম্পোজিটর, মুদ্রাকর এবং হকার একই লোক। এক কপিও বিক্রি হয় না, কাজেই পাঠক এবং গ্রাহকও সে নিজেই।'

'বটে, এরকম আছে?' তিনি একটু আশ্চর্য হন।—'একাই একশ এমন ব্যক্তির সংখ্যা যত বাড়বে ততই আমাদের দেশের উন্নতি হবে।' ক্ষণেকের জন্য থামেন, 'দ্যাখো, আমার এই মতামতটা ছেপো না যেন। দেশের উন্নতির কথা আছে কিনা, পুলিসে, বুঝচই তো—'

'যে আজ্ঞে, বাদ দিয়ে দেব' তাঁকে আশ্বস্ত করি, এই দেখুন, আপনার সামনেই কেটে দিলাম। এইবার, আপনি অনুমতি করলে, আপনার অতীত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান নানাবিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারি।'

'স্বচ্ছন্দে। কিন্তু একটা কথা, আমার মেমরিটা তত ভালো নয়, আগেই বলে রাখি। আমার বিস্মৃতিশক্তি অসাধারণ! অনেক সময় আমার নিজেরই কেমন গোলমাল ঠ্যাকে অনেক বিষয়ে। তাতে কি অসুবিধা হবে কিছু?'

'কিসের অসুবিধা?' আমি ওঁকে উৎসাহ দিই ঃ 'আপনার কাজ হচ্ছে বলা, আমার কাজ হচ্ছে টুকে নিয়ে গিয়ে ছেপে দেওয়া, আর পাঠকের কাজ হচ্ছে পয়সা দিয়ে কিনে পড়া—এর মধ্যে অসুবিধাটা কার? এবং কোনখানে?...এখন আমার প্রথম জিজ্ঞাস্য হচ্ছে আপনার বয়স কত?'

'বয়স? কত আর? এই বাইশ। আসছে অঘ্রাণে বাইশে পড়ব। অঘ্রাণেই আমার জন্ম কিনা কিংবা আষাঢ়েও হতে পারে। মনে নেইকো ঠিক।'

'বাইশ!' আমি চমকে উঠি, 'আমার ধারণা ছিল চুয়াল্লিশ পঁয়তাল্লিশ এই রকম কিছু হবে —দেখে শুনে সেইরকম মালুম করেছিলুম।'

'তার মানে? তুমি কি বলতে চাও আমি বাইশ বছর ধরেই এই বাইশ বছরে রয়ে গেছি, যাকে বলে ভদ্রলোকের এক কথা?' তিনি ঈষৎ ক্ষুণ্ণ হন।

'না, না, তা বলব কেন? আপনার জন্মস্থান কোথায়?'

'মুশুরিতে। মুশুরিতেই বোধ হচ্ছে। এই হাওড়ার পুল পেরিয়ে কদমতলার ট্রামে উঠে যেতে হয়। হ্যাঁ, হ্যাঁ, হয়েছে, মনে পড়েছে, জায়গাটার নাম ঘুসুরি।'

'মুশুরি তো বিখ্যাত জায়গা। চেঞ্জে যায় মানুষ—' আমি বললাম, 'তবে ঘুসুরিরও বিখ্যাত হবার আশঙ্কা রইলো—আপনি জন্মেছেন যখন। তা আপনি লেখা শুরু করেছেন কতদিন?'

'বছর আষ্টেক। তা বছর আষ্টেক হবে! মানে আট বছর বয়স থেকেই, বুঝলে কিনা! প্রথমে কলমের পিছন দিয়েই লিখতে শুরু করি, ইয়া ইয়া মোটা মোটা অক্ষরে দেয়ালের গায়!'

'এ সমস্তই প্রতিভার লক্ষণ। প্রথম জীবনে দেয়াল থেকে শুরু, শেষ জীবনে দেয়ালায় গিয়ে খতম। আচ্ছা, জীবনে যত লোকের সম্পর্কে আপনি এসেছেন তার মধ্যে কাকে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য আপনার মনে হয়েছে?'

'কেন, বঙ্কিম চাটুজ্যে!' তিনি একটুখানি ভাবনায় পড়লেন। বললেন, 'হ্যাঁ, বঙ্কিমবাবুই। গল্পলেখক হিসাবেই বলছ তো? তাহলে প্রায় ঠিকই বলা হয়েছে।' একটু থেমে বললেন আবার, 'নিজেকে বাদ দিয়ে বলছি কিন্তু। নিজের সম্পর্কেই আমি সবচেয়ে বেশি এসেছি কিনা জীবনে।'

'সকলেই আসে ; তাতে কিছু আসে যায় না।' আমি আশ্বাস দিলাম। 'কিন্তু একটা

হাসির ফোয়ারা

প্রশ্ন, বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে যদি আপনার সাক্ষাৎ হয়ে থাকে, তিনি তো মারা গেছেন বহুকাল। তাহলে বাইশ বছর কি করে আপনার বয়স হয়?'

'সেই তো আশ্চর্য!' তিনি বললেন, 'কি করে হোলো জানি না। আমারো এটা অদ্ভুত বলেই বোধ হচ্ছে। তুমি বলবার পর।'

'তাহলে বঙ্কিমবাবুকে আপনি কখনো স্বচক্ষে দেখেননি, যদি বাইশ হয় আপনার বয়স'—আমি বলতে যাই, 'তাঁর সম্বন্ধে ঘুণাক্ষরে কিছু শুনেছেন হয়তো!'

'আমার সম্বন্ধে আমার চেয়ে তুমিই যদি বেশি জানো তবে আর আমাকে জিজ্ঞাসা করা কেন?' চটেই গেলেন তিনি এবার।

'যাক, যাকগে—যেতে দিন।' কথাটা আমি উড়িয়ে দিই।—'কী উপলক্ষে কোথায় বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল আপনার?'

'তাঁর শবযাত্রার সময়। হ্যাঁ, সেই প্রথম, সেই শেষ। তাঁর খাটের যেদিকে তাঁর মাথা সেই ধারটা ছিল আমার কাঁধে। শবযাত্রীদের মধ্যে আমিও ছিলাম একজন। 'বঙ্কিমবাবু কি জয়, বঙ্কিমবাবু কি জয়,' খুব জোরে জোরে চেঁচাচ্ছিলাম আমরা। তিনি হঠাৎ ঘাড় তুলে আমার কানের কাছে ফিসফিস করে বললেন।—'আহা, কানের গোড়ায় অতো গোল কোরো না হে! মাথা ধরে যাচ্ছে আমার।'

'অ্যাঁ? বলেন কি? এই কথা তিনি বললেন' শুনে তো আমি পিলে অব্দি চমকে উঠি: 'মড়ায় কখনো কথা বলে?'

'বলে। সময়ে সময়ে বলে। কিন্তু বলে ঐ ফিসফিস করেই। আমার একটা উপন্যাসেও এক জায়গায় ঐরকম বলেছে, ছাপার অক্ষরে লেখা আছে, পড়ে দেখো। ছাপার অক্ষর দেখলে তখন তোমার বিশ্বাস হবে বোধ হয়।'

'কিন্তু চ্যাঁচালে মড়া মানুষের মাথা ধরে যাবে এই বা কেমন কথা!'

'বঙ্কিমবাবু কি সাধারণ লোক ছিলেন তুমি বলতে চাও?' তাঁর প্রতিভা কি তুমি স্বীকার করো না? ঐখানেই তো তাঁর অসাধারণত্ব।

'তাহলে তিনি মরেননি কখনো।' সজোরে বললাম, 'এ হতেই পারে না।'

'তাও হতে পারে। কেউ কেউ বলছিল বটে, মরেননি। আবার কেউ কেউ বলছিল, মরেছেন। শবযাত্রীদের মতবিরোধ, মানে, বেশ দ্বিমত দেখা গেল।'

'তাই বলুন!' শুনে আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

'তারা বলছিল, ওঁর আবার মৃত্যু কী? উনি তো অমর!'

'তা বটে, আপনার লেখার নিয়ম কি? কী ভাবে লেখেন?'

'খুব আস্তে আস্তে। লিখতে আমার অনেক সময় লাগে। লিখি এবং ভাবি। ভাবি

এবং লিখি। ভাবতেই বহুক্ষণ যায়। এক ঘণ্টায় এক লাইন লিখি। একদম কাটি না। আমার লেখা সব অকাট্য। দেখেছ আমার কতগুলো ফাউণ্টেন পেন?'

'আসামাত্রই দেখেছি। ও-নিয়ে একটা প্রশ্নও করব এঁচে রেখেছি আমি।'

এইটে পার্কার, ওটা শেফার, ওটা হলো গিয়ে ব্ল্যাকবার্ড।

'এইটে পার্কার, ওটা শেফার, এটা পেলিক্যান, ওটা হলো গিয়ে ব্ল্যাকবার্ড, আর এটার নাম ওয়াটারম্যান, আর এই দুটো হোলো কনক্লিন আর এফ-এন-গুপ্ত। শেষেরটা এদেশী, কিন্তু প্রত্যেকটাই বেশ দামী।'

'এতগুলো কলম কী কাজে লাগে?'

'কেন, লিখতে? লেখার সময়ে প্রত্যেকটারই দরকার। কর্তাপদ আমি পার্কারে লিখি, আর ক্রিয়াপদ সব শেফারে; কর্মগুলো ব্ল্যাকবার্ডেই সারি। প্রিপোজিশন ইত্যাদির সময় ওয়াটারম্যানের প্রয়োজন হয়। আর, কারো কাছ থেকে টাকার কোনো চেক পেলে তার পিছনে সই করবার কালে এই পেলিক্যানটা কাজে লাগাই।'

কেন, তখন পেলিক্যান কেন?'

'তখন আমার মনে প্রশ্ন জাগে কিনা—এই টাকাটা পেলি ক্যান? কেন পেলে এই টাকা? আমার এই সব লেখার আবার দাম?'

'তার মানে?'

'তার মানে, আমার লেখাতো অমূল্য সব। তার কি কোনো মূল্য হয় নাকি?'

'তা বটে।'

তারপর তিনি ফের কলমের কথায় আসেন—অনুস্বর, বিসর্গ এবং চন্দ্রবিন্দু কনক্লিনে। কেবল জিজ্ঞাসা আর বিস্ময়ের চিহ্নের বেলায় ওই এফ-এন-গুপ্ত। এইজন্যেই তো একটা সেনটেন্স্ লিখতে একঘণ্টা লেগে যায়। প্রাণ যায় আমার।'

'ডেথ সেনটেনস বলুন।' আমি না বলে পারি না।

তিনি বলেই চলেন ঃ 'এত কান্ড না করলে কি লেখা ভালো হয় কখনো? এমন সব দামি দামি কলমে লিখি বলেই আমার লেখার এত দাম। একটা জিনিসের অর্থ বুঝলে? কেবল জিজ্ঞাসা আর বিস্ময়ের চিহ্নের বেলাতেই কেন এফ-এন-গুপ্ত ব্যবহার করি? তার মানে আছে। অর্থাৎ এদেশেও ফাউণ্টেন পেন হয়! এইটেই বিস্ময়ের বিষয়। সত্যই হয় নাকি? এইখানেই প্রশ্ন। এই নিয়ে একখানা বইও আমি লিখে ফেলব ভেবে রেখেছি। বইয়ের নামও ঠিক করা আছে—কলমের গুপ্ত কথা। কেমন হবে নামটা?'

'নামজাদা। বইয়ের এক কপি দেবেন আমায়, আমার কাগজে ভালো করে সমালোচনা করে দেব।'

'সমালোচনা করতে পারো, আপত্তি নেই। করলে ভালো করেই কোরো। কিন্তু দাম দিয়ে কিনতে হবে, অমনি বই আমি কাউকে দিই না। আমার বউকেও নয়।'

'তাহলে লাইব্রেরি থেকে আনিয়ে পড়ে নেব। ভাববেন না আপনি। দুদিন বাদে ফুটপাতেও পাওয়া যাবে। আচ্ছা, একটা কথা। চার খণ্ডে রচিত আপনার বিখ্যাত 'গন্ধগোকুল' বইটা কি আপনার নিজেরই জীবনচরিত?'

'তা বলতে পারব না। গন্ধগোকুল? হ্যাঁ, বইটা লিখেছি বটে। আমিই লিখেছি। কিন্তু পড়া হয়নি আমার। পড়বার ফুরসত পাইনি এখনো। প্রুফ দেখবার সময় পড়ব ভেবেছিলাম। কিন্তু পাবলিশার ব্যাটা প্রুফ পাঠালই না। পাঠাতেই চায় না। বলে যে, আমি প্রুফ দেখলে নাকি বড্ডো বেশি বানান ভুল হয়। কম্পোজিটররা নিজের বিদ্যায় অত আর শুধরে উঠতে পারে না। হিমশিম খেয়ে যায়।'

'ও? এ সবই প্রতিভার লক্ষণ। যারা বানাতে জানে তারাই বানান জানে না। তা, আপনার ছেলেবেলার কথা কিছু মনে পড়ে? আপনার কি ভাইটাই ছিল আর?'

'ভাই? হ্যাঁ, ছিল বটে একটা। একটাই ছিল। তুমিই মনে করিয়ে দিলে!'

'যে আমাকে পথ দেখিয়ে আপনার কাছে নিয়ে এল সেই ত?'

'সে তো বেয়ারা। বেয়ারাকে তুমি আমার ভাই বলছ? তুমি তো ভারী বেয়াড়া লোক হে!'

'না না, সেকথা কি বলি।' আমি সামলাবার চেষ্টা করি, 'সেকথা বলব কেন!'

'ছিল এক ভাই। তার নাম ভুতু—হ্যাঁ, যদ্দুর মনে পড়ে, ভুতুই তার নাম ছিল বোধ হচ্ছে। আহা, বেচারী ভুতু!'

'বেচারী কেন?...সে কি মারা গেছে নাকি?'

'মারা গেছে? তাই হবে। সঠিক আমরা কিছু বলতে পারব না, সে এক রহস্যময় ব্যাপার।'

'রহস্যময়? ভারী দুঃখের তো! নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে বুঝি?'

'প্রায় নিরুদ্দেশই বটে। আমরা তাকে পুঁতে ফেলেছি।'

'পুঁতে ফেলেছেন? কি রকম?' চমকে যেতে হোলো। 'মারা গেছে কিনা না জেনেই পুঁতে ফেলেছেন? তাজ্জব তো!'

'মারা গেছে বইকি। যথেষ্টই মারা গেছে।'

'মশাই মাপ করতে হবে।' আমি সবিনয়ে বলি, 'এবার সত্যিই আমি কিছু বুঝতে পারছি না। ভুতুকে যদি আপনি গোরস্থই করে থাকেন তাহলে গোড়ায় সে মারা গেছল নিশ্চয়। এবং তা আপনার অজানা থাকবার কথা নয়।'

'না না। ভুতুই যে মারা গেছে তা নিশ্চয় করে জানি না।' তিনি ঘোরতর প্রতিবাদ করেন।—'তবে আমাদের ধারণা যে সেই মরেছে।'

'ধারণা? তবে কি সে আবার বেঁচে উঠেছিল?'

'আমি বাজি ধরতে পারি—উঁহু,' তিনি জানান ঃ 'কবরে যাবার পর কি আবার বেঁচে ওঠা সম্ভব? মাটি চাপা পড়ে গেল যে? অতো মাটি ঠেলে উঠতেই পারবে না, বাঁচার কথা তো পরে। তবে হ্যাঁ, ভুতুর পক্ষে কিছুই তেমন অসম্ভব নয়! আর সেইখানেই আসল রহস্য।'

'এমন অদ্ভুত কথা তো কখনো শুনিনি। একজন মারা গেল, তাকে পোড়ানো হোলো—(তিনি প্রতিবাদের ভঙ্গী করতেই) না হয় পুঁতেই ফেললাম। যাক, চুকে গেল ল্যাঠা—এর ভেতর আবার রহস্য কোনখানে?'

'এই যে বলছি'—তিনি নিজেই এবার প্রায় মড়ার মতই, ফিস ফিস শুরু করলেন—'ব্যাপারটা এইরকম। বুঝলে কিনা, আমরা ছিলাম যমজ—স্বর্গীয় ভুতু আর আমি—আমাদের মাত্র দুমাস করে বয়স তখন, একদিন চান করবার সময় জলের গামলার মধ্যে আমাদের অদল বদল হয়ে যায়। এবং আমাদের মধ্যে একজন ডুবে মারা যায়, ঐ গামলার গর্ভেই। কিন্তু কে যে মারা গেল ঠাওরই করতে পারা গেল না। আমরা ঠিক ধরতে পারিনি। কেউ কেউ ভাবল ভুতুই। কেউ কেউ ভাবল আমিই।'

'হ্যাঁ, এটা একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা বটে। এবং বেশ চাঞ্চল্যকর।' আমি চটপট টুকে নিতে লাগলাম।—'কিন্তু আপনার নিজের কী মনে হয়?'

'কি করে বলব। খোদাই জানেন কেবল। যদি কেউ আমাকে তা বলে দিতে পারে, গোটা পৃথিবীটাই—আমার বাড়ি বাদ দিয়ে, তাকে আমি দিয়ে দিতে পারি। এই নিদারুণ রহস্য আমার সারা জীবন জুড়ে অন্ধকার ছায়া বিস্তার করেছে, কিন্তু একটা গুপ্ত কথা তোমাকে আমি

বলছি। এর আগে কাউকে তা বলিনি। আমাদের দু'ভায়ের মধ্যে একজনের অদ্ভুত একটা চিহ্ন ছিল—বাঁ হাতের পিছনে এক জড়ুল। সেই হচ্ছে ভুতু, সেই ছেলেটি যে ডুবে মারা গেছে।'

'আমি তো এর মধ্যে কোনো রহস্য দেখছি না।'

'দেখছ না, তবে এই দ্যাখো।' বলে তিনি বাঁ হাতের পেছনের জড়ুলটা দেখালেন। সামনে ভুতু (কিংবা ভুত) দেখার মতই আমি চমকে উঠলাম।

'ভেবে দেখতে গেলে আশ্চর্য নয় কি?' তিনি বললেন—'লোক-গুলো কি এতই উজবুক ছিল যে ভুল করে কাকে পুঁততে কাকে পুঁতে ফেলল? অদ্ভুত! যাক, এ কথা আর কাউকে বোলো না যেন। ঘুণাক্ষরেও নয়। কাগজেও প্রকাশ কোরো না। সামনেই, পঁচিশ বছর বয়সে আমার তাম্রজয়ন্তী আসছে কিনা। তারা যদি টের পায় যে আমি আর বেঁচে নেই, কাঁচা বয়সেই মারা পড়েছি তাহলে কি আর—'

তবে এই দ্যাখো। বলে তিনি বাঁ হাতের পেছনের জড়ুলটা দেখালেন।

'না না। তা কি প্রকাশ করি —আপনি যখন এত করে বলছেন! এটা বাদ দিয়েও ছাপাবার খোরাক যথেষ্টই পেয়েছি। কুড়িটা টাকা নিতান্ত জলে যায়নি। কিন্তু একটা আমার খটকা লেগেছে খুব। আপনারা তো হিন্দু; তাহলে না পুড়িয়ে পুঁততে গেল কেন আপনাকে?'

'আহা তাও জানো না—সম্পাদকি করছ। অতি শৈশবে মারা গেলে পুঁতে ফেলাই বিধি যে,

যেমন সাপের কামড়ে মলে নিয়ম, জলে ভাসিয়ে দেয়া।' ব্যাপারটা তিনি জলের মতই পরিষ্কার করে দিলেন।

'এইবার বুঝলাম। এবার বঙ্কিমবাবুর সম্বন্ধে আর একটি প্রশ্ন করব কেবল। আমি নিজেও বঙ্কিমবাবুর একজন ভক্ত কিনা। প্রায় সব বইই পড়েছি তাঁর। তাঁর শবযাত্রার ব্যাপারটা আমার ভারী চমৎকার লেগেছে। এর মধ্যে তাঁর বঙ্কিমদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। আচ্ছা, বঙ্কিমবাবুকে আপনি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি বলে কেন মনে করেন? এমন কি বৈশিষ্ট্য আপনি দেখেছেন তাঁর?'

'এমন বিশেষ কিছু নয়। একশজনের মধ্যে একজনও সেটা লক্ষ্য করেছে কিনা সন্দেহ। বঙ্কিমবাবুকে নিয়ে যখন ঘাটের কাছে গিয়ে নামানো হোলো, চিতাও সাজানো হয়েছে। এমন সময়ে তিনি খাটের উপরে উঠে বসলেন; বললেন, আমি ঠিক মরিনি। আমি মরলে কত লোক জোটে, কত বড় প্রসেসন হয়, খবরের কাগজের স্পেশাল এডিশন বেরয় কিনা, সভাটভা করে কিনা কেউ—এই সব দেখবার জন্যেই আমি মরেছিলাম। এই কথা বলে বঙ্কিমবাবু—এর মধ্যেও তুমি তাঁর বঙ্কিমদৃষ্টির পরিচয় পাবে—একটা হকারের কাছ থেকে অমৃত বাজারের স্পেশাল এডিশন একখানা এক পয়সায় কিনে একটা ছ্যাকরা গাড়ি ডেকে তাতে গটগট করে চাপলেন। 'আমার সম্বন্ধে কাগজে কী লিখেছে দেখতে হবে।' এই কথা বলে তিনি চলে গেলেন। এটা কি খুব উল্লেখযোগ্য নয়? অসাধারণত্বের পরিচায়ক নয় কি এটা?'

আমি সর্বান্তঃকরণে সায় দিয়ে বিদায় নিলাম। রাস্তায় নেমেছি—কি নামিনি, তিনি হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসেন—'ওহে ও! ভুলে যাচ্ছো যে বড়ো? আমার ফটো? ফটো নেবে না? এই নাও, এটাও তোমার ঐ ইনটারের মাথায় ছেপে দিয়ো। আমার বাণীর সঙ্গে আমার ফটো না থাকলে কি মানায়? সম্পাদক হয়েছ, ঘটে বুদ্ধি নেইকো মোটে?'

দার্জিলিংয়ে গিয়ে ঘোড়ায় চড়ে বেড়ানোর শখ হোল দুই ভাইয়ের।

দুজনে দুটো ঘোড়া কিনে ফেললো।

'ঘোড়ায় চড়া একটা ভালো একসাইজ, জানো দাদা?' বলল গোবরা।

'তা আর জানিনে, তবে ঘোড়া দুটো এক সাইজের হয়ে গেল—এই মুশকিল!'

'একসাইজের জন্যে কেনা ঘোড়া—এক সাইজের হবে না? বলো কী তুমি?'

'ওরে, সে একসাইজের কথা বলছি না যার মানে কিনা ব্যায়াম। আমি বলছি এক সাইজের—মানে এক রকম চেহারার। এক রকম লম্বা চওড়া, আড়ে বহরে—পায় মাথায় অবিকল একই রকম। সেই কথাই বলছিলাম।'

'তাই বলো।' হাঁফ ছাড়ে গোবরা।

'সব কিছুরই তর-তম থাকার দরকার ভাই, নইলে তারতম্য বুঝব কিসে? যেমন, ধর, মহৎ—মহত্তর—মহত্তম, উচ্চ—উচ্চতর—উচ্চতম...'

'যথা?' উদাহরণস্বরূপ প্রমাণ পেতে উদ্‌গ্রীব গোবর্ধন।

'যেমন ধর, তুই হলি উচ্চ—লম্বায় পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি। আমি তোর চেয়ে ঢ্যাঙা—আমি হলাম উচ্চতর। আর ঐ হিমালয় আবার আমার চেয়েও সমুচ্চ—একেবারে উচ্চতম।'

'বুঝলাম এবার।'

'ঘোড়া দুটোর কোন তর-তম নেই মোটেই। তোর ঘোড়ার থেকে কি করে যে আমারটাকে আলাদা করা যাবে ভাবছি তাই। যে ঘোড়া তোর পলকা শরীর বইবে, আমি যদি ভুল করে তার পিঠে কখনো চাপি তো অনভ্যাসের দরুণ সে হয়ত বসেই পড়বে তক্ষুণি—তার পরে আর হয়ত নাও উঠতে পারে। আমার ভার বইতে গিয়ে হয়ত বা ভবলীলা সাঙ্গ হবে বেচারার।'

'তাহলে তো ভারী ভাবনার কথাই।' ভাবিত হয়ে পড়ে ভাই—'তোমার চাপনে আমার ঘোড়া মারা না পড়ুক, খোঁড়া হয়ে যেতে পারে তো। আর, খোঁড়া পা খানায় পড়ে খালি। খানায় পড়ে কানা হয়ে যাবে হয়ত আমার ঘোড়াটা। তার সঙ্গে আমাকেও আবার হাড়গোড় ভাঙা দ না হতে হয়।'

'সে তো হতেই পারে। তার আমি কী করব?' দাদা দ-য়ে-পড়া ভাইকে কোন সান্ত্বনার বাক্য শোনাতে পারেন না—'গোড়ায় গলদ হয়ে গেছে, এখন ঘোড়ায় গলদ হবে সেটা আর বেশী কথা কি?'

'একটা কাজ করা যাক, আমার ঘোড়ায় ল্যাজটা ছেঁটে দি, কেমন?' একটা উপায় বার করে গোবরা ঃ 'তাহলে তো তুমি টের পাবে। তখন কোনটা তোমার কোনটা আমার চিনতে পারবে সহজেই।'

গোবরা কাঁচি এনে ঘোড়ার লেজটা ছেঁটে দিল আধখানা।—'তুমি তর-তম চাইছিলে দাদা, কেমন, এইবার তার উত্তর পেলে তো?'

'তোর ল্যাজটাকে তুই কাঁচিয়ে দিলি, আমার ল্যাজটাকে তাহলে আমি পাকিয়ে দিই।' বলে তিনি নিজের ঘোড়ার লেজটা বেশ করে পাকিয়ে তাতে একটা গিঁট বেঁধে দিলেন ভালো করে—'তোরটা যদি উত্তর হয়ে থাকে তবে আমারটাও হোলো গিয়ে উত্তম।'

উভয়ের লেজের প্রশংসায় দুভাই-ই পঞ্চমুখ।

দু ভাই ঘোড়ায় চেপে হাওয়া খাচ্ছিলেন বেশ, এমন সময়ে হোলো কি, একটা কাঁটা তারের বেড়ায় লেগে দাদার ঘোড়াটার আধখানা লেজ ছিঁড়ে হাওয়া হয়ে গেল একদিন!

'দ্যাখ তো আমার দশা কী হোলো,' দাদা দেখালেন ভাইকে—'ল্যাজের দিক দিয়ে আলাদা করবার কোনো উপায় রইল না আর! দ্যাখ্। দেখেছিস্?'

'দেখছি তো।' বলল গোবরা—'আমার ঘোড়াটার ঘাড়ের কেশরগুলো ছেঁটে দিই তাহলে। তা ছাড়া আর উপায় কি?'

ঘাড় ছাঁটাই হবার পর ঘোড়াটার চেহারার খোলতাই হোলো খুব। একেবারে আধুনিক আধুনিক।

সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে হর্ষবর্ধন বললেন—'তোর ঘোড়াটা তো ভারী ভদ্র দেখছি। তুই ওর ল্যাজা মুড়ো দুদিকেই মুড়িয়ে দিলি তবুও একটা কথা কইছে না। নেহাৎ গাধাও বলা যায় ওটাকে।'

গিন্নি তোমার চোখে জল কেন গো?

বিনির কলেজের বান্ধবীদের নিয়েই বেধেছে ফ্যাসাদ। তারাও আবার টিকিট গছাতে লেগে গেছে।

'গাধা বলে গাল দিয়ো না আমার ঘোড়াকে বলে দিচ্ছি।' দাদার কথার প্রতিবাদ করে গোবরা ঃ 'পাছে তোমার চাপনে আমার অশ্ব খতম্ হয়ে যায় তাই ওকে অশ্বতর করে দিলুম।'

'বেশ করেছিস। তোর অশ্বতরের খুরে খুরে দণ্ডবৎ।' মাথায় হাত ছোঁয়ান দাদা।

গোবরা কাঁচি এনে ঘোড়ার লেজটা ছেঁটে দিল আধখানা [পৃষ্ঠা ১৯২

তারপর আর একদিন আরেক দুর্ঘটনা।

দুই ভাই পাশাপাশি চলেছেন ঘোড়ায় চেপে। হর্ষবর্ধন আরাম করে চুরুট ফুঁকতে ফুঁকতে চলেছেন, নাক সিঁটকালো গোবরা—'ইস্, তোমার চুরুটটা কী কড়া গো দাদা, ভারী বিচ্ছিরি গন্ধ ছাড়ছে।'

'হুম্। গন্ধটা আমিও পাচ্ছি তখন থেকে। কড়ায়-গণ্ডায় দাম নিয়েছে বলে কি চুরুটটাও এমন কড়া দিতে হয়!' দোকানদারের উদ্দেশে তিনি নাক খাড়া করেন।

নাক সিঁটকাতে গিয়ে তাঁর নজর পড়ে ঘোড়াটার ঘাড়ের ওপরে। ওমা, একি, কখন চুরুটের ফুলকিতে আগুন লেগে ঘোড়ার ঘাড়ের কেশরগুলো পুড়তে শুরু করেছে। গর্দান প্রায় ফাঁক!

'যাক, আগুন লেগে আমার ঘোড়ার ঘাড়টাও ফাঁকা হয়ে গেল!' বলেন হর্ষবর্ধন ঃ 'তোর মতই হয়ে গেল প্রায়। এরপর আর দুটোকে আলাদা করে চেনার কোন উপায় রইল না।'

● একটা সাদামাটা গল্প

হাসির ফোয়ারা

'তাহলে কী হবে?'

'কী আবার হবে! আমি যদি ভুল করে তোর ঘোড়াটায় চেপে বসি আর আমার চাপে ওটার পদচ্যুতি ঘটে তাহলে আমাকে তুই দুষতে পারবিনে তখন।'

দুই ভাই পাশাপাশি চলেছেন ঘোড়ায় চেপে [পৃষ্ঠা ১৯৩

'বিপদ বাধালে দেখছি!' ঘোড়ার বিপদকে নিজের বিপদ বলেই জ্ঞান করে গোবরা।

কী করবে এখন? ভেবে পায় না সে। তার নিজের ঘোড়াটার এক কান কেটে, তার দাদার—না, দাদা নয়, দাদার ঘোড়াটার দুটো কানই ছেঁটে দেবে নাকি? কিন্তু ঘোড়ারা ওদের কথায় কান না দিয়ে যদি চার পা তুলে ছুট লাগায়? অহলে?

অনেক ভেবে ভেবে তার মাথা থেকে একটা উপায় বার হয়—'আচ্ছা দাদা, তোমার ঘোড়াটা সাদা রঙের দেখছো তো?'

'তা তো দেখছি।'

'আর আমারটা হচ্ছে মেটে রঙের। দেখতে পাচ্ছ?'

'তাও দেখছি।'

'তাহলে তোমারটা সাদা আর আমারটা মেটে—এই সাদামাটা কথাটা তোমার মনে থাকবে না দাদা?'

ধুমড়োলোচনের আবির্ভাব

দৈত্যদানোদের যে একালেও দেখা যায় তা হয়তো তোমরা জানো না। এযুগের ছেলেমেয়েরা তা মানোও না বোধ হয়? সেই আলাদীনের আমলের প্রায় আশ্চর্য প্রদীপের ন্যায় একজনা একবার আমার বোন জবার কাছেই এসে হাজির হয়েছিল একদিন। হঠাৎ এসে হাজির! জবার কাছেই গল্পটা শোনা আমার।

জবাকে তোমরা চিনতে পারবে আশা করি। তার মেয়ে টুম্পা, আমার ভাগনি, তার ভাই টিকলুকে কাঁধে চড়িয়ে সচিত্র হয়ে কিছুদিন আগে পূজাবার্ষিকীর পৃষ্ঠাতেই 'টুম্পা-র গল্পে' প্রকাশিত হয়েছিল—এত তাড়াতাড়ি তোমাদের তা ভুলে যাবার কথা নয়। সেই টুম্পা-র জননী জবা।

সত্যি, আমার বোনরা সব অদ্ভুত! ভূতপ্রেত দৈত্যদানোরা কোথায় নাকি মানুষদের এসে পাকড়ায় বলে শুনে থাকি, উলটে বলব কি, তারাই কেউ ভুল করে আমার বোনদের কারো কাছাকাছি এলে ধরা পড়ে নাজেহাল হয়ে যায় শেষটায়! যেমন, আলাদীনমার্কা এই দৈত্যটাও জবার পাল্লায় পড়ে এইসা জব্দ হয়েছিল যে শেষ পর্যন্ত প্রায় জবাই হবার যোগাড় আর কি!

হাসির ফোয়ারা

'কী হয়েছিল শোনো দাদা' (জবা-ই গল্পটা বলছিল আমায়) সেদিন ছিল টিকলুর জন্মদিন। বছর কয়েক আগে এক পুরণো আসবাবের দোকান থেকে শখ করে সেকেলে একটা চীনে প্যান আমি কিনেছিলাম, কলাই-করা বেশ দেখতে পাত্রটা, মেজে ঘষে ঝেড়ে মুছে রাখতাম মাঝে মাঝে, কিন্তু কখনো সেটাকে কাজে লাগাইনি। ভাবলুম, আজ এই পাত্রেই টিকলুর জন্যে পায়েসটা রাঁধি না কেন? রেশনের চিনিতে চা খেতেই কুলোয় না আমাদের, কিন্তু এই পাত্রটা ত চীনি, কাজেই চিনির মাত্রা একটু কম হলেও মিষ্টি হবে হয়ত। এই না ভেবে নতুন করে ফের ওটাকে মাজতে বসেছি, একটুখানি ঘষেছি যেই না, দেখি কি, পেল্লায় চেহারার বিকটাকার এক দৈত্য এসে সটান আমার সামনে খাড়া!...'

'সত্যি বলছিস?' শুনেই না আমি চমকে গেছি—দেখলে কী হত কে জানে! চেয়ার সমেত উল্‌টে পড়ি আর কি! সামলে নিয়ে বললাম—'দূর! এখনকার কালে কি আর দৈত্যদানারা দেখা দেন নাকি? এখন ও'দের আসতে মানা, তাছাড়া ওনারা কি টিকে আছেন এখনো যে টিকি দেখাবেন আবার।'

'এক বর্ণ মিথ্যে নয় দাদা! এই তোমার গা ছুঁয়ে বলছি......ধোঁয়াটে রঙ্......বিচ্ছিরি চেহারা......' বর্ণনা করে জবা : 'সত্যি বলতে, গোড়ায় আমি একটু চম্‌কে গেলেও দত্যি দেখে ভড়কাবার মেয়ে আমি নই। তাছাড়া, আলাদীনের গল্পটা তো পড়াই ছিল আমার। প্রথম দর্শনেই ভদ্রলোকের পরিচয় টের পেয়ে গেছি। সহজ সুরেই বলেছি—'দ্যাখো বাপু! আচমকা এইভাবে এসে এমন করে আমায় চম্‌কে দেবার মানে? ভেবেছ কি তুমি? আরেকটু হলেই এই প্যানটা আমার হাত ফস্‌কে পড়ে গিয়ে চুরমার হয়ে যেত যে।'...

সে হাঁটু গেড়ে আমার সামনে বসে বলল—'হুকুম করুন, কী করতে হবে এখন আমায়।'

'বলি, অ্যাদ্দিন ছিলে কোথায়?' আমি রাগ করে বললাম—'এই প্যানটা তো কিনেছি বাপু, আজ না। প্রায় বছর দশেক হবে। ঘষে ঘষে হাত ক্ষয়ে গেল আমার। কই, অ্যাদ্দিন ত দেখা দাওনি লাটসাহেব? আগে হলে কাজ দিত। অনেক কিছু করবার ছিল তখন। এখন আর কী করবে!'

'আগে আপনি ওটা তোয়ালে দিয়ে ঘষতেন কিনা! আসি আসি করেও আসতে পারিনি তাই। আজ আপনি হাত দিয়ে ঘষেছেন তো এনামেলের গায়। আপনার নখের আঁচড় লেগে দাগ পড়ল কিনা, টনক নড়লো আমার, তাই আমার মুল্লুক ছেড়ে চলে আসতে হল আমায়। এখন হুকুম করুন কী করব আমি? কিছুই কি করবার নেই আর?'

তার কথায় তখন আমি ভাবতে বসলাম, কী করতে বলা যায় লোকটাকে।.........

'সে কিরে! এত ভাববার কী ছিল তোর? জবার ভাবনার আমি জবাব দি : 'দৈত্যদানাদের দিয়ে যতো সোনা দানা আনিয়ে নিতে হয় তাও জানিসনে! চুণি পান্না হীরে জহরৎ মণি মুক্তো এই সব আনাবি তো...তা না...'

হাসির ফোয়ারা

'আহা! সে সব দিন আর আছে নাকি? সে সুখের দিন আর নেই দাদা! গোল্ড কণ্ট্রোল হয়ে যায়নি এখন? চোর ডাকাতের ভয় নেইকো? একালে...এই কলকাতাতেও এখন? আমাদের এই যাদবপুরেও চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, খুনখারাপি, বোমবাজি দিনরাত লেগেই রয়েছে। তাছাড়া তোমার ওই ইনকমট্যাক্‌শওয়ালারা ধরবে না? কর্তা আবার সরকারী চাকরি করেন...পুলিস এসে পাকড়াবে না তাঁকে? কৈফিয়ৎ চাইবে না, এত সোনা দানা হোলো কোথ থেকে তোমার শুনি? ঘুষ খাচ্ছো নিশ্চয়! ব্যস্‌, তার চাকরি খতম্‌! নইলে গাভরা গয়না পরার সখ ছিল না কি আমার? দু'এক সেট জড়োয়া অলঙ্কারই কি ঐ দানাটাকে দিয়েই না আনাতাম?' জবা দীর্ঘনিশ্বাস ফ্যালে।

'তোর ঐ আঁচড়ে—মানে, তোর ঐ আঁচড়ণের জন্যে সে খুব বিরক্তি প্রকাশ করল বোধ হয়?' জিগ্যেস করি আমি।

'মোটেই না। বলল যে, তুমি কবে আঁচড়াও সেই অপেক্ষাতেই বসেছিলাম আমি অ্যাদ্দিন। এখন বল কী করতে হবে?'

'কী করবে! তুমি ত রাঁধতে জানো না যে রেঁধে বেড়ে সাহায্য করবে আমায়। আজ আমার ছেলের জন্মদিন ছিল। ভেবেছিলাম ভালোমন্দ এক আধটু খাওয়া দাওয়ার আয়োজন করব...।'

'তা, রাঁধবার কী দরকার?' বলল সে ঃ 'কোথাকার খানা চাই তোমার বলোনা তাই। কাবুল, কান্দাহার, ইস্তাম্বুল, ইরাণ, তুরাণ, তুর্ক, মোগলাই, পাটনাই, চাইনীজ, প্যারী, মাদ্রাজী, ঢাকাই, লণ্ডন, সুজারল্যাণ্ড, রোম থেকে রম্‌না—কোথাকার খাবার চাই তোমার হুকুম করো—হাজারো রকমের ডিশ এনে হাজির করছি এই দণ্ডে।'

'আহা, এতই যদি আনিয়েছিলিস্‌ তো আমায় খবর দিসনি কেন রে?' সুরুৎ করে জিভের জল টেনে নিয়ে ক্ষুব্ধ স্বরে আমি শুরু করি।

'কে আনাচ্ছে দাদা? খাদ্য নিয়ন্ত্রণ আইন নেই নাকি? অতো সব খাবার দেখলে পাড়ার লোকদের চোখ ট্যারা হয়ে যেত না? অতিথিদের তিন পদের বেশী খাদ্য দিতে গেলেই ত বিপদ! পুলিস এসে পাকড়াতো না আমাদের? পাগল হয়েছো নাকি তুমি!'

'যা বলেছিস! পুলিসের পরোয়ানার পরোয়া না করেটা কে!' আবার আমার সায় তার কথায়।

'তাহলে আমায় কী করতে হবে বলুন।' জানতে চাইল দৈত্যটা।

'তাইত ভাবচি।' ভাবিত হয়ে আমি বললাম,—'আলাদীনের কাল আর নেই ভাই! এ বাজারে হঠাৎ এখন বড়লোক হওয়া যায় না। পাড়াপড়শীর চোখ টাটাবে। পুলিসে টের পেলেই জেল। হাতে দড়ি পড়ে যাবে সবাইকার। ভেবে দেখি আমি।...ভালো কথা, কী বলে ডাকবো আমি তোমায়? তোমার নামটা কি?'

'নাম ত আমার জানা নেই, তবে আমার মুলুক কোথায় বলতে পারি। জাহান্নাম।'

'না, ওরকম কট মট নামে তোমাকে আমি ডাকতে পারব না বাপু! একটা ভদ্রগোছের নাম রাখব তোমার। ধূমড়োলোচন নামটা কেমন? এটা তোমার পছন্দ?'

'ধূমড়োলোচন?' সে ভাবতে থাকে।

'নামের ভেতর এত ধুম ধাম দেখে সে ভড়কে যায় বুঝি?' আমি শুধাই।

'কে জানে!' জবা বলে ঃ তখন আমি তাকে আশ্বাস দিয়ে জানাই—'তবে হ্যাঁ আরেকটা ভালো নামও ছিল বটে। ওর বদলে কুম্ভকর্ণও রাখা যেতে পারত। কিন্তু তাহলে আমার দাদা ভারী রাগ করবে—জানতে পারে যদি। আর জানতে ত পারবেই, তার সামনে ঐ নাম ধরে ডাকবো যখন তোমায়। না, কুম্ভকর্ণ রাখা চলবে না।'

'আমার ঘুমের ওপর নজর দিচ্ছিস? অ্যাঁ?' তক্ষুণি তক্ষুণি আমি রাগ করি।

'তাইত বললাম লোকটাকে যে, ও-নাম রাখা চলবে না। তাতে আমার দাদার ওপর কটাক্ষপাত হবে। আর, বোন হয়ে দাদার প্রতি কটাক্ষপাত করাটা কি ভালো?'

'বোধহয় ভালো নয়।' একটু দোনামোনায় বলল দানোটা। এবং তারপরই সে জানতে চাইল, তাতে খারাপটা কী হতে পারে। আর কটাক্ষপাত বস্তুটা-ই বা কী?

'এই, এখন তোমার দিকে আমি যেমন করে চেয়ে রয়েছি গো!' বলে তির্যকদৃষ্টির দ্বারা ওকে বোঝাতে চাইলাম চোখে আঙ্গুল দিয়ে।

চেয়ে চেয়ে ও দেখল খানিক, তারপর বলল, 'এর ভেতর তো খারাপ কিছু আমি দেখতে পাচ্ছি না মোটেই।'

আমি বললাম, 'এর মানে আছে। কিন্তু তুমি তো মানুষ নও তাই এর মর্ম বুঝতে পারবে না। একে বলে মর্মভেদী কটাক্ষ।'

'যা বলেছিস! ওর মর্মভেদ করা কোনো দানোর কম্মো নয়।' জবাকে আমি বললাম। 'ওর মর্মভেদ করতে গিয়ে বলে আমাদেরই মর্ম ভেদ হয়ে যায়!'

'বেশ, তাহলে কুম্ভকর্ণ নয়। ঐ ধূমড়োলোচনই নাম রইল তবে তোমার। আমি ধূমড়ো বলে ডাকলেই তুমি সাড়া দেবে, কেমন? আচ্ছা, এইবার চেহারাটা তোমার পালটাতে হবে বাপু। ঐ চেহারা নিয়ে ভদ্রসমাজে বেরুনো চলবে না। তাছাড়া আমার ছেলেমেয়েরা দেখলে ভিরমি খেতে পারে। নামে ধূমড়ো হলেও, তোমার ঐ ধূমড়ো চেহারা অচল। একটা সভ্যভব্য চেহারা নিতে হবে তোমায়।'

'হুকুম করুন। কী চেহারা নেব বলুন আমায় আপনি?'

ওকে একটা চিরকুটে তোমার ঠনঠনের ঠিকানাটা লিখে দিয়ে বললুম, 'এই ঠিকানায় যাও, গিয়ে দেখে এসো গে আমার দাদাকে। ঐ ধারার চেহারা বানিয়ে আসবে আমার এখানে, তাহলে আর পাড়ার কেউ সন্দেহ করবে না। কোন গোল হবে না তোমাকে নিয়ে আর।'

'আমার রূপ ধারণ করতে বললি ওকে?' শুনে রাগব কি খুসি হব আমি ঠিক ঠাওর করতে পারি না।—'আমার চেহারাটা তাহলে তুই বেশ ভদ্রগোছের বলছিস?'

'তা, মন্দ কি এমন? চাকর বাকর হওয়ার পক্ষে অন্ততঃ আমি ত বেশ চলনসই চেহারা বলেই মনে করি।'

'আমার রূপ ধরে লোকটা তারপরে তোদের কাজে এসে লাগল বুঝি এখানে?' আমি জানতে চাই।

'আমায় চাকর রাখো চাকর রাখো চাকর রাখো গো!' বলে যদিও আমি গান গেয়ে সাধিনি কোনোদিন জবাকে, তাহলেও আমার ওরফে হয়ে শ্রীমান ধূম্রলোচন (কিংবা ধূমড়োলোচনের বিকল্পরূপে এই আমি) ওদের চাকরিতে বহাল হয়ে কেমনধারা কাজ বাজালাম জানবার আমার কৌতূহল হল।

'খানিক বাদে দেখি কি, আমাদের ঈষ্ট রোড ধরে কুঁজো হয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে আসছে বেচারা। তোমারই চেহারা বানিয়ে এসেছে বটে। কিন্তু ছেঁড়া চটি পায় লুঙ্গি পরনে কুব্জপৃষ্ঠ ন্যুব্জদেহ এ কী চেহারা তোমার!'

ওর কথায় সেই ছড়াটা আমার মনে পড়ে...ন্যুব্জ পৃষ্ঠ কুব্জ দেহ সারি সারি উট। চালকের ইঙ্গিত মাত্রই দেয় ছুট। কিন্তু যতই বিচ্ছিরি হোক না, অমন উট্‌কো চেহারা কখনই নয় আমার। —'হতেই পারেনা কক্ষনো।' আমি ঘোরতর প্রতিবাদ করি।

'আমিও সেই কথাই ভেবেছি! তোমার ঐ মূর্তি তো দেখিনি কখনো আমরা!...দেখে আমার মন খারাপ হয়ে গেল! তোমার কোনো অসুখ বিসুখ করল নাকি? নাকি, পড়ে গিয়ে হাত পা মচকে বসেছো? কুঁজো হয়ে অমন করে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছো সেইজন্যে। আর ধূমড়ো গিয়ে তোমার সেই চেহারা দেখেই না।...'

কথাটায় আমারও যেন কেমন খটকা লাগে।—'কোন মাস ছিল তখন রে? তারিখটা তুই বল ত আমায়।'

'পয়লা আষাঢ় ছিল দিনটা। আকাশ মেঘে মেঘে ভার। বেশ মনে আছে আমার। সেই আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে ঐ শ্রীমূর্তি ধরে আমাদের এই ঈস্‌ট রোড দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে তুমি আসছিলে।'

'হ্যাঁ, এখন মনে পড়ছে আমার।' আমি বলে উঠি, 'প্রথম বাদলার ঠান্ডায় আমার ফেরারী বাতটা ফিরে এসে চাগাড় দিয়ে উঠেছিল সেদিন ফের। রাত্তিরের লুঙ্গিটা আর ছাড়া হয়নি সকালে। তাই লুঙ্গি পরে ছেঁড়া স্লিপারটা পায় গলিয়ে কুঁজো হয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এঘর ওঘর করছিলাম বটে। তোমার শ্রীমান তখন গিয়ে সেই কাহিল অবস্থায় দেখে থাকবে হয়ত আমায়।'

'বাত? তোমার বাত?' জবা গালে হাত দেয়—'ফক্কুরি পেয়েছো নাকি? সাত জন্মে

তোমার বাত হতে দেখিনি। তোমার বাত তো আমরা জানি—কেবল তোমার ওই মুখেই। এইতো জানি আমরা। বাত ফক্কুরির আর জায়গা পাওনি নাকি? আমার কাছে চালাকি?'

'আরে, সে তো হোলো গে বাৎচিৎ—আমাদের মুল্লুকী ভাষায়; কিন্তু আমাদের সেই বিহারী বাতের কথা আমি বলছিনে। তোদের বাংলা ভাষায় যাকে বাত বলে রে...যে আগে এসে পায়ে পড়ে, তার পর হাঁটু ধরে, ক্রমে কোমর জড়ায়, তারপরে আগাপাশতলা পাকড়ে চিৎ করে ফ্যালে শেষটায়। নট নড়ন চড়ন—নট্ কিচ্ছু—সেই বাতচিতের কথাই বলছি আমি। আমাদের হিন্দীতে যাকে...'

'তোমাদের হিন্দীতে যাকে মহাব্বাত বলে তাই তোমায় ধরেছিল বুঝি?' বাধা দিয়ে জানতে চায় জবা।

'মহাব্বাতের কথা রাখ্। উ বাত হামকো মৎ বাতাও। আমি বোনের মুখে মহাব্বাতের কথা শুনতে চাইনে।' ওর কথায় আমি বাধা দিই—'সে বাত তো আমার সেরে গেছে দুদিনেই। দুদিন ফক্কুরি করার পর যেমন ঝঞ্ঝাবাতের মতন সে এসেছিল তেমনি কেটে পড়েছে তারপর।'

'আমি জানব কি করে? আমি তো কোনোদিন ঐ চেহারা তোমার দেখিনি...কুঁজোর থেকে জল গড়িয়ে খাবার সময়েই যা তোমাকে আমি কুঁজো হতে দেখেছি। সঙ্গদোষই বলা যায় হয়ত তাকে। কিন্তু তোমার সেদিনের সেই মন্থরমার্কা চেহারা আর ওই মৃদু মন্থর গতি বিলকুল আমার ধারণার বাইরে।'

'ঠিক প্রদীপের মতন না হলেও চিরকাল আমি নিবাত নিষ্কম্প।' আমি বলি—'অমন বাতাহত কদলী কান্ডবৎ পড়ে থাকতে হবে, অমন কান্ড আমি করব আমিই কি কোনোদিন তা কল্পনা করতে পেরেছিলাম? সে কথা যাক্, তার পর কী হলো তাই বল্। আমার বিকল্পকে তোদের রাস্তা দিয়ে ঐ কুঁজো হয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে আসতে দেখে কী করলি তুই তারপর?'

'আহা! তোমাকে খোঁড়াতে খোঁড়াতে আসতে দেখে আমি আগ বাড়িয়ে গিয়ে হাতে ধরে তোমায় নিয়ে এলাম বাড়িতে। পাছে তুমি পাড়ার কারো নজরে পড়ে যাও। দাদার এই দুরবস্থা আর বোন বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁ করে তাই দেখছে—এটা দেখলে লোকে বলবে কি? ভাববে-ই বা কি আমায়!'

বোনের হাতে বিকল্প আমার সমাদরটা কেমন হোলো, মনে মনে আমি কল্পনা করি।—'তা বটে তা বটে! তারপর?'

'এলাম ত! এখন কী করতে হবে আমায় বলুন তাই। বললে তখন তুমি। তুমি মানে তোমার সেই ওরফে।'

ওর কথায় আমি ভাবতে বসলাম—'তাই ত, তোমাকে দিয়ে কী করানো যায় ভেবে দেখি। আলাদীনের কাল ত আর নেই এখন। তুমি যে রাতারাতি সাত মহলা বাড়ি বানিয়ে দেবে সেটি হচ্ছে না। তোমাকে দিয়ে হাঁড়ি হাঁড়ি মোহর আনাব, কাঁড়ি কাঁড়ি হীরে জহরৎ, তাও হবে না।

তোমাকে দিয়ে দেশ বিদেশের ভালো মন্দ খাবার আনিয়ে খাবো যে, তাও হবার নয়। সেকালে আইন টাইনের কোনো বালাই ছিল না, পুলিস ফুলিশও ছিল না বোধ হয়। এখনকার আইন কানুন ভারী কড়া। একটুখানি ইদিক উদিক হবার যো নেই। তাহলে এসেছো যখন, থেকে যাও। কোনো না কোনো কাজে লাগবেই। বাড়ির কাজকর্ম করার লোক মেলে না আজকাল। বাসন কোসন মাজা, ঘরদোর ঝাড়পোঁছ, বাজার হাট করা—এই সব কাজ তুমি করবে। তোমাকে আমি লুচি ভাজতে অমলেট বানাতে শিখিয়ে দেব এক সময়। এই সব টুকি টাকি কাজ করতে পারলেও নেহাৎ কম হবে না। তাই বা করে কে? তাই করবার লোক বা পাচ্ছি কোথায়? পঞ্চাশ টাকা মাইনে হাঁকলেও কাজের লোক পাওয়া যায় না আজকাল। এই সব কাজ করবে তুমি।'

'দাদার দুরবস্থা আর বোন হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছে...' [পৃষ্ঠা ২০০

আমার কথায় মাথা নেড়ে বলল সে—যা হুকুম।

কিন্তু জবার কথায় অবাক হতে হয় আমায়—'বলিস কি রে? আলাদীনের সেই অদ্ভুত-কর্মাকে হাতে পেয়েও তুই তাকে উপযুক্ত কাজে লাগাতে পারলিনে? ফাইফরমাস খাটবার ফালতু কাজে লাগালি কেবল? আশ্চর্য!'

'ভেবে দেখলে এইটেই কি কম নাকি দাদা। খুব বরাত জোর থাকলেই এমন একটা লোক পাওয়া যায় আজকাল—তা জানো? ভেবে দ্যাখো, সব কাজ করবে, জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ, অথচ এক পয়সা তাকে মাইনে দিতে হবে না, কোনো খোরাকীও নেই আবার! এটা কি একটা কম লাভ হল নাকি?'

'যথা লাভ!' কথাটা মানতে হয় আমাকে।

'বরাতজোর না থাকলে এমন একটা লোক, তাও মাগনা, মেলে কি এখন আজকাল? তুমিই বলো না দাদা!'

'তা, বরাত বটে তোর!' দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আমি বললাম ঃ 'পরশপাথর হাতে পেয়েও

লাখ লাখ টাকার সোনা বানিয়ে নিতে পারলি না? মিনি মাইনে বিনা খোরাকীর চাকর নিয়েই খুশি হয়ে রইলি।'

'কী করব দাদা! লাখ লাখ টাকার সোনা নিয়ে কী হবে যদি তার জন্য জেলে গিয়ে সারাজীবন কাটাতে হয়? তাই যাই বলো, এ বাজারে অমন একটা চাকর পাওয়াও কম ভাগ্যির কথা নয়। ঘর সংসার তো করলে না। তুমি এর মর্ম কী বুঝবে? যাই হোক, ধুমড়ো কাজ কর্ম করছিল বেশ...।'

'খুব ধুম ধাম করে?'

'না। নিঃশব্দে। ছেলেমেয়েরা ইস্কুলে কর্তা আপিস চলে গেলে পর সে আসত। যা কিছু করবার সব করে দিয়ে দোকান বাজার সেরে চারটে বাজার আগেই চলে যেত, কারো নজরে পড়ার কোনো জো ছিল না। সবার চোখের আড়ালে তাকে রেখেছিলাম। কাপড় কাচতে, কুটনো কুটতে, বাটনা বাটতে শিখে গেছল, অমলেট টমলেট ভাজতেও শিখিয়ে নিয়েছিলাম। এমন সময় হল কি, একদিন কে নাকি মাতব্বর মারা যাওয়ায় তাদের ইস্কুলের ছুটি হয়ে গেল হঠাৎ, তারা অসময়ে বাড়ি ফিরে আসতেই ধুমড়ো তাদের চোখে পড়ে গেল...টুম্‌পা ত তাকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠেছে, ও মা! মামা যে! আর টিকলু তাকে ভালো করে লক্ষ্য করে বলেছে, মামা এমন কুঁজো হয়ে গেছে কেন রে দিদি?'

'আমার ব্যারাম সেরে গেল আর তারটা সারলো না তখনো?' আমার বিস্ময় লাগে।

জবা বলল—'ও কী করে টের পাবে বলো! ও তো তার পরে তোমাকে আর দ্যাখেনি। টুম্‌পা আমাকে জিজ্ঞেস করলো, মামা এমন খোঁড়াচ্ছে কেন মা? আমি বললাম—তোমার মামাই জানে! টিকলুও তখন ধুমড়োকে শুধায়—মামা, তুমি লুঙ্গি পরে আছ কেন গো? তোমাকে লুঙ্গি পরতে দেখিনি কখনো তো আমরা।'

ধুমড়ো ওদের দেখে অবাক হয়ে গেছল, আমাকে জিজ্ঞেস করল—'ওরা কারা?'

আমাকে তখন বলতে হল যে, 'তোমার মামা নয় এ, নতুন লোক, ঠিকেয় কাজ করে, তোমার মামার মতন দেখতে তাই তোমাদের ভুল হচ্ছে। এক চেহারার দুজন লোক কি দেখা যায় না? এর নাম হোলো গে ধুমড়ো, শুদ্ধ ভাষায় বলতে গেলে ধুম্রলোচন।'

'তাহলে তো ভারী গোল বাধবে মা', বলল টুম্‌পা—'মামা যখন আমাদের বাড়ি আসবে, তখন দুজনের মধ্যে কে যে মামা ঠাউরে উঠতে পারব না আমরা।'

'দাঁড়া, আমি শুধরে দিচ্ছি এখুনি। তোর মামা তো গল্প লেখে, একে আমি কবি বানিয়ে দিচ্ছি এখন। ধুমড়ো, তুমি চট করে দাড়ি বানিয়ে ফ্যালো তো? দাঁড়িয়ে দেখছ কি, দাড়ি বানাও।'

'জানিস', জবাকে আমি বলি—'আমাদের দেহাতী ভাষায় দাড়ি বানানোর মানে দাড়ি কামানো। ওতো নাপিত নয় যে দাড়ি বানাতে পারবে। তাছাড়া, টুম্‌পা টিকলুর কি দাড়ি

হয়েছে যে বানাবে, দাড়ি কামিয়ে দেবে তাদের।' ভাষা সমস্যার পরেও আরো প্রশ্ন থেকে যায় আবার—'তাছাড়া, দাড়ি হলেই কি কবি হয় নাকি রে? কবিতা লিখতে হবে না?'

'কবিতা কে দেখছে দাদা? আর দেখলেই কি কবিতা বোঝা যায়, কবিতা পড়ে কি কবিতা বুঝতে পারে কেউ? কবিতা নয়, দাড়িতেই কবির পরিচয়, হনুমানের যেমন ল্যাজে...যাকগে, বলতেই, ধূমড়ো চাপ চাপ দাড়ি বানিয়ে বসল। আমার ছেলে মেয়েরা ত অবাক। টিকলু ওর কাছে গিয়ে দাড়িটা টেনে টেনে দেখল—'না, নকল নয় ত, একেবারে আসল দাড়ি রে দিদি! টানলে খুলছে না।' ধূমড়োও বলল—'অমন করে টেনো না দাদা! লাগছে আমার।' কান্ড দেখে সবাই ওরা অবাক।

'হবার কথাই।' আমি বললাম—'কমা নয়, সেমিকোলন নয়, একেবারে দাড়ি।'

তারপর টুম্পা বলল, 'খেতে দাও মা, খিদে পেয়েছে ভারী।' জলখাবার তো করা হয়নি, বললাম আমি, তোরা যে এমন হুট করে আসবি আমি জানব কি করে? তখন ধূমড়ো বলে উঠল, কী খাবে বলো না দিদি, আমি এনে দিচ্ছি এক্ষুণি। 'পারবে আনতে?' টুম্পা বলে, 'বেশ, তাহলে নিয়ে এসো, কেক চকোলেট, প্যাটিজ পটাটো চীপ ; স্যান্ড্ উইচ্, কলিটির আইসক্রীম। টিকলু বলল—আমার চাই, মোগলাই পরোটা, কব্‌রেজী কাটলেট, ভীমনাগের সন্দেশ। চক্ষের নিমেষে সব আনিয়ে দিল ধূমড়ো, হাত বাড়িয়ে আকাশ থেকে যেন পেড়ে আনল ডিশ ডিশ খাবার। খেয়ে দেয়ে তৃপ্ত হয়ে ভাইবোন বলল তখন, তুমি নিশ্চয় ম্যাজিক জানো ধূমড়ো। টাকা ওড়াতে পারো নিশ্চয়? ধূমড়ো বলল, নিশ্চয়। দাও টাকা, উড়িয়ে দিচ্ছি এক্ষুণি। টিকলু বলল—টাকা পাচ্ছি কোথায়? আমার কি টাকা, আছে? আচ্ছা, তুমি আমার এই ফাউণ্টেন পেনটা উড়িয়ে দাও। হাতেও নিতে হল না, টিকলুর পকেট থেকেই কলমটা উধাও হয়ে গেল। বারে! আমি এখন লিখব কী দিয়ে? আমাকে একটা খুব ভালো আর দামী কলম এনে দাও তাহলে! নইলে আজকে আমি আমার হোমটাস্‌ক করব কি করে? অমনি তার জামার যথাস্থানে চমৎকার একটা কলম লটকানো দেখলাম। 'যখন ওড়াতে পারো, তখন তুমি টাকাও আনতে পারো নিশ্চয়।' বলল তাকে টিকলু—'দাও তো আমাকে গোটা পাঁচেক টাকা। সিনেমা দেখে আসি আজ ম্যাটিনি শো-য়ে।' টুম্পাও ছাড়বার পাত্রী নয়—আমার একশ টাকা চাই কিন্তু, পছন্দসই একটা শাড়ি কিনব আমি। ফ্রক পরতে আর ভালো লাগে না আমার। তারপর একশ পাঁচ টাকা হাতে পেয়ে ভাইবোনে দুটিতে হৈ হৈ করতে করতে বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে। আমি তখন ধূমড়োকে বললাম —কর্তার আসার সময় হয়ে এল। তুমি তাঁর জলখাবারটা বানাও দেখি এবার? একটুখানি সুজি করো আজ, কেমন?

তারপর ধূমড়ো দোতালার রান্নাঘরে চলে যেতেই আমি আমার উল নিয়ে বুনতে বসেছি, এমন সময়ে দরজার কলিং বেল বেজে উঠল। কর্তার আগমন আন্দাজ করে আমি দরজা খুলে

দিতে গেলাম। গিয়ে দেখি...যা দেখলাম তাতে তো আমার চক্ষু স্থির! আক্কেল গুড়ুম্! পুলিশের লোক দরজায়। আস্ত একজন ইন্‌স্‌পেক্‌টর দাঁড়িয়ে!

'বলিস কিরে!' পুলিসের কথায় আঁতকে উঠেছি আমিও।

'তখনই বুঝলাম যে ফ্যাসাদ বাধিয়েছে ধূমড়োলোচন। একশ টাকার যে নোটখানা বানিয়ে দিয়েছে ওদের, সেটা ঠিক ঠিক আমাদের কারেন্‌সির নোট হয়নি...তাই এই পুলিশ ইন্‌স্‌পেক্‌টরের আমদানি।'

'আমি জানি দিদি।' আমি তখন বলি—'ঘরে বসে কি টাকা করা যায় না? যায়। চেষ্টা করলে আমিও হয়ত করতে পারি। কিন্তু সেই টাকা বাজারে চালাতে গেলেই মুস্কিল। কি করলো তখন ইন্‌স্‌-পেক্‌টর? ধরে নিয়ে গেল তোদের সবাইকে? ধূমড়োকে শুদ্ধু?'

হাতে হাতে একশ পাঁচ। [পৃঃ ২০৩

'না। সে বললে, আপনারা এক-জন নতুন লোক রেখেছেন আমরা খবর পেলাম। তার নাম ধাম গোত্র ঠিকানা জানতে চাই আমরা। চাকর-বাকর দিয়ে বাড়ি বাড়ি চুরি চামারি হচ্ছে আজকাল, তাই আমাদের তরফ থেকে এই সতর্কতার ব্যবস্থা। ওর টিপ সইটাও চাই, আর ফোটোও তুলে নেব একখানা। তাছাড়া, ওর রেশনকার্ডটাও পরীক্ষা করা দরকার। ডাকুন একবার লোকটাকে।'

তখন আমি হাঁফ ছেড়ে বললাম, —আপনি এই সোফাটায় বসুন। ডাকছি। বলে হাঁক পাড়লাম আমি—'ধূমড়ো, নেমে এস! সব কাজ ফেলে সোজা—চটপট এক্ষুণি।' বলতেই সে ছাত গলে চক্ষের পলকে নেমে এল। তার ঐ আবির্ভাবে কেমন হকচকিয়ে গেলেন ইন্‌স্‌পেক্‌টর। চোখ

হাসির ফোয়ারা

মুছে নিয়ে ভদ্রলোক ধুমড়োকে শুধোলেন।—তোমার নাম কি হে? 'ধুমড়ো, ধুমড়োলোচন।' 'অদ্ভুত নাম ত! দেশ কোথায়?' 'জাহান্নাম।' বাব্‌বা। জায়গাটা তো আরো জব্বর। তোমার রেশনকার্ডটা দেখাও দেখি।' 'এখানে আমার কিছু নেই। সব আমার মুল্লুকে আছে। আপনাকে জাহান্নামে গিয়ে দেখতে হবে।' ইন্‌স্‌পেক্‌টর বললেন—সেখানে গিয়ে দেখবার আমার দরকার নেই। এখানে চটপট একটা রেশনকার্ড করিয়ে নিয়ো, বুঝলে? ওবেলা থানার থেকে ফোটোগ্রাফার এসে তোমার ফোটো তুলবে। চেহারাটা তোমার কেমন চেনাচেনা ঠেকছে আমার, কেন জানি না। বলে বিদায় নিলেন ইনস্‌পেক্‌টর।

তিনি চলে যাবার পর আমি ধুমড়োর দিকে তাকালাম, ওমা! একি! দেখতে দেখতে লোকটা যেন ঝাপ্‌সা হয়ে যাচ্ছে কেমন! ওদিক থেকে পোড়া ঘিয়ের গন্ধ এসে নাকে লাগে। ধরা সুজির গন্ধ।

'ধুমড়ো! প্যানে সুজি চাপিয়ে এসেছিলে বুঝি? সুজিটা ধরে গেছে। ওমা! তুমি এমন করে চোখের উপর উপে যাচ্ছ কেন গো! কী হোলো তোমার?'

'উপচীয়মান ধুমড়োর উদ্দেশে বললি তুই? আমি বলি।—'উপচে উঠে গেল কোথায় সে?'

'আর কী হবে। যা হবার হল। বলতে বলতে ধুমড়ো ভেঙে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে গেল ঃ 'তুমিই করলে তো। হীটারে প্যান বসিয়ে সুজি চাপিয়েছিলাম, তুমি সোজা নেমে আসতে বললে সটাং। আমি সোজাসুজি নেমে এলাম। প্যানটা পুড়ে গিয়ে ওর কলাইকরাটা ঝলসে গেছে সব। এখানকার মেয়াদ আমার ফুরোলো এখন। আমি চললাম।' বলে ধুম্র সত্যিই ধোঁয়া হয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। 'আমি চললাম আমার জাহান্নাম! এ জীবনে আর দেখা হবে না আমাদের।' অন্তরীক্ষ থেকে আওয়াজ পেলাম তার।

ধুমড়োলোচন ততক্ষণে অন্তর্হিত!

রাম ডাক্তারের ব্যায়রাম!

'বউয়ের ভারী অসুখ মশাই! কোন্ ডাক্তারকে ডাকা যায় বলুন তো?' হর্ষবর্ধন এসে শুধোলেন আমায়।

'কেন, আমাদের রাম ডাক্তারকে?' বললাম আমি। তারপর তাঁর ভারী ফীজ-এর কথা ভেবে নিয়ে বলি আবার : 'রাম ডাক্তারকে আনার ব্যয় অনেক, কিন্তু ব্যায়রাম সারাতে তাঁর মতন আর হয় না।'

'বলে বউয়ের আমার প্রাণ নিয়ে টানাটানি, আমি কি এখন টাকার কথা ভাবছি!' তিনি জানান—'বউয়ের আমার আরাম হওয়া নিয়ে কথা!'

'কী হয়েছে তাঁর?' আমি জানতে চাই।

'কী যে হয়েছে তাই তো বোঝা যাচ্ছে না। এই বলছে মাথা ধরেছে, এই বলছে দাঁত কনকন, এই বলছে পেট কামড়াচ্ছে...'

'এসব তো ছেলেপিলের অসুখ, ইস্কুলে যাবার সময় হয়।' আমি বলি—'তবে মেয়েদের পেটের খবর কে রাখে! বলতে পারে কেউ?'

হাসির ফোয়ারা

'বউদির পেটে কিছু হয়নি তো দাদা?' জিজ্ঞেস করে গোবরা। দাদার সাথে সাথেই সে এসেছিল।

'পেটে আবার কী হবে শুনি?' ভায়ের প্রশ্নে দাদা ভ্রূকুঞ্চিত করেন : 'পেটে তো লিভার পিলে হয়ে থাকে। তুই কি লিভার পিলের ব্যামো হয়েছে, তাই বলছিস?'

'আমি ছেলেপিলের কথা বলছিলাম।'

'ছেলেপিলে হওয়াটা কি একটা ব্যামো নাকি আবার?'

হর্ষবর্ধন ভায়ের কথায় আরো বেশি খাপ্পা হন : 'সে হওয়া তো ভাগ্যের কথা রে! তেমন ভাগ্য কি আমার হবে?' বলে তিনি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফ্যালেন।

'হতে পারে মশাই! গোবরা ভায়া ঠিকই আন্দাজ করেছে হয়ত।' আমি ওর সমর্থনে দাঁড়াই : 'পেটে ছেলে হলে শুনেছি অমনটাই নাকি হয়—মাথা ধরে, গা বমি বমি করে, পেট কামড়ায়...ছেলেটাই কামড়ায় কি না কে জানে!'

ছেলের কামড়ের কথায় কথাটা মনে পড়ে গেল আমার...

হর্ষবর্ধনের এক আধুনিকা শ্যালিকা একবার বেড়াতে এসেছিলেন ওঁদের বাড়ি একটা বাচ্চা ছেলেকে কোলে নিয়ে...

ফুটফুটে ছেলেটিকে দেখে কোলে করে' একটু আদর করার জন্যে নিয়েছিলাম, তারপরে তার দাঁত গজিয়েছে কি না দেখবার জন্যে যেই-না ওর মুখের মধ্যে আঙুল দিয়েছি—উফ! লাফিয়ে উঠতে হয়েছে আমায়!

'কী হোলো কী হোলো?' ব্যস্ত হয়ে উঠলেন হর্ষবর্ধনের বউ।

'কিছু হয়নি।' আমি বললাম : 'একটু দন্তস্ফুট হল মাত্র। হাতে হাতে দাঁত দেখিয়েছে ছেলেটা।'

'ছেলের মুখে আঙুল দিলেন যে বড়?' রাগ করলেন হর্ষবর্ধনের শালী : 'আঙুলটা আপনার অ্যান্টিসেপটিক করে নিয়েছিলেন?'

'অ্যান্টিসেপটিক?' কথাটায় আমি অবাক হই। 'সে আবার কি?'

'লেখক নাকি আপনি? হাইজীনের জ্ঞান নেই আপনার?' বলে একখানা টেক্সট বই এনে আমার নাকের সামনে তিনি খাড়া করেন। তার পরে, আমি চোখ দিচ্ছি না দেখে খানিকটা তার তিনি নিজেই আমায় পড়ে শোনান :

'শিশুদের মুখে কোনো খাদ্য দেয়ার আগে সেটা গরম জলে উত্তম রূপে ফুটিয়ে নিতে হবে...'

'আঙুল কি একটা খাদ্য না কি?' বাধা দিয়ে শুধান হর্ষবর্ধনপত্নী।

'একদম অখাদ্য। অন্ততঃ, পরের আঙুল তো বটেই।' গোবরাভায়া মুখ গোমরা করে বলে : 'নিজের আঙুল কেউ কেউ খায় বটে দেখেছি, কিন্তু পরের আঙুল খেতে কখনো কাউকে দেখা যায় নি।'

'আঙুল আমি ফুটিয়ে নিইনি সে কথা ঠিক', আমতা আমতা করে আমার সাফাই গাই : 'তবে আপনার ছেলেই আঙুলটা আমায় ফুটিয়ে নিয়েছে! কিম্বা ফুটিয়ে দিয়েছে...যাই বলুন! এই দেখুন না!'

বলে খোকার দাঁত বসানোর দগদগে দাগ তার মাকে দেখাই। ফুটফুটে বলে কোলে নিয়েছিলাম কিন্তু এতটাই যে ফুটবে তা আমার জানা ছিল না, সত্যি!

'রাম ডাক্তারকে আনবার ব্যবস্থা করুন তাহলে।' বললাম হর্ষবর্ধনবাবুকে : 'কল দিন তাঁকে এক্ষুনি। ডাকান কাউকে পাঠিয়ে।'

'ডাকলে কি তিনি আসবেন?' তাঁর সংশয় দেখা যায়।

'সে কি! কল পেলেই শুনেছি ডাক্তাররা বিকল হয়ে পড়ে—না এসে পারে কখনো? উপযুক্ত ফী দিলে কোন্ ডাক্তার আসে না? কী যে বলেন আপনি!'

'ডেকেছিলাম একবার। এসেও ছিলেন তিনি। কিন্তু জানেন তো আমার হাঁস মুর্গি পোষার বাতিক। বাড়ির পেছনে ফাঁকা জায়গাটায় আমার কাঠ চেরাই কারখানার পাশেই পোলাট্রির মতন একটুখানি করেছি। তা, হাঁসগুলো আমার এমন বেয়াড়া যে বাড়ির সামনেও এসে পড়ে একেক সময়। রাম ডাক্তারকে দেখেই না সেদিন তারা এমন হাঁক ডাক লাগিয়ে দিল যে...'

'ডাক্তারকেই ডাকছিল বুঝি?'

'কে জানে! তাদের আবার ডাক্তার ডাকার দরকার কি মশাই। তারা কি চিকিচ্ছের কি বোঝে? মনে তো হয় না। হয়ত তাঁর বিরাট ব্যাগ দেখেই ভয় খেয়ে ডাকাডাকি করছিল তারা, কিন্তু হাঁসদের সেই ডাক শুনেই না, গেট থেকেই ডাক্তারবাবু বিদায় নিলেন, বাড়ির ভেতরে আসলেন না আর। রেগে টং হয়ে চলে গেলেন একেবারে।'

'বলেন কি আপনি?' শুনে আমি অবাক হই।

'হ্যাঁ মশাই! শুনে আমি অবাক হই।

'হ্যাঁ মশাই! তার পর আরো কতোবার তাঁকে কল দেওয়া হয়েছে—মোটা ফীয়ের লোভ দেখিয়েছি। এ বাড়ির ছায়া মাড়াতেও তিনি নারাজ।'

'আশ্চর্য তো! কিন্তু এ পাড়ায় ভালো ডাক্তার বলতে তো উনিই! রাম ডাক্তার ছাড়া তো কেউ নেই এখানে আর...'

'দেখুন, যদি বুঝিয়ে সুঝিয়ে কোনো রকমে আপনি আনতে পারেন তাঁকে...' হর্ষবর্ধন অনুনয় করেন।

'দেখি চেষ্টাচরিত্র করে', বলে আমি রাম ডাক্তারের উদ্দেশ্যে রওনা হই।

সত্যি, একেকটা ডাক্তার এমন অবুঝ হয়! এই রাম ডাক্তারের কথাই ধরা যাক না!

সেবার পড়ে গিয়ে বিনির একটু ছড়ে যেতেই বাড়িতে এসে দেখবার জন্যে তাঁকে ডাকতে

গেছি, কিন্তু যেই না বলেছি, 'ডাক্তারবাবু! পড়ে গিয়ে ছড়ে গেছে যদি দ্যাখেন এসে একটু দয়া করে...'

'ছড়ে গেছে? রক্ত পড়েছে?'

'তা, একটু রক্তপাত হয়েছে বই কি!'

'সর্বনাশ! এই কলকাতা শহরে পড়ে গিয়ে ছড়ে যাওয়া আর রক্তপাত হওয়া ভারী ভয়ংকর কথা, দেখি তো...'

বলেই তিনি তাঁর ডাক্তারি ব্যাগের ভেতর থেকে থার্মোমিটারটা বার করে আমার মুখের মধ্যে গুঁজে দিলেন...

'এবার শুয়ে পড়ুন তো চট করে।' বলে আমায় একটি কথাও আর কইতে না দিয়ে ঘাড় ধরে শুইয়ে দিলেন তাঁর টেবিলের ওপরে...

'শুয়ে পড়ুন! শুয়ে পড়ুন চট করে। আর একটি কথাও নয়!'

মুখগহ্বরে থার্মোমিটার নিয়ে কথা বলবো তার উপায় কি! প্রতিবাদ করার যো-ই পেলাম না। আর তিনি সেই ফাঁকে পেল্লায় একটা সিরিঞ্জ দিয়ে একখানা ইনজেকসন ঠুকে দিলেন আমায়।

'বাস্! আর কোনো ভয় নেই। অ্যান্টি টিটেনাস ইনজেকসন দিয়ে দিলাম। ধনুষ্টঙ্কারের ভয় রইলো না আর।' বলে আমার মুখের থেকে থার্মোমিটারটা বার করলেন, করে দেখে বললেন—'জ্বরটরও হয়নি তো। নাঃ, ভয় নেই কোনো আর। বেঁচে গেলেন এ যাত্রা।'

মুখ খোলা পেতে তখন আমি বলবার ফুরসত পেলাম—'ডাক্তারবাবু! আমার তো কিছু হয়নি। আমি পড়ে যাইনি, ছড়ে যায়নি আমার। আমার বোন বিনিই পড়ে গিয়ে ছড়ে গেছে। কথাটা আপনি না বুঝেই...'

'ওঃ তাই নাকি? তা বলতে হয় আগে। যাক্, যা হবার হয়ে গেছে। চলুন, তাকেও একটা ইনজেকসন দিয়ে আসি তাহলে। ছড়ে যাবার পর কি ডেটল দেওয়া হয়েছিল? ডেটল কি আইওডিন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তবে তো হয়েইছে। তবু চলুন, ইনজেকসনটা দিয়ে আসি গে। সাবধানের মার নেই, বলে থাকে কথায়।'

বিবেচনা করে বিনির ইনজেকসনের বিনিময়ে তিনি আর কিছু নিলেন না, আমারটার দাম দিতে হোলো অবশ্যি। প্লাস্ কলের দরুন ভিজিট।

সেই অবুঝ রাম ডাক্তারের কাছে যেতে হচ্ছে আমায় আজ। বেশ ভয়ে ভয়েই আমি এগোই...বলতে কি!

বুঝে সুঝে পাড়তে হবে কথাটা, বেশ বুঝিয়ে সুঝিয়ে...যা অবুঝ ডাক্তার, বাবা!

চেম্বারে ঢুকে দূর থেকেই তাঁকে নমস্কার করি।

'ডাক্তারবাবু! আপনাকে কল দিতে এসেছি। কিন্তু আমার নিজের জন্যে নয়। আমার কোনো অসুখ করেনি, কিচ্ছু হয়নি আমার। পড়ে যাই নি, ছড়ে যায় নি। আমাকে ধরে আবার ফুঁড়ে টুঁড়ে দেবেন না যেন সেবারের মতন...'

বলে কথাটা পাড়লাম।

মুখগহ্বরে থার্মোমিটার নিয়ে...উপায় কি? [পৃষ্ঠা ২০৯

শুনেই না তিনি, আমাকে তেড়ে এসে ফুঁড়ে না দিলেও এমন তেড়ে ফুঁড়ে উঠলেন যে বলবার নয়।

'নাঃ, ওদের বাড়ি আমি যাব না। প্রাণ থাকতে নয়, এ জন্মে না। ওরা ভারী অভদ্দর...'

'হর্ষবর্ধনবাবু অভদ্র! এমন কথা বলবেন না। ওঁর শত্রুতেও এমন কথা বলে না।'

'অভদ্র না তো কি? বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়ে অপমান করাটা কি ভদ্রতা না কি?'

'আপনাকে বাড়িতে ডেকে এনে অপমান করেছেন উনি? বিশ্বাস হয় না। আপনি ভুল বুঝেছেন। আপনি যা অ...' বলতে গিয়ে 'অবুঝ' কথাটা আমি চেপে যাই একেবারে।

'উনি নিজে না করলেও ওঁর পোষা হাঁসদের দিয়ে করিয়েছেন। সে একই কথা হল।'

'হাঁসদের দিয়ে অপমান?' আমার বিশ্বাস হয় না।

'হ্যাঁ মশাই! মিথ্যে বলছি আপনাকে? আমাকে দেখেই না তাঁর সেই পাজী হাঁসগুলো এমন গালাগালি শুরু করলো যে কহতব্য নয়!'

'হাঁসেরা গাল দিল আপনাকে? আরে মশাই, হাঁসকেই তো লোকে গালে দেয়। আমার বোন পুতুল এমন চমৎকার ডাক রোস্ট রাঁধে যে কী বলব! গালে দিয়ে হাতে স্বর্গ পাই।'

'সে যাই বলুন! হর্ষবর্ধনবাবুর হাঁসগুলো তেমন উপাদেয় নয়। বিলকুল বিষতুল্য!

আমাকে দেখেই না তারা কোয়াক কোয়াক বলে এমন গাল পাড়তে শুরু করল যে...' **বলতে বলতে রাগে** তিনি রাঙা হয়ে উঠলেন......'কেন, আমি...আমি কি কোয়াক? আমি কি হাতুড়ে **ডাক্তার নাকি?** লোকে বললেই হোলো?'

'ও! এই কথা!' আমি ওঁকে আশ্বাস দিই ঃ 'না মশাই না, হাঁসগুলো আপনার কোনো গুপ্ত কথা ফাঁস করেনি, এমনিই ওরা হাঁসফাঁস করছিল। হর্ষবর্ধনবাবুর ওগুলো বিলিতি হাঁস তো, তাই ওরা ওইরকম ইংরিজী ভাষায় কথা বলে ; ইংরেজীতে কোয়াক বলতে যা বোঝায় তা ঠিক ওর অর্থ নয়, বাঙালী হাঁস হলে ওই কথাটার মানে হয়, মানে, বঙ্গভাষায় ওর অনুবাদ করলে হবে—প্যাঁক প্যাঁক।'

'প্যাঁক প্যাঁক? ঠিক বলছেন? তাহলে আর কোনো কথা নেই। চলুন তবে।'

বলে তিনি রাজী হলেন যেতে। 'দাঁড়ান, আমার ব্যাগটা গুছিয়ে নিই আগে। ...এই ব্যাগ নিয়েই হয়েছে আমার যতো হাঙ্গাম। এটাকে বাগে আনাই দায়! একেক সময় এমন মুশকিলে পড়তে হয় মশাই...।'

'ব্যাগাড়ম্বর বেশি না করে...' আমি বলতে যাই, বাধা দিয়ে তিনি চেঁচিয়ে ওঠেন,—'ব্যাগাড়ম্বর? বৃথা বাগাড়ম্বর করছি আমি?'

'না না, সে কথা বলছি না। বলছিলাম যে—'

'কী বলছিলেন?'

'বলছিলাম, একটু ব্যগ্র হবেন দয়া করে। রোগিণীর অবস্থা ভারী কাহিল।'

'ব্যগ্রই হচ্ছি তো। ব্যাগ না হলে কি করে ব্যগ্র হই? এই ব্যাগের মধ্যেই তো আমার থার্মোমিটার, স্টেথিসকোপ, রক্তচাপ মাপার যন্তর, ওষুধপত্তর যতো কিছু!'

বলে সব কিছু গুছিয়ে নিয়ে সব্যাগ হয়ে তিনি সবেগে আমার সাথে বেরিয়ে পড়লেন...

কিন্তু এক কদম না যেতেই তিনি থমকে দাঁড়ালেন একদম। পথের মধ্যে দাঁড়িয়ে বকতে লাগলেন আমায় ঃ

'নাঃ, আমি যাব না। আমি প্রতিজ্ঞা করেছি যে। আপনার ঐ কোয়াক কোয়াকই হোক আর প্যাঁক প্যাঁকই হোক, ওই হাঁসরা থাকতে ও-বাড়িতে আমি পা দেব না প্রতিজ্ঞা করেছিলাম। আমার শপথ আমি ভাঙতে পারব না। মাপ করবেন আমায়।'

বলে তিনি বেঁকে দাঁড়ালেন।

এবং আর দাঁড়ালেন না। তারপর আর না এঁকে বেঁকে সোজা তিনি এগুলেন নিজের বাড়ির দিকে।

রাম ডাক্তার এমন অবুঝ, সত্যি!

অগত্যা, কী আর করা? সব গিয়ে খোলসা করে বললাম হর্ষবর্ধনকে। বললাম যে, 'বউকে যদি বাঁচাতে চান তো বিদেয় করে দিন হাঁসদের।'

হাসির ফোয়ারা

শুনে হর্ষবর্ধন খানিকক্ষণ গুম হয়ে কী যেন ভাবলেন। তারপর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন।

'কা তব কান্তা কস্তে পুত্র! দারা পুত্র পরিবার তুমি কার কে তোমার!...এ দুনিয়ায় কে কার?...হাঁস কি আমার? হাঁসের কি আমি। হাঁস কি আমার সঙ্গে যাবে? হাঁস নিয়ে কি আমি ধুয়ে খাবো? যাক্ গে হাঁস!...রাখে রাম মারে কে? মারে রাম রাখে কে?......কার হাঁস কে পোষে!' বলতে বলতে তিনি যেন পরমহংসের পরিহাস হয়ে উঠলেন ঃ 'টাকা মাটি মাটি টাকা...যাক গে হাঁস! যেতে দাও! বিস্তর টাকায় কেনা হাঁসগুলো। বহুৎ টাকা মাটি হোলো, এই যা!'

বলে খানিকক্ষণ মাথায় হাত দিয়ে কী যেন ভাবলেন, তারপর ককিয়ে উঠলেন আবার—'নাঃ, বৌকে আমি হাসপাতালে পাঠাতে পারব না। হাঁসগুলোই বরং রসাতলে যাক।'

তারপর গিয়ে তিনি পোলট্রির আগল খুলে দিয়ে খেদিয়ে দিলেন হাঁসদের। পাড়ার ছেলেদের সমবেত উল্লাসের মধ্যে তারা নাচতে নাচতে চলে গেল...

পোলট্রির আগল খুলে খেদিয়ে দিলেন হাঁসদের।

হংস-বিদায়ের খবরটা চেম্বারে গিয়ে জানাতে তার পরে ব্যাগ হস্তে ব্যগ্র হয়ে বেরুলেন আবার রাম ডাক্তার!

এলেন রাম ডাক্তার।

আসতেই হর্ষবর্ধন তাঁর হাতে করকরে দুখানা একশ টাকার নোট ভিজিট গুঁজে দিয়ে তাঁকে নিয়ে গৃহিণীর ঘরে গেলেন। আমরাও গেলাম সাথে সাথে।

'কী কষ্ট হচ্ছে আপনার বলুন তো?' রোগিণীর শয্যাপার্শ্বে দাঁড়িয়ে শুধালেন রাম ডাক্তার।

'মাথা টনটন করছে, দাঁত কনকন করছে, গা শিরশির করছে, তার ওপর পেট কামড়াচ্ছে আমার!' জানালেন গিন্নী।

'বটে?' বলে রাম ডাক্তার মুখ ভার করে কী যেন ভাবলেন খানিক, তারপরে হর্ষবর্ধনকে টেনে নিয়ে বাইরে এলেন।

'কেস খুব কঠিন মনে হচ্ছে আমার।' গম্ভীর মুখ করে বললেন রাম ডাক্তার।

'বউ আমার বাঁচবে তো?' হর্ষবর্ধন আতঙ্কিত হন।

'না না, ভয়ের কোনো কারণ নেই। এক্ষেত্রে তেমন মারাত্মক কিছু ঘটবার আশঙ্কা করিনে। তবে এসব রোগে সাধারণতঃ দশজন রোগীর ন'জনাই মারা যায়। একজন মাত্র বাঁচে কেবল।'

'তাহলে?' হর্ষবর্ধনের আতঙ্ক এবার আরো যেন দশগুণ বেড়ে যায়।

'অ্যাঁ, বলেন কি মশাই? তবে তো বউদির বাঁচনের আর কোনই আশা নাই।' গোবরা কাঁদো কাঁদো হয়ে বলে। বলে কাঁদতে থাকে।

'ইনি বাঁচবেন।' ভরসা দেন ডাক্তারবাবু : 'এর আগে এ রোগে নজন আমার হাতে মারা গেছে। ইনিই দশম। এঁকে মারে কে?...যাক্, আপনারা আমায় রুগীকে দেখতে দিন তো দয়া করে। ভালো করে পরীক্ষা করে দেখি আগে। বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করুন আপনারা। রুগীর ঘরে কেউ এখন আসবেন না যেন।' বলে আমাদের ভাগিয়ে দিয়ে তিনি ভেতরে রইলেন।

আমরা তিনজন পাশের ঘরে এসে বসলাম। হর্ষবর্ধনের মুখ ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। আর গোবরার মুখ শুকিয়ে হল যেন ঠিক নারকোলের ছোবড়ার মত।

'মাথা টনটন, দাঁত কনকন, পেট চনচন—শক্ত অসুখ বইকি!' আমি বলি। আবহাওয়ার গুমোটটা কাটাবার জন্যই একটা কথা বলি আমি মোটের ওপর—সেই গুমোটের ওপর।—'এর একটা হলেই রক্ষে নেই, একসঙ্গে তিনটে।'

'ব্যামোটা বউদির শিরা উপশিরায় ছড়িয়ে পড়েছে দাদা।' গোবরা মন্তব্য করে : 'সারা গা শির শির করছে, বলল না বৌদি?'

'শিরঃপীড়াই হয়েছে তো।' আমিও একটু ডাক্তারি-বিদ্যা ফলাই। 'মাথা টনটন করছে বললেন না?'

রাম ডাক্তার দরজার গোড়ায় দাঁড়ালেন এসে—'উকো দিতে পারেন? নিদেন একটা ছেনি?'

হর্ষবর্ধন একটা উকো এনে দিলেন। ছেনিও।

'উকো দিয়ে কী করবে দাদা? বউদির মাথায় উকুন হয়েছে নাকি?' গোবরা শুধোয় : 'উকো ঘষে ঘষে উকুনগুলো মারবে বোধ হচ্ছে।'

'হতে পারে।' আমার সায় তার কথায়।—'তারাই হয়ত মাথায় কামড়াচ্ছে, সেইজন্যেই এই শিরঃপীড়াটা হয়েচে বোধ হয়।'

হর্ষবর্ধন চুপ করে বসে রইলেন মাথায় হাত দিয়ে।

'কিম্বা দাঁতের জন্যেও লাগতে পারে উকো।' আমার পুনরুক্তি : 'দাঁতে কেরিজ হয়ে থাকলে তাতেও দাঁতের যন্ত্রণা হয়। উকো দিয়ে ঘষেই সেই কেরিজ তুলবেন হয়ত উনি। দাঁত নেহাত ফ্যালনা জিনিস না মশাই! দাঁত ফেলবার পর তবেই দাঁতের মর্যাদা বুঝতে পারে মানুষ।

খারাপ দাঁত থেকে হাজার ব্যাধি আসে। মাথা ব্যথা, পেট ব্যথা, বুকের ব্যামো, হজমের গোলমাল, এমনকি বাতের দোষও আসতে পারে ঐ দাঁতের দোষ থেকে।'

রাম ডাক্তার আবার এসে উঁকি মারলেন দরজায় ঃ

'হাতুড়ি কিম্বা বাটালি জাতীয় কিছু আছে?'

হর্ষবর্ধন হাতুড়ি এনে ডাক্তারের হাতে তুলে দেন।

'হাতুড়ি নিয়ে কী করবে দাদা?' আঁতকে ওঠে গোবরা ঃ 'দাঁতের গোড়ায় ঠুকবে নাকি গো? দাঁতের ব্যথা সারাতে দাঁতগুলোই সব তুলে না ফ্যালে বউদির।'

'কী জানি ভাই!' দীর্ঘনিশ্বাস ফ্যালেন দাদা ঃ 'লোকে রাম ডাক্তারকে কেন যে হাতুড়ে বলে কে জানে!'

'তার মানে তো পাওয়া যাচ্ছে এইখানেই...' গোবরা হাতুড়ির সঙ্গে হাতুড়ের একটা যোগসূত্র স্থাপন করতে চায়।

'দাঁতে না হয়ে মাথাতেও পিটতে পারে হাতুড়ি...' বাধা দিয়ে আমি বলি ঃ 'শক্ ট্রীটমেণ্ট বলে একটা জিনিস আছে না?...'

'দাদার যেমন শখ! আপনার মতন হাতুড়ে লেখকের পরামর্শ শুনে হাতুড়ে ডাক্তার এনে নিজের শখ মেটান উনি এবার।' গোবরা আমার কথার ওপর কথা কয়। 'বউদির মধুর হাসি আর দেখতে হচ্ছে না দাদাকে—এ জন্মে নয়। হায় হায়, এই ফোকলা বউদি ছিল আমার বরাতে—কী করব আর!' সে হায় হায় করতে থাকে।

'মাথায় হাতুড়ি ঠুকলে শিরঃপীড়া সারে বলে শুনেছি।' তবুও আমি বলতে যাই।

'মাথা না থাকলে তো মাথাব্যথাই থাকে না মশাই।' হর্ষবর্ধন বলেন।

'শক ট্রীটমেণ্ট মানে হচ্ছে হঠাৎ একটা ঘা মেরে শক দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে রোগ সারিয়ে দেওয়া। শক্ত রোগ যতো সব তাতেই সেরে যায়।' আমার বক্তব্য রাখি ঃ 'রাম ডাক্তারের কোন কসুর নেই মশাই! যথাশক্তি করছে বেচারা।'

'তা যদি হয় তো আমার বলার কিছু নেইকো।' হাল ছেড়ে দেন হর্ষবর্ধন।

'যথাসাধ্য করতে দিন ডাক্তারকে, বাধা দেবেন না আপনারা।' আমার কথাটির শেষে পুনশ্চ যোগ করি।

'একটা করাত দিতে পারেন আমায়? ছোটখাট হলেও চলবে।' দরজার সামনে আবার রাম ডাক্তারের আবির্ভাব।

হর্ষবর্ধনের কাঠচেরাই করাতী কারখানায় করাতের অভাব ছিল না। এনে দিলেন একখানা।

তারপরে মাথায় হাত দিয়ে বসলেন তিনি—'কী সর্বনাশ হবে কে জানে!'

'বউদির পেট কেটে ছেলেটাকে বার করবে বোধ হচ্ছে।' গোবর্ধন পরিষ্কার করে ঃ 'বউদি

কাটা পড়বে আর ছেলেটা মারা পড়বে ; ডাক্তারের করাতে, আর আমাদের বরাতে এই ছিল, যা বুঝতে পারছি।'

'ছেলেটা যায় যাক্, আমার বউ বাঁচলে বাঁচি!'

বে'চে যাবে আপনার বউ।' আমি তাঁকে ভরসা দিই ঃ 'বড়ো বড়ো জাদুকর দেখেননি, করাত দিয়ে একটা মেয়েকে দু-আধখানা করে কেটে ফ্যালে, তারপর সঙ্গে সঙ্গে জুড়ে দেয় আবার, দ্যাখেননি কি? কেন, আমাদের পি· সি· সরকারের ম্যাজিকেই তো তা দেখা যায়! তেমনি ভেলকি বড় বড় ডাক্তারদেরও। তাঁরাও কেটে জোড়া দিতে পারেন।'

কিন্তু হর্ষবর্ধন আর চুপ করে বসে থাকতে পারেন না, লাফিয়ে ওঠেন হঠাৎ—'আমার চোখের সামনে বউটাকে করাতচেরা করবে আর আমি বসে বসে তাই দেখব! লোকটা পেয়েছে কি?'

বলে তিনি ঝড়ের বেগে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেন। গোবর্ধনও সাথে সাথে যায়। চকরবরতি-আমিও তাঁদের অনুবর্তী হই।

'কী পেয়েছেন আপনি?' ঝাঁঝিয়ে ওঠেন তিনি ডাক্তারকে ঃ 'করাত দিয়ে আমার বউকে কাটবেন যে? কেন? কেন? কেন? যতই কাঠের ব্যবসা করি মশাই, এতটা আকাঠ হইনি এখনো। কেন, কী হয়েছে আমার বউয়ের? যে করাত দিয়ে তার...'

'কিসের বউ!' বাধা দেন রাম ডাক্তার ঃ 'আমি পড়েছি আমার ব্যাগ নিয়ে। বউকে আপনার দেখলাম কোথায়? হতভাগা ব্যাগটা একেক সময় এমন বিগড়ে যায়! হাতুড়ি পিটে, ছেনি দিয়ে, উকো ঘষে কিছুতেই এটাকে খুলতে পারছি না। করাত দিয়ে কাটতে লেগেছি এবার। এর মধ্যেই তো আমার যত যন্তরপাতি, ওষুধপত্র, এমন কি থার্মোমিটারটি পর্যন্ত! আগে এসব বার করলে তবে তো দেখব আপনার বউকে! রাজ্যের রোগ সারাই আমি, কিন্তু নিজের ব্যাগ সারাতে পারি না। এই ব্যাগটাই হয়েছে আমার ব্যায়রাম।'

সত্যপ্রিয়র সত্যপ্রিয়তা

ইস্কুলে বেরুবার মুখেই বড়মামা টুকে দিলেন—‘এই শিবু, ইস্কুল থেকে ফিরে কোথাও বেরুসনি যেন আজ। তোর শুঁড়ওলা বাবা আসবেন আজ বিকেলে—বুঝেছিস?’

বাবা আসছে? শুনেই না আমি লাফিয়ে উঠেছি। আঃ, কতোদিন দেখিনি বাবাকে! বাবার চেহারাই ভালো করে মনে পড়েনা আমার!

প্রায় ছোটবেলার থেকেই আমি মামার বাড়ি দর্জিপাড়ায় মানুষ। পড়াশুনোর জন্যেই কলকাতায় আসা। অবিশ্যি বাবার চিঠিপত্র মাঝে মাঝেই পেয়ে থাকি...‘শুভাশীর্বাদ সন্তু’ বলে শুরু করে ‘আশীর্বাদক ইতি তোমার বাবা’ বলে শেষ করা—আর তার ভেতরে আগাপাশতলা যত না সদুপদেশ।

কিন্তু মামার কথায় খটকা লাগল কেমন। আমার বাবার শুঁড় গজালো আবার কবে? কই, কোনো চিঠিপত্রে ঘুণাক্ষরেও তো জানাননি তা। মাও তো কখনো লেখেননি সেকথা। শুনে আমার ভারী ভাবনা হোলো। বাবার চেহারা খুব খারাপ না, যদ্দূর আমার মনে পড়ে, কিন্তু শুঁড় গজিয়ে থাকলে তা কেমনতর হয়েছে কে জানে। বাবা গণেশের মতই হয়ে থাকবে হয়ত!

ভাবতে ভারী বিচ্ছিরি লাগে আমার।

মামাকে জিগেস করব যে তারও জো পেলাম না। বাড়িতে থাকবি বিকেলে, বেরুসনি যেন। তোর শুঁড়ওলা বাবা আসবে আজ—ব্যস্‌ এই না বলেই হন্তদন্ত হয়ে তিনি ছুটলেন!

হাসির ফোয়ারা

ট্রাম ধরবার, অফিস যাবার তাড়া তখন তাঁর। আমাকেও বই বগলে ইস্কুলে বেরুতে হোলো তারপর।

শুঁড় বেরুলে বাবারা কেমন শোভা পায় কে জানে! ভাবতে ভাবতে ইস্কুলে যাই। খুব ভাবনায় পড়ে গেলাম বলতে কি!

'কোনো কিছুতেই মন নেই যে তোর? কী ভাবছিস রে তুই তখন থেকে অমন?' টিফিনের সময় বিষ্টু সুকুল আমায় শুধাল।

আমার সহপাঠী বিষ্টু ক্লাসে এক বেঞ্চেই বসত আমার পাশে। (আমার 'নিখরচায় জলযোগ' বইটি এই বাল্যবন্ধুর নামেই উৎসর্গ-করা।) 'ভারী ভাবনায় পড়েছি ভাইরে! আমার বাবার একটা শুঁড় বেরিয়েছে নাকি আবার।' বললাম আমি।

'তোর বাবা খুব রাগী লোক বুঝি?'

'দারুণ! একবার যা একখানা চড় মেরেছিলেন আমায়!' আমার স্মৃতিচারণ।

'তাহলে ঐ সুরটা হবে গিয়ে রাগপ্রধান। তাতে ভাবনার কিছু নেই। শুনতে কেবল বিচ্ছিরি, এই যা।'

'দেখতে বিচ্ছিরি না?'

'দেখতে বিচ্ছিরি? না, দেখবার কিছু নেই। শুনতেই বিকট।'

'দেখতে খারাপ না? কী যে বলিস? নাকের থেকে বেরুবে—লম্বা সটাং...?'

'তা বটে! রাগপ্রধান কি আধুনিক সব সুরই নাকের থেকে বেরয়, তা ঠিক। যত হাঁকডাক আর তানানানা—তা নাক দিয়ে বেরুলে তবেই না সুর হবে? আনুনাসিক ব্যাপার তো সব।'

'দাদা গণেশের মতন চেহারা হয়েছে হয়ত বাবার। কী যে দেখব আজ বিকেলে—কে জানে! ভারী ভয় করছে ভাই আমার!'

'আজ বিকেলে?'

'হ্যাঁ, আজ বিকেলেই তো আসছে বাবা। বড়মামা বললে আমায়।'

'ভালই তো রে! বাবার আসা খুব ভালো। খাবার নিয়ে আসে তো। আসুক বাবারা, ভয় খাচ্ছিস কেন?'

'তোর ঐ শুঁড়প্রধান বলে।' আমি জানাই ঃ 'যদি আদর করতে গিয়ে শুঁড় দিয়ে জাপটে ধরে আমায়?'

'সুর দিয়ে জাপটে ধরবে কিরে?' বিষ্টুও যেন ভাবিত হয় খবরটায়—'হ্যাঁ, মা বলে বটে যে সুরের মায়াজাল বিস্তৃত হয়, মানেটা যে কী তার জানিনে ঠিক, তবে সেই জালে জড়াবার কী ধরা পড়বার ভয় নেই যে কোনো তা আমি বলতে পারি!'

হাসির ফোয়ারা

বিষ্টু অভয় দিলে কী হবে, আমি তেমন ভরসা পাইনে, ভাবনায় ভাবনায় ইস্কুল থেকে ফিরি।

হাতীদেরও শুঁড় হয়। তাদের নাক থেকে বেরয়, নাকটাই শুঁড় হয়ে বেরয় নাকি। হাতীদের হাতও বলা যায় সেটাকে। হাতের কাজ, হাতাবার কাজ যা কিছু ঐ শুঁড় দিয়েই তারা সারে। বাবাও আবার যদি শুঁড় নেড়ে ভাবতেই আমার গা শিউরে ওঠে! দূরে দূরে থাকতে হবে বাবার থেকে। খুব সাবধান!

ইস্কুল থেকে ফিরে বাইরের ঘরে বসে রয়েছি ঠায়—বাবার আসার অপেক্ষায়। কখন তিনি শুঁড় নাড়তে নাড়তে আসেন।

খানিক বাদে একজন হৃষ্টপুষ্ট মানুষ দরজা ঠেলে বাড়ির মধ্যে এলেন। শুঁড় দুলিয়ে নয় মোটেই। এসেই শুধালেন—'বাড়ি আছে নকুড় চন্দ্র?'

'না, নকুড় মামা এখনো ফেরেন নি আপিস থেকে।'

'কখন ফিরবেন?'

'তা, ফিরতে সেই সন্ধ্যে হবে।'

'তুমি? তুমিই বুঝি...?'

'হ্যাঁ, আমি শিবু। শিব্রাম...আর আপনি আপনিই বুঝি আমার...' বলতে গিয়ে আমার কেমন বাধ বাধ ঠেকে। উনি যে আমার কে তা বেশ বোঝা যায়, কিন্তু বোঝানো যায় না কিছুতেই। নিজের বোঝাটা নামাতে পারি না সামনে।

কি করে বলা যায় কথাটা? চেনাই যাচ্ছে না বাবাকে। খুব ছোটবেলায় কবে দেখেছিলাম কিন্তু যেমনটি দেখে এসেছি তেমনটি নয় যেন। বেশ মুটিয়েছেন এর মধ্যে। তবে চেহারাটা হাতীমার্কা হলেও হাতীর মতন শুঁড় গজায়নি এই যা। শুঁড়টা যে গজিয়েছিল সেটা তাহলে গেল কোথায়? জিগেস করার আমার সাহস হয় না।

শুঁড়টা কি করে সারলো জানি না, তবে বাবাকে যদ্দুর আমার মনে পড়ে, তার থেকে ঢের বদলে গেছেন এখন।

'আমি তোমার কে হই জানো?'

'জানি। আপনি আমার শুঁড়ওয়ালা বাবা।'

'অ্যাঁ? কী বললে? শুঁড়ওয়ালা কী?'

'বাবা। বড় মামা বলেছে আমায় আজ। তোর শুঁড়ওলা বাবা আসবে আজ বিকেলে, সকালেই বললো তো।'

'এই কথা বলল নকুড়?'

'হ্যাঁ। তা তোমার শুঁড়টা গেল কোথায় বাবা? সারিয়ে ফেলেছ বুঝি এর ভেতর? অপারেশন টপারেশন করে বোধ হয়?...তা বেশ ভালোই করেছ।'

'শুঁড়?'

'হ্যাঁ, শুঁড়ের কথাই বলল তো মামা। শুনে যা ভয় করছিল আমার...'

'আমার শুঁড় আছে এই কথা বলেছে নকুড়? বটে? আমি আর তোমাকে এখানে রাখব না, ধানবাদে নিয়ে যাব, আমার কাছে থেকে লেখাপড়া শিখবে...'

'ধানবাদে আমাদের বাড়ি নাকি?' আমি জানতে চাই।

'হ্যাঁ। সেখানেই আমরা থাকি এখন। এখানে নকুড়ের কাছে তোমার উপযুক্ত শিক্ষা হচ্ছে না। ভুল শিক্ষা পাচ্ছো। লেখাপড়ার বারোটা বেজে গেছে তোমার, বুঝতে পারছি বেশ।'

'কেন, এখানে তো ইস্কুলে যাচ্ছি আমি। রোজই যাইতো।'

'ইস্কুলে গেলেই কি শিক্ষা হয় নাকি? মানুষ হবার শিক্ষা পেতে হলে প্রথমেই সত্যবাদিতা শিখতে হয়। সদা সত্য কথা কহিবে—।'

'পড়েছি বইয়ে।...না বলিয়া কদাপি পরের দ্রব্য লইও না।'

'বইয়ে পড়লেই হবে? জীবনে আচরণ করতে হবে না? কাজে কর্মে কথায় আচরণে সত্যনিষ্ঠ হতে হবে তো? কিন্তু নকুড়ের মতন অপদার্থ লোকের কাছে থাকলে সেশিক্ষা তুমি পাবে না। না, তোমাকে আমি এখানে রাখব না আর। ধানবাদ নিয়ে যাব। আসুক নকুড়।'

'জানি আপনি আমার শুঁড়ওয়ালা বাবা!' [পৃষ্ঠা ২:

'আপনি হাত মুখ ধুয়ে ভেতরে বসুন ততক্ষণ। আমি মামার অফিসে ফোন করে আপনার আসার খবরটা দিইগে। সামনের ডাক্তারখানায় ফোন আছে।'

বাবাকে বসিয়ে আমি ফোন করতে বেরুলাম বাইরে। বেরিয়েই মামাকে আসতে দেখলাম অদূরে।

হাসির ফোয়ারা

ছুটলাম মামার কাছে—'মামা মামা!'

'কিরে! কী হয়েছে? তোর শুঁড়ওলা......?'

'এসে গেছেন। খোঁজ করছেন তোমার।'

'তাড়াতাড়ি তাই চলে এলাম অফিস থেকে। তা, তোদের ভাব জমে গেছে বেশ...এর মধ্যেই?'

'দারুণ।'

'তোর শুঁড়ওলা বাবা আবার যুধিষ্ঠির মার্কা, তা জানিস তো?'

'যুধিষ্ঠির-মার্কা? না না, ভীম-মার্কা বলতে পারো বরং। যা চেহারা বাগিয়েছেন একখানা।'

'সেটা চেহারার দিক দিয়ে। ঐ ভীম ভবানী। কিন্তু কথায় কাজে দারুণ যুধিষ্ঠির।'

'যুধিষ্ঠির?'

'হ্যাঁ। সত্যবাদী যুধিষ্ঠির। ভয়ংকর সত্যবাদী।'

'হ্যাঁ, সেইরকম কী যেন সব বলছিলেন আমায়। বলছিলেন যে সদা সত্যকথা কহিবে—'

'না বলিয়া পরের দ্রব্য লইও না। এই সব তো?'

'প্রায়।'

'তোর শুঁড়ওলা বাবার নাম জানিস তো?'

'বারে, বাবার নাম কেউ ভুলে যায় নাকি কখনো? খুব মার খেলে হয়ত বা—'

'সত্যপ্রিয় সামন্ত।' আমার কথায় বাধা দিয়ে তিনি জানান।

'না না, কক্ষনো না। আমার বাবার ও নাম নয়কো। আমার মনে আছে বেশ—হতেই পারে না ওনাম—তুমি কি বলছো যে বাবা চেহারার সঙ্গে নিজের নামটাও তিনি পালটে ফেলেছেন?'

'শুঁড়ওয়ালা বাবা বললাম না?'

'তারপর ঐ সামন্ত? আমরা চকরবরতি হলে আমাদের বাবারা কি সামন্ত হতে পারে? হয় না কি কখনো? কক্ষণো হয় না।'

'মাস্তুতো বাবা যে রে।'

'ও বাবা! তাই নাকি?' শুনে আমি অবাক হই—'সে আবার কী মামা? মাস্তুত বাবা, পিস্তুত বাবা, খুড়তুত বাবা, মামাত বাবা এসব হয় নাকি ফের? কত রকমের বাবা আছে আবার?'

'গুরুমশাই, ঠাকুরমশাই, শ্বশুরঠাকুর—এঁদেরও তো বাবা বলা যায়। অন্নদাতা ভয়ত্রাতা যস্য কন্যা বিবাহিতা—শাস্তরে এঁদেরকেও বাবা বলতে বলেছে। তবে আসল বাবা ঐ একটাই, এঁরা সবাই হোলোগে পিতৃতুল্য, মানে কিনা, বাবার মতই।'

এমন সময় আমার শুঁড়ওয়ালা বাবা মামার গলার সাড়া পেয়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছেন—

'কী সব ভুল শিক্ষা দিচ্ছ শিবুকে? আমি ওকে এখানে রাখব না আর। ধানবাদে নিয়ে

যাব। এখানে ওর ঠিকমতন শিক্ষাদীক্ষা হচ্ছে না। এখানে তোমার কাছে থাকলে ও মানুষ হতে পারবে না। বড়দাকেও আমি জানিয়ে দেব সেই কথা।'

'কী ভুল শেখালুম আবার শিবুকে?'

'তুমি বলেছো আমি নাকি ওর শুঁড়ওয়ালা বাবা?' গর্জে ওঠেন আমার পিতৃদেব সত্যপ্রিয় সামন্ত—'আমি কি ওর বাবা? তাছাড়া আমার শুঁড় কই? দেখাও তো!'

'ভায়া, নীতিশিক্ষা তোমার হয়ত অনেক হয়ে থাকবে, কিন্তু আসলে বর্ণপরিচয়ের গোড়াকার বিদ্যেটাই ভুলে বসে আছো। 'ব'-য়ে শুঁড় দিলে কী হয়? বলো দেখি? 'ক' হয় না? হয় কি—হয় না? তা হলেই হল। তুমি ওর বাবার মাস্তুত ভাই না? বাবা না হলেও কাকা তো বটেই? আর, কাকা মানেই তো শুঁড়ওলা...'

উক্ত বাবা খানিকক্ষণ বর্ণ-পরিচয়ের রহস্যটা মালুম পাবার চেষ্টা করেন। আমিও করি, তবে ঠিক থই পাই না। কবে শিখেছি অ আ ক খ—অ্যাদ্দিন পরে তা কি আর মনে থাকার কথা? বাবাকে এজন্য আমি কোনো দোষ দিতে পারি না, আমাকেও নয়।

''ব'য়ে শুঁড় দিলে 'ক' হয়—' বাবা আমার গজরান তথাপি—'আর ব-য়ের পিঠে পুঁটুলি বেঁধে দিলে 'ম' হয়? এসব কী? একি শিক্ষা নাকি? আমি যদি ওর শুঁড়ওয়ালা বাবা হই তাহলে তুমিও ওর একটা বাবা। পিঠে পুঁটুলি বাঁধা বাবা—পিঠ-কুঁজো বাবা।'

'তা যা বলো!' বলে হাসতে থাকেন আমার মামা।

'না, হাসি নয়, যেখানে এমন মিথ্যাচরণ, এহেন অমৃত-ভাষণ, সেখানে একদণ্ডও আর নয়। জলগ্রহণ না। একঘণ্টা পরেই ধানবাদের ফিরতি গাড়ি, সেই ট্রেনেই ফিরব আমি। শিবুকেও নিয়ে চললাম...।'

বলে এক হ্যাঁচকায় আমায় হস্তগত করে জোরে জোরে পা ফেলে সোজা তিনি ইস্টিশনের দিকে পাড়ি দিলেন।

'আমার বইটই সব পড়ে রইল যে?' বলতে গেলাম আমি।

'থাকগে, কোনো দরকার নেই নেবার। ধানবাদে নতুন ইস্কুল, নতুন বই, নতুন জামা-কাপড়। নতুন ধারার পড়া—তার সব ব্যবস্থা আমি করব। এখানকার কোনো অশুচি জিনিস তোমাকে সঙ্গে নিতে দেব না।'

বলে হিড়হিড় করে তিনি আমায় টেনে নিয়ে চললেন। মামা দাঁড়িয়ে রইলেন থ হয়ে। আর আমি এক হাফপ্যাণ্ট-শার্টে তাঁর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটতে লাগলাম।

কিন্তু ঝড়ের গতিতে হাওড়ায় গিয়েও ট্রেন ধরা গেল না। ধানবাদের গাড়ি ততক্ষণে হাওয়া! পরের ট্রেন সেই রাত বারোটায়। স্টেশনের রেস্তরাঁয় কিছু খেয়ে টেয়ে আমরা ওয়েটিংরুমে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

বেঞ্চিতে গা এলিয়ে আমি আজকের ঘটনাগুলো ভাবছিলাম। সারা পথ মামা আমায় নানা

উপদেশ দিতে দিতে এসেছেন—'দ্যাখো শিবু, এখানে তোমার যথোচিত শিক্ষা হয়নি। যথার্থ শিক্ষার দরকার তোমার। এখন থেকেই সেটা শুরু হোক। এখান থেকেই।'

আমি কান খাড়া করে শুনতে লাগলাম তাঁর টানা লেকচার।

'দ্যাখো শিবু! আজ আমি তোমাকে শুধু তিনটি মাত্র উপদেশ দেব। যদি মানুষ হতে চাও তাহলে আমার এই উপদেশ তিনটি তোমার মূলমন্ত্র হবে আর জীবনে সর্বদা মেনে চলবে। প্রথম হচ্ছে, সত্যনিষ্ঠ হবে, সত্যের খাতিরে যে ত্যাগ, যে কষ্ট, যে লাঞ্ছনাই স্বীকার করতে হোক না, অম্লানবদনে সহ্য করবে, পিছিয়ে আসবে না তার থেকে। দ্বিতীয় উপদেশ এই, সব সময়ে নিয়মানুবর্তী হবে। নিয়ম না মানলে শৃঙ্খলা থাকে না, তাতে করে সামাজিক ব্যবস্থায় গোলযোগ ঘটে। তোমার এই বাল্যকালে মন দিয়ে বিদ্যার্জন করাটাই নিয়ম, এই নিয়ম না মানলে; লেখাপড়া না শিখলে তার ফলেও তোমার এই বাল্যজীবনেই নানান গোলোযোগ এসে জুটবে।'

'জোটেও তো।' আমি সায় দিই—'পরীক্ষার খাতাতেই গোল গোল বসিয়ে দেয় মাস্টাররা...' আমার ছাত্রজীবনের শূন্যপুরাণ ব্যক্ত করি।

'আমার তৃতীয় উপদেশ হচ্ছে এই...'

তৃতীয় উপদেশ কানে এলেও তার মানে আমার মাথায় ঢুকছিল না। কথাগুলো আমার মগজে সেঁধয়নি। খানিক আগে একটা ছেলে পাশ দিয়ে যাবার সময়ে, অকারণপুলকে, আমার মাথায় চাঁটি মেরে গেছল, নিয়মনিষ্ঠা প্রচারের মাঝখানে তারই প্রতিশোধ নেবার ফিকির আমি খুঁজছিলাম। তৃতীয় উপদেশের সূত্রপাতেই, যেই না, পথচলতি সে আবার আমার পাশে এসে পড়েছে, অমনি আমি তাকে এইসা এক ল্যাং মেরে ধরাশায়ী করে দিয়েছি।

আমার ধারণায় এর দ্বারা আমি নিয়মমাফিক কাজই করেছিলাম। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে কেউ চাঁটিয়ে গেলে তক্ষুণি তাকে ল্যাং মেরে লম্বা করে ফেলে লংফেলো করে ছেড়ে দেওয়াটাই দস্তুর। ঢিল খেয়ে পাটকেল মারার মতই ঠিক কাজ। কিন্তু সত্যপ্রিয় বাবু উলটো বুঝলেন— 'দ্যাখো, এইমাত্র তুমি পথে চলার কানুনভঙ্গ করলে!'

'ও যে আমাকে চাঁটি মারল আগে?'

'আমি তা দেখেছি, কিন্তু ওকে ক্ষমা করাই তোমার উচিত ছিল না কি? ক্ষমা হি পরমো ধর্ম। আমার তৃতীয় উপদেশে এতক্ষণ ধরে কী বোঝালাম আমি তোমায়? আবার বলছি, মন দিয়ে শোনো। তৃতীয় উপদেশ হচ্ছে, কখনো কাউকে আঘাত করবে না। হিংসা করিয়ো না। কেউ যদি তোমার বাঁ গালে চড় মারে তাকে তোমার ডান গাল ফিরিয়ে দাও...'

'আবার আমায় ধরে চড়াবার জন্য?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে তো সে আমায় চড়িয়ে চড়িয়ে একেবারে চর্চড়ি বানিয়ে দেবে!'

আমার কথার কোন জবাব দেননি উনি। শুনে কেমন গুম হয়ে গেছেন কেবল। বুঝেছেন

হাসির ফোয়ারা

যে আমার বোধোদয়ের বিস্তর বাকী আছে এখনো। অনেকদিন ধরে অনেক শিক্ষা পেতে হবে আমার। তবে যদি আমি কখনো মানুষ হই।

এগারোটা বাজতেই তিনি উঠলেন—'চলো, টিকিটটা কেটে ফেলিগে। বারোটায় ট্রেন, তাহলেও এখনই কাজটা সেরে ফেলা যাক। তোমার কী টিকিট কিনব? হাফ না ফুল? একটু মুশকিল আছে দেখছি!'

'আমি তো হাফ টিকিটে যাই।'

'বারো বছর পুরে গেলে পুরো ভাড়া দিতে হয়। আজ তোমার ঠিক বারো বছর পূর্ণ হবে। তুমি জন্মেছ তের শ' দশ সালের সাতাশে অঘ্রাণ সকালে সূর্যোদয়ের সঙ্গে। আর কয়েক-ঘণ্টা পর কাল সকালে সূর্য ওঠার সময় তোমার বারো বছর দাঁড়াবে। এখনো তার ছ ঘণ্টা ছত্রিশ মিনিট কয়েক সেকেন্ড বাকী আছে। তারপর থেকেই তোমার ফুল টিকিটের বয়স হবে।'

'তা কেন? আমাদের পাড়ার হাবলা দেখতে বেঁটে, কিন্তু বয়স তার সতের বছর। সে এখনো হাফ টিকিটে যায়, কই তাকে ধরে না তো কখনো?'

'ধরাধরির কথা নয়। এতক্ষণ ধরে কী বোঝালুম তোমায় তাহলে? সর্বদা সত্যনিষ্ঠ হবে—বাক্যে, চিন্তায়, ব্যবহারে। কাজেই এখনো তোমার বারো বছর পূর্ণ হয়নি, ফুল টিকিট কেনা যেতে পারে না এখন। কিন্তু গাড়িতে যেতে যেতে পূর্ণ হবে, সেইটাই ভাবনার কথা। আচ্ছা তখনকার কথা তখন দেখা যাবে।'

একটা ফুল টিকিট ধানবাদের, আরেকটা হাফটিকিট —ছ ঘণ্টা ছত্রিশ মিনিটের!

টিকিট বিক্রি কাউণ্টারে গিয়ে তিনি বললেন, দুখানা টিকিট দিতে হবে। একটা ফুল টিকিট ধানবাদের, আরেকটা হাফটিকিট—ছ ঘণ্টা ছত্রিশ মিনিটের!

'ছ ঘণ্টা ছত্রিশ মিনিটের টিকিট? সে আবার কী?' অবাক হল বুকিং ক্লার্ক। 'কোন স্টেশন মশাই?'
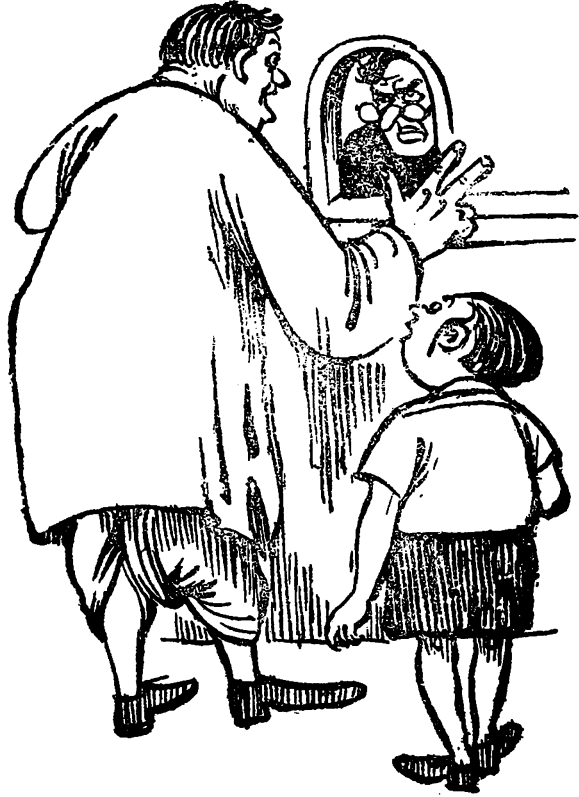
'জানি না। ছ ঘণ্টা ছত্রিশ মিনিট কয়েক সেকেণ্ডের মাথায় যে স্টেশন পড়বে তারই টিকিট চাইছি আমি।'

টাইমটেবল ঘেঁটে ভদ্রলোক সেই রকমের আধখানা আর ধানবাদের একখানা টিকিট কেটে দিলেন।

টিকিট আর, আমায় নিয়ে উনি ট্রেনে চেপে বসলেন তারপর।

হাওড়া ছাড়িয়ে ছুটতে লাগল ট্রেন। সত্যপ্রিয় কিন্তু শুলেন না, ঘুমোলেন না, একদৃষ্টে হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে—বসে রইলেন ঠায়।

আমি জানালার ফাঁকে, লাইনের ধার দিয়ে গাছপালার ছুটোছুটি আর ট্রেনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চাঁদের দৌড় দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়েছি কখন!

ঘুম ভাঙলো পরদিন ঠিক ভোর বেলায়, সবে আকাশ ফরসা হতে শুরু করেছে। উনি কিন্তু তখনো চোখ বোজেননি, একদৃষ্টে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে।

কী হোলো হঠাৎ! সূর্য উঠলো, আর অমনি উনি তাঁর বিপুল দেহ নিয়ে উঠলেন—গাড়ির বিপদসংকেতের শেকল ধরে ঝুলে পড়লেন তারপর।

ফল হোলো ঠিক মন্ত্রের মতই—ঝড়ের বেগে যে গাড়ি ছুটছিল, দুধারের দিগন্তপ্রসারী মাঠের মধ্যিখানে থেমে গেল তা অকস্মাৎ। ট্রেনের গার্ড এসে জিজ্ঞেস করলেন—কে শেকল টেনেছে?

'আমি।' সত্যপ্রিয় বুঝিয়ে বললেন গার্ডকে—'দেখুন, এই ছেলেটির বয়স বারো বছর এইমাত্র পূর্ণ হোলো। এরপর তো একে হাফ টিকিটে নিয়ে যাওয়া যায় না। কোনো স্টেশনে গাড়িটা থামলেই ভালো হতো, কিন্তু মাঠের মাঝখানে যে বয়স পূর্ণ হবে তা কি করে জানব বলুন? অসত্যকে প্রশ্রয় দিতে আমি অক্ষম, তাছাড়া রেল কোম্পানীকে আমি ঠকাতে চাইনে। ওর হাফ টিকিট আছে, এখানকার পর্যন্ত। অতএব এখান থেকে ধানবাদ অব্দি ওর একটা ফুল টিকিট দিন কিংবা পুরো ভাড়াটা নিয়ে একটা রসিদ কেটে দিন আমায়।'

'এই জন্য আপনি গাড়ি থামিয়েছেন? আচ্ছা. পরের স্টেশনে দেখা যাবে।'

'তা দেখতে পারেন, আপনার ভাড়াটা কিন্তু এখান থেকেই ধরতে হবে, পরের স্টেশন থেকে নিলে চলবে না।'

পরের স্টেশনে গাড়ি থামতেই গার্ড রেলের পুলিস নিয়ে এসে সত্যপ্রিয়কে বললেন যে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়ছে।

তিনি আকাশ থেকে পড়লেন—'কেন পুলিস কেন? গ্রেফতার কিসের জন্যে?'

'দেখচেন না, অকারণে শেকল টানলে পঞ্চাশ টাকা জরিমানা। ওর তলাতেই স্পষ্টাক্ষরে লেখা রয়েছে। দেখেন নি?'

'অকারণে টানিনি তো।'

হাসির ফোয়ারা

'সেকথা আদালতে বলবেন।'

সত্যপ্রিয় কিছুতেই গাড়ি থেকে নামবেন না, সত্যের মর্যাদা রক্ষার জন্য যা করা দরকার, যা প্রত্যেক সত্যনিষ্ঠ সাধুপুরুষই করবে, করে থাকে, তিনি শুধু তাই করেছেন। তিনি তো কোনো নিয়মলঙ্ঘন করেননি, কারণ—গুরুতর কারণ ছিল বলেই অ্যালার্ম-চেন টেনেছেন। কাজেই তিনি গ্রেফতার হতে নারাজ, বেশ ওজস্বিনী ভাষায় স্পষ্টই সেটা জানিয়ে দিলেন সবাইকে।

তিনি নামতে রাজী নন, অথচ তিনি না নামলে ট্রেন ছাড়তে পারে না। অনর্থক ডিটেন হতে হবে ভেবে আমাদের সহযাত্রীরা সব গার্ডের সাহায্যে এগিয়ে এল। মাঠের মাঝখানে গাড়ি থামানোর জন্য তখন থেকেই তারা দারুণ বিরক্ত হয়ে রয়েছে। সবাই মিলে তাঁকে জোর করে ধরে নামাতে গেল। তিনিও নামবেন না, তারাও নাছোড়বান্দা। টানাটানিতে তাঁর সিল্কের অমন দামী পাঞ্জাবীটা ছিঁড়ে ফর্দাফাই! সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মেজাজও গেল রুখে। ধাঁ করে তিনি একজনের মুখে একটা ঘুষি মেরে বসলেন। আর যায় কোথায়? সকলে মিলে তখন চাঁদা করে

সকলে মিলে তাঁকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে স্টেশনে একটি ছোট গুদামঘরে ফেলে দিয়ে এল। [পৃঃ ২২৬

চাঁটাতে শুরু করে দিল তাঁকে। আগাপাশতলার যেখানে পেল কিল চড় ঘুষি লাথি চালাতে লাগল। তিনিও এলোপাতাড়ি পিটতে কসুর করলেন না।

কদাচ কাহাকেও আঘাত করিও না—জীবনের এই মূলমন্ত্র তিনি ভুলে গেলেন তখন। তবে

হাসির ফোয়ারা

বাঁ গালে মার খাবার পর ডান গাল তিনি বাড়িয়ে দিচ্ছিলেন বটে, কিন্তু সেটা অনিচ্ছাসত্ত্বে—নিতান্ত বাধ্য হয়েই বলতে হয়। কেননা, আক্রমণ থেকে এক গাল বাঁচাতে গিয়ে অন্য গাল বিপন্ন হচ্ছিল। অসুবিধা এই যে দুটো গাল যুগপৎ ফেরানো যায় না। আর, মারের দিকে এক গাল খেলে অন্য গালটা আপনার থেকেই কেমন ঘুরে যায়!

সত্যপ্রিয় কী করবেন? খানিকক্ষণ খণ্ডযুদ্ধের পর আমি দেখলাম যে একা তিনি সাতজনকে মারবার চেষ্টা করে কাউকেই বিশেষ মারতে পারেন নি কিন্তু সাতজনের মার কাত হয়ে তাঁকে হজম করতে হয়েছে। সকলে মিলে তাঁকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে স্টেশনের একটি ছোট গুদাম ঘরে ফেলে দিয়ে এল—সেখানে তিনি পড়ে রইলেন পয়েন্টস্‌ম্যানের হেফাজতে—যতক্ষণ না সেই থানার থেকে পুলিস এসে তাঁর চার্জ নেয়।

আমাকেও পড়ে থাকতে হোলো তাঁর সঙ্গে সেইখানে।

তারপর ট্রেন ছাড়ল। স্টেশন জুড়ে ব্যস্ত উত্তেজনা, বিরাট শোরগোল, সব সেই গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে চলে গেল। মিলিয়ে গেল নিঃশেষে।

ছোট্ট স্টেশনটা সত্যপ্রিয়র মতই নির্জীব ও নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে রইল। সত্যপ্রিয় ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে লাগলেন কেবল। একটানা চললো তাঁর ঘোঁৎকার!

তাঁকে আর চেনাই যায় না তখন। সমস্ত মুখখানা ফুলে ঢোল হয়ে মস্ত হয়েছে, চোখ দুটো ছোট হয়ে গেছে, ফুটবলের মতন মুখে ফুটকির মত তাদের খুঁজে পাওয়াই দায়। হ্যাঁ, এতক্ষণে হাতীর মাথার সঙ্গে তাঁর তুলনা করা যায় বটে। নাকটা ঝুলে গেছে এমন যে...

শীগ্‌গিরই হয়ত শুঁড়ও বেরুতে পারে এমন সম্ভাবনা আছে বলে আমার সন্দেহ হতে থাকে।

হর্ষবর্ধনের ওপর টেক্কা

হর্ষবর্ধনদের বাড়ি চেতলায়। বাড়ির পেছনের ফাঁকা জায়গাটা ঘিরে করাত দিয়ে কাঠ চেরার এক কারখানা তিনি বানিয়েছেন। তাঁর আপিসঘর বাড়ির একতলায়।

একদিন আপিসে বসে আছেন, হিসাব দেখছেন কারবারের। এমন সময়ে একটা লোক তাঁর দরবারে এসে দাঁড়ালো। নিজের এক দরবার নিয়ে।

বলল, 'বাবু, আপনার বাড়ির সামনের অতবড় রোয়াকটা তো একদম ফাঁকা পড়ে থাকে, ওখানে আমায় মেঠায়ের দোকান খুলতে দেননা একটা!'

'কিসের মেঠাই?' হর্ষবর্ধন শুধোন।

'এই সন্দেশ, দরবেশ, রসগোল্লা, জিলিপি, পান্তুয়া, বোঁদে, খাজা, গজা, মিহিদানা, মতিচুর, দই, রাবড়ি......' বলে যায় লোকটা।

হর্ষবর্ধন হাঁ করে শোনেন। শুনতে শুনতে তাঁর হাঁ যেন আরো বড় হয়ে ওঠে।—'সন্দেশ... দরবেশ...? সন্দেশের দর যে বেশ তা আমার জানা আছে ভালোই।' তিনি বলেন।

'আবারখাবো, দেদারখাবো...হরেক রকমের মেঠাই বানাবো আমরা।' জানায় লোকটা।

'আবারখাবো আমরা দেদার খেয়েছি।' ঘাড় নাড়েন হর্ষবর্ধন : 'ভীম নাগের দোকানে।'

'আবার খাবেন এখানে। আবারখাবোর পরে আরো আছে—দেদারখাবো, আমাদের নিজেদের বানানো। আনকোরা পেটেণ্ট।' লোকটি প্রকাশ করে : 'দেদার খেতে হবে—এমনি খাসা মেঠাই মশাই!'

হাসির ফোয়ারা

'বাঃ বাঃ! সে তো খুব ভালো কথা।' বলে হর্ষবর্ধনের খটকা লাগে—'প্রত্যেক খাবারই তো পেটেন্ট। পেটে দেবার জন্যেই তো সব। তাহলে?'

হর্ষবর্ধনের উৎসাহ দেখে উৎসাহিত হয়ে লোকটি বলে : 'পেটেন্ট মানে পেটে না দিয়ে রক্ষে নেই। তা বাবু, দোকানঘরের জন্যে আমরা কোনো সেলামি টেলামি দিতে পারব না কিন্তু। এধারে দোকানঘরের দরুন বড্ডো সেলামি চায়—পাঁচ দশ হাজার টাকা! অত টাকা আমরা কোথায় পাবো বাবু? তাই আপনার দুয়ারেই এলাম। সেলামি দেব না, তবে ভাড়া দেব যা ন্যায্য হয়। আর সেলামির বদলি আপনাকে সন্দেশ খাওয়াবো রোজ রোজ—তার কোন দাম লাগবে না আপনার।'

'তোমাকে কোন ভাড়াও দিতে হবে না তাহলে।' হর্ষবর্ধন মঞ্জুর করেন : 'আমার রোয়াক তো ফাঁকাই পড়ে আছে অমনি। তোমার কাজে যদি লেগে যায় তো মন্দ কি!'

'কাঠের তক্তা দিয়ে ঘিরে ঘরের মতন করে দোকান বানিয়ে নেব আমরা নিজের খর্চায়। আর সেই দোকান ঘরে আমি আর আমার ছেলে মাথা গুঁজে পড়ে থাকব। আমি আর ছোটকু, দুজন তো লোক মোট আমরা।'

'আমার বাড়ির পিছনে কাঠের কারখানায় তুমি তক্তাও পাবে—যত চাও। এনতার নাও আর বানাও তোমার দোকান। তক্তারও কোন দাম দিতে হবে না তোমাকে।'

বাস্, বসে গেল মেঠাইয়ের দোকান। হর্ষবর্ধনের আপিস ঘর সন্দেশের গন্ধে ভরভর করতে লাগল। আর তিনি সেই গন্ধে মাত হয়ে কেদারায় কাত হয়ে আবারখাবো দেদার খেতে লাগলেন। দেদারখাবোও খেলেন আবার—আবার।

অসন্তোষ প্রকাশ করল গোবর্ধন।—'দাদা, তুমি এসব কী বাধালে বল দেখি?'

'কেন, কী বাধালাম?' শুধালেন দাদা।

'এই রোয়াক জোড়া মেঠায়ের কারবার! পেছনে তো কাঠের কারখানা বাধিয়েছই। এবার সামনেও একটা কান্ড বাধালে। কান্ড কারখানা কোনটারই তুমি বাকী রাখলে না আর।'

'কান্ড না বলে প্রকান্ড বল। কতো বড়ো বড়ো সন্দেশ বানায়, দেখেছিস? এক একটার দাম নাকি আট আট আনা।'

'রোয়াকে বসে পাড়ার ছেলেদের ড্যাংগুলি খেলা দেখতাম তাতেও তুমি বাগড়া দিলে।' ফোঁসফোঁস করে গোবরা।

'আপসোস করিসনে। ডান্ডাগুলি চোখে দেখার চেয়ে সন্দেশগুলি চেখে দেখা ঢের ভালোরে। যত খুসি খা না সন্দেশ—পয়সা লাগবে না তোর। আমাদের জন্যে বড়ো করে স্পেশাল সাইজের বানায় আবার।'

'খাবো কেন অমনি? খেতে যাব কেন? আমাদের কি কিনে খাবার পয়সা নেই নাকি? আমরা কি গরিব? পরের মিষ্টি খাবো কেন অমনি অমনি?'

'মিষ্টি তো পরের থেকেই খেতে হয় রে বোকা! যে মিষ্টিই বল না, পরের পেলে, পরের

খেলে মিষ্টি লাগে আরো—যদি তা অমনি মেলে আবার। দেখিস না খেয়ে তুই একদিন! তা যদি না হবে তো বড়লোকরা নেমন্তন্ন বাড়ি গিয়ে গণ্ডেপিণ্ডে গিলে আসে কেন বল্ তো? বাড়িতে কি খেতে পারনা নাকি!'

'অমনি অমনি পরের মিষ্টি! দাদা, তুমি এই চেতলায় এসে ভারী হীনচেতা হয়ে পড়েছ দেখছি।'

'অমনি কিসের! ভাড়ার বদলি তো!' দাদা জানান ঃ 'ওইটুকুন রোয়াক-এর ভাড়া হত নাকি মাসে তিনশ টাকা আর সেলামি অন্ততঃ তিন হাজার—লোকটাই বলেছে আমায়। তার বদলেই দিচ্ছে তো! ওই যে ভারা ভারা সন্দেশ দেয়, আসলে তা হচ্ছে ওর সন্দেশের ভাড়া!'

এমন সময় দোকানদার প্রকাণ্ড এক রেকাবভরতি সন্দেশ এনে দুজনের সামনে রাখল—'আমার একটা আর্জি ছিল কর্তা!'

হর্ষবর্ধন একটা সন্দেশ মুখে পুরে দিয়ে কান খাড়া করলেন—'শুনি তোমার আর্জি।'

'আমার ভাইঝির বিয়েয়—দিন দুয়ের জন্যে দেশে যেতে হবে। কাছে-পিঠেই—এই হাওড়াতেই বিয়ে। বেশী দূর না। আমার ছেলে আর আমি দুজনাই যাব—এই সময়টা আমার দোকানটা দেখাশোনার ভার কার ওপর দিয়ে যাই তারই একটা পরামর্শ নেবার ছিল আপনার কাছে।'

এক রেকাবভরতি সন্দেশ এনে দুজনের সামনে রাখল।

'কেবল চেখে দেখার ভার হলে নিতে পারতুম আমরা।' হর্ষবর্ধন বলেন—'কিন্তু—কিন্তু—' একটু কিন্তু কিন্তু হয়েই থামতে হল তাঁকে।

'সেই ভারই তো নিতে বলছি আপনাদের। চেখে দেখার ভার। চাখবেন বই কি, হরদমই চাখবেন। যখন খুসি তখন। সেই সঙ্গে দোকানটায় বসে একটু চোখে দেখতেও হবে, চোখ রাখতেও হবে তার ওপর।'

'চোখ রাখতে হবে! কার ওপর? মেঠাই মণ্ডার ওপরেই তো?' গোবর্ধনের প্রশ্ন।

হর্ষবর্ধন বলেন, 'সে আর এমন শক্ত কি! মেঠাই মণ্ডা সামনে থাকলে নজর কি আর অন্যদিকে যায় কারো ভাই?'

'আজ্ঞে নজর রাখতে হবে পাড়ার ছোঁড়াদের ওপরেই।' জানায় দোকানী : 'তারা বড় সহজ পাত্র নয় মশাই!'

'তা আপনার ছেলেকেই দোকানে বসিয়ে রেখে যান না। বিয়ে বাড়িতে গিয়ে সে আর করবেটা কি! ছেলেদের ওপর ছেলেরাই ভালো নজর রাখতে পারে।' গোবর্ধন বাতলায়।

'ছোটকা থাকবে দোকানে? তাহলেই হয়েছে! এই দুদিনেই আমার দোকান ফাঁক হয়ে যাবে নির্ঘাৎ! সেই জন্যেই তো আরো ওকে এখানে না রেখে সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছি। ওর যা এক এক জন বন্ধু আছে মশাই, দেখতেন যদি! ঘোৎকা, হোৎকা, কোৎকা—কী সব নাম। কিন্তু এক একটি চীজ! ভারী ইতর তারা। ও তাদের লুকিয়ে লুকিয়ে সন্দেশ খাওয়ায় রোজ।'

ছোটকা বাবার পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছিল সব, প্রতিবাদ করতে যায়, কিন্তু বাধা পায় হর্ষবর্ধনের কথায়—

'তা ইতর লোকদের জন্যেই তো মেঠাই মণ্ডা মশাই! শাস্ত্রে তো বলেই দিয়েছে মিষ্টান্নমিতরে জনা। অর্থাৎ কিনা, মিষ্টান্নম্...ইতরে—'

ছেলেটি বলে ওঠে : 'মোটেই তারা ইতর নয় বাবু! তারা আমার বন্ধু সব। শোনো বাবা, বাবুর মুখেই শোনো—তোমার শাস্তরে কী বলছে—শোনো ওঁর মুখে। মিষ্টান্ন—মিতরে—জনা! মানে কিনা, তোমার মিতদের জন্যেই যত মিষ্টি। তাদের তুমি মিষ্টি খাওয়াও। মিতা মানেই মিত্র। আর, মিত্র আর বন্ধু এক কথা—তাই নয় কি বাবু?'

গোবরা সায় দেয়—'ঠিক কথা। যাকে বলে মিতা, তাকেই বলে মিত্র, তাকেই বলে বন্ধু, ইংরেজিতে আবার তাকেই বলে ফেরেণ্ডো!'

'ওর ফেরেণ্ডোদের ঠ্যালাতেই আমায় ভেরেণ্ডা ভাজতে হবে—মেঠাইয়ের দোকান তুলে দিতে হবে। হয়তো পাট তুলতেও হবে না, আপনিই উঠে যাবে দোকান। ছোটকাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে ওর ঘাড় ভেঙে বজ্জাতগুলো রোজ রোজ যা রসগোল্লা পান্তুয়া সাবাড় করে যায়—কী বলব বাবু!'

'তা বেশ তো! দুদিনের জন্যই যাচ্ছেন তো!' গোবর্ধনের বুঝি সহানুভূতি জাগে—'এই দুদিন না হয় আমিই দেখব আপনার দোকান! এমন আর কি শক্ত কাজ! রসগোল্লার দাম দু আনা,

সন্দেশের দাম ঐ, পান্তুয়ার দামও ঐ! নগদ দাম নিয়ে বেচতে হবে—এই তো ব্যাপার! তা এ আর এমন শক্ত কি!'

'সেই সঙ্গে আবার একটু নজরও রাখতে হবে যে।' মনে করিয়ে দেয় মেঠাইওলা।

'ঐ তিনজনের ওপরেই তো! কী বললেন—হোঁৎকা, ঘোঁৎকা আর কোঁৎকা—তাই না? অবিশ্যি, আমি চিনি না তাদের কাউকে, তবে নামেই বেশ মালুম হচ্ছে। হোঁৎকা চেহারার কেউ এলে তাকে আর ঘেঁষতে দেব না দোকানে—সেইটাই হোঁৎকা হবে নিশ্চয়। আর ঘোঁৎকা নিশ্চয় ঘোঁৎঘোঁৎ করতে করতে আসবে—নইলে ওর নাম ওরকমটা হল কেন? ওর আওয়াজেই টের পেয়ে যাবো। আর কোঁৎকা যদি আমার ত্রিসীমানায় আসে—আমাকে ঠকানোর চেষ্টা করে যদি—এইসা এক কোঁৎকা লাগাব ওকে যে নিজের নাম ভুলে যাবে বাছাধন!'

'বাস! তাহলেই হবে!' হাসিখুশির প্রচ্ছদ হয়ে উঠল দোকানদার—'কাল দুপুরের গাড়িতে যাচ্ছি আমরা। আপনি দুপুর থেকেই বসবেন তাহলে। কাল আর পরশুটা কেবল। তার পর দিন ভোরেই আমরা ফিরে আসছি।'

'—কিন্তু,—কিন্তু—' এবার গোবরা একটু কিন্তু কিন্তু করে—'দেখুন, মেঠাই খেতে জানি, বেচতেও পারি হয়তো, কিন্তু বানাতে জানি না যে মোটেই। সেটার কী হবে?'

'দুদিনের মতন সন্দেশ রসগোল্লা আর পান্তুয়া বানিয়ে রেখে গেলাম। এক কড়াই পান্তুয়া, এক হাঁড়ি রসগোল্লা আর এক খোরা সন্দেশ...'

'বেশ! বেশ! তাহলেই হল। আমার কাজ তো এই দুদিন চোখে দেখা কেবল! তা আমি পারবো খুব। তবে আমার চেখে দেখাটা তেমন হবে না হয়তো। দাদার মতন আমার তেমন হজমশক্তি নেইতো বাপু!'

'তাহলে দয়া করে আপনিই বসবেন বাবু!' অনুনয় করল দোকানদার—হয়তো বা হর্ষবর্ধনের প্রতি একটু কটাক্ষ করেই।

পরদিন দুপুরে দোকানে বসেছে গোবর্ধন। খদ্দেরের তেমন ভিড় থাকে না দুপুর বেলাটায়—বেচাকেনার হাঙ্গাম কম। মাঝেমাঝে অবশ্যি দু একজন আসছিল বটে, একটা জিলিপি কি একটু বোঁদে কিনতে দু চার পয়সার—কিন্তু দু আনার নীচেয় কোনো খাবার তৈরি নেই জেনে ফিরে যাচ্ছিল আবার।

খানিক বাদে একটা ছেলে এসে দাঁড়ালো দোকানের সামনে। গোবর্ধনকে সেখানে বসে থাকতে দেখে ছেলেটি যেন একটু থতমত খেয়েছে বলে মনে হল গোবরার। —'কী চাই হে তোমার?' তাকে জিজ্ঞেস করেছে সে।

'পান্তুয়া খেতে এলাম।' সে জানাল।

'পান্তুয়া খেতে এলে! তার মানে?'

হাসির ফোয়ারা

'পান্তুয়া খাই যে। রোজই খাই তো।' ছেলেটি বলে।

'রোজই খাও? বটে? তোমার নাম কি হোঁৎকা নাকি গো?'

'কেন, হোঁৎকা হতে যাব কেন? পান্তুয়া খেলে কি কেউ হোঁৎকা হয় নাকি?' ছেলেটি যেন একটু অবাক হয়।

'না, তা কেন হবে! এমনি শুধোচ্ছিলাম।' জানায় গোবরা।

'হোঁৎকা!' ছেলেটির তবুও যেন আপত্তির কারণ যায় না।—'হোঁৎকাপনাটা কোথায় দেখলেন আমার শুনি?'

'তা বটে। ফড়িংয়ের মতই টিঙটিঙে—হোঁৎকা তোমাকে বলা যায় না বটে! তবে কি তুমি কোঁৎকা?'

'রামো! কোঁৎকা আমার চৌদ্দ পুরুষের কেউ নয়।'

'তবে তোমার নামটি কি জানতে পারি একবার?'

'আমার নাম মশা। বুঝলেন মশাই?'

'মশা! অদ্ভুত নাম তো।' গোবর্ধন অবাক হয়—'এ রকম তো কখনো শুনিনি ভাই! তা, এমন নাম হবার কারণ?'

'শুনেছি আমি নাকি ছোটবেলায় মশার মতন পিনপিন করে কাঁদতাম তাই আমার এই নাম হয়েছে।'

'তা হতে পারে।' গোবর্ধন ঘাড় নাড়ে ঃ 'তা পান্তুয়া খাবে যে, পয়সা এনেছ সঙ্গে?'

'পয়সা কিসের! আমি তো অমনি খাই! রোজ রোজই খেয়ে থাকি।'

'না, অমনি খাওয়া চলবে না বাপু! পয়সা দিতে হবে, দাম লাগবে পান্তুয়ার।'

'বারে! মালিকের সঙ্গে ভাব আছে, পয়সা লাগে না আমার। শুধান না দোকানের মালিককে।'

'মালিক নেই—সে হাওড়া গেছে, তার ভাইঝির বিয়েয়।'

'মালিক হাওয়া হয়ে গেছে? কী বললেন, অ্যাঁ?'

'হাওয়া নয়, হাওড়ায় গেছে। ভাইঝির বিয়ে দিতে।'

'বেশ তো, তাঁর বদলি যিনি রয়েছেন, তাঁকেই শুধোন না কেন! একজন তো আছেন তাঁর জায়গায়। আপনি তো দোকানের কর্মচারী—আপনি তার কী জানবেন! আমি এই পান্তুয়া খেতে বসলাম—যেমন খাই রোজ।' বলে সে পন্তুয়ার কড়াইয়ের কাছে বসে গেল।

'দাদা, ও দাদা!' হাঁক পাড়লো গোবরা—'মশায় পান্তুয়া খাচ্ছে। পান্তুয়া খেয়ে যাচ্ছে।'

'মশায় পান্তুয়া খাচ্ছে! কী যে বলিস তুই।' ভেতরের আপিস ঘর থেকে সাড়া এলো দাদার।

'বসে গেছে পান্তুয়ার কড়ায়।' গোবরা জানায়।

হাসির ফোয়ারা

'বসুক গে! মশা আর কতো খাবে!' দাদা জবাব দিলেন—'রসেই লেপটে যাবে। পান্তুয়ার গায়ে আর হুল বসাতে হবে না।'

'দেখলেন তো, কী বলল নতুন মালিক?' বলে ছেলেটা টপাটপ মুখে পুরতে লাগল—আর দ্বিতীয় কথাটি না বলে।

হাঁ করে দেখতে লাগলো গোবর্ধন। তার চোখের ওপর আধখানা কড়াই ফাঁক হয়ে গেল দেখতে না দেখতে। খেয়ে দেয়ে সে চলে যাবার খানিক বাদে আরেকটি ছেলে এলো সেখানে।

'তুমি আবার কে বট হে?' শুধালো গোবরা : 'হোৎকা কোৎকাদের কেউ নয় তো?'

'আজ্ঞে না। আমি দোকানদারের আপনার লোক। তার মাস্তুতো ছেলে।'

'মাস্তুত ছেলে! তা হয় নাকি আবার? কখনো তো শুনিনি। এমনটা কোনো কালে হয়েছে বলে তো জানিনা।'

'শোনেননি তো দেখুন এখন। মাস্তুত ছেলে, মানে, তার ছেলের মাস্তুত ভাই। বুঝলেন এবার?'

'বুঝেছি। তা নামটি কি তোমার শুনি তো একবার?'

'আজ্ঞে, আমার নাম মাছি। আপনার রসগোল্লা খেতে এসেছি। রোজ রোজ আমি খাই এখানে এসে।'

হাঁক পাড়লো গোবরা—মশায় পান্তুয়া খাচ্ছে। [পৃষ্ঠা ২

এই না বলে রসগোল্লার হাঁড়িটা টেনে নিলে সে।

'দাদা ও দাদা!' আবার হাঁক পাড়লো গোবরা—'এবার মাছি এসে বসেছে তোমার রসগোল্লার হাঁড়িতে।'

আপিস ঘর থেকে এবার রাগত গলা শোনা গেল দাদার—'তুই কি আমাকে কাজ করতে

দিবি না নাকি? ইয়ারকি পেয়েছিস! একটা মাছি তাড়াতে পারছিসনে? তাড়িয়ে দে—তাড়িয়ে দে—সামান্য একটা মাছিকে তাড়াতে কতক্ষণ লাগে?'

'তাড়ানো যাচ্ছে না যে।' গোবরা জানায় ঃ 'মোটেই সামান্য মাছি নয়।'

'তাহলে বসতে দে মাছিকে। বলে আঁস্তাকুড়েতেই বসে, আর রসগোল্লা পেলে বসবে না?'

'বসুক তা হলে! বসাক রসগোল্লা!' বলে গোবরা হাল ছেড়ে দেয়।

আস্ত এক হাঁড়ি রসগোল্লা সাবাড় করে মুখ মুছে উড়ে যায় মাছিটা।

তার খানিক বাদে হাতের কাজ সেরে দাদা এসে হাজির সেখানে। দোকানের হালচাল দেখে তাঁর সারা মুখ আহ্লাদে আটখানা হয়ে উঠল।

'বাঃ, খাসা চালিয়েছিস তো দোকান!' বাহবা দিলেন তিনি গোবরাকে—'আদ্ধেক মাল তো এর মধ্যেই বেচে ফেলেচিস দেখছি।'

'বেচতে আর পারলাম কই। মশা মাছিতেই সাবড়ে দিয়ে গেল সব!'

'কী বললি? মশা মাছিতে সাবাড় করে দিয়ে গেল খাবার? বলছিস কিরে?'

'তবে আর বলছিলাম কি—এতক্ষণ হেঁকে হেঁকে তোমায়? তা তুমি তো কানই দিলে না! গেরাজ্জিই করলে না আমার কথা!'

'উড়ন্ত মাছি? উড়ন্ত মশা?'

'মোটেই উড়ন্ত নয় দাদা! রীতিমতই দুরন্ত। দুরন্ত মশা, দুরন্ত মাছি। দুপেয়ে সব।'

'মশা মাছির পাল্লায় পড়ে একেবারে ল্যাজে গোবরে হয়ে গেছিস দেখছি!' হর্ষবর্ধন বলেন—'এরাই সেই হোঁৎকা কোঁৎকার দল তো বুঝলি? দাঁড়া, এবার আমি বসছি দোকানে। আদ্ধেক খেয়ে গেলেও আদ্ধেক পড়ে আছে এখনো। নগদ দামে এটা বেচতে পারলেও, লাভ না হোক, দোকানীর লোকসানিটা বাঁচবে অন্ততঃ।'

গোবর্ধন উঠে দাঁড়ালো। হর্ষবর্ধন বসলেন পাটিতে।

একটি ছেলে এসে পান্তুয়া চাইল এবার। গোবর্ধন বলল—'ঐ দাদা! আবার একজন এসেছে। ওদের জ্ঞাতগুষ্টিই নিশ্চয়।'

'তুমি কি পিঁপড়ে নাকি হে?' জিজ্ঞাসা করেন দাদা। 'পিঁপড়ে মানে পিপীলিকা।' সাধু ভাষায় কথাটা আরো পরিষ্কার করেন তিনি—'মানে, এখানকার বেশির ভাগ লোকই তো মশক, মক্ষিকা আর পিপীলিকা।'

'বেশির ভাগই লোকই পিপীলিকা?'

'কেন, কথাটা কি ভুল হল? লোকদের ইংরেজীতে কী বলে শুনি? পীপ্‌ল বলে না?'

'গাছকে তো বলে জানি।' ছেলেটি জানায় ঃ 'বলে পিপুলের গাছ।'

'তা, লোকরা মশা মাছি না হোক, এখানকার বালকরা তো বটেই!' হর্ষবর্ধন ব্যাখ্যা করে দেন এবার।

● হর্ষবর্ধনের ওপর টেক্কা

'কিন্তু, আমি পিঁপড়ে হতে যাব কেন শুনি! আমি তো পান্তুয়া কিনতে এসেছি।'

'ও, কিনবে পান্তুয়া! তা বেশ বেশ।' উৎসাহিত হন এবার হর্ষবর্ধন—'কত পান্তুয়া চাই তোমার?'

'সের খানেক।'

'পাঁচ টাকা দাম পড়বে কিন্তু।'

'পড়বে তো কি হয়েছে! দেব দাম!' ছেলেটি বলল ঃ 'পান্তুয়ার সের পাঁচ টাকা করে —তা কে না জানে!'

'যাক্, কেনার বদভ্যেস আছে তাহলে তোমার। ভালো কথা।' একটা বড় ভাঁড় ভরতি সের খানেক পান্তুয়া ওজন করে তার হাতে তুলে দিলেন হর্ষবর্ধন—'এই নাও। দামটা দাও তো এবার।'

'না, এ পান্তুয়া আমি নেব না। কেমন যেন দেখছি পান্তুয়াটা। খুবলানো খাবলানো।' ছেলেটি বিরস মুখে ফিরিয়ে দেয় ভাঁড়।

'হ্যাঁ ভাই, যা বলেছ। একটা মশায় একটু আগে খাবলে গেছে ওগুলো।' গোবর্ধন সায় দেয় তার কথায়।

'মশায় পান্তুয়া খায়? বলছেন কি আপনি?' অবাক হয়ে ছেলেটা তারপর নিজেই সে তার কথার জবাব দেয় ঃ 'তা, খেতেও পারে মশাই! চেতলার মশার অসাধ্য কিছু নেই। শুনেছি একবার তেতলার থেকে একটা লোককে চ্যাংদোলা করে তুলে নিয়ে গেছল হাজার হাজার মশায়। তারপর তার রক্ত শুষে খেয়ে না, ছিবড়েটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে গেছল রাস্তায়। শুনেছি বটে।'

'তুমি তো শুনেছ কেবল। আমি নিজের চোখে দেখলাম।' গোবর্ধন ব্যক্ত করে।

'তাহলে ঐ পান্তুয়া আমার চাইনে। আপনারা আমায় সের খানেক রসগোল্লা দিন ওর বদলে। তার দামটা কত পড়বে?'

'রসগোল্লা পান্তুয়া ঐ একই দাম। ঐ পাঁচ টাকাই। দু আনা করে পিস যখন দুটোরই।'

রসগোল্লার ভাঁড়টা হাতে নিয়ে ছেলেটার মুখ ফের ব্যাজার হল—'রসগোল্লাটা আবার মাছি বসা নয় তো মশাই?'

'ধরেছ ঠিক।' বলল গোবরা।—'মাছি বসাই বটে।'

'আপনারা মাছি বসানো রসগোল্লা দিচ্ছেন আমাকে! মাছিরা যেখানে সেখানে—যতো নোংরা জায়গায় গিয়ে বসে। যতো বীজাণু ফীজাণু নিয়ে আসে। খেলে অসুখ করে। নাঃ, আপনি ওর বদলে পাঁচ টাকার সন্দেশ দিন আমায়। সন্দেশও ঐ দু আনা করেই পিস তো?'

'হ্যাঁ।' বলে ঘাড় নেড়ে হর্ষবর্ধন তাকে খোরার থেকে চুবড়ি ভরে সন্দেশ সাজিয়ে দেন। সন্দেশের চুবড়ি নিয়ে ছেলেটি চলে যেতে উদ্যত হয়।

'ওহে—দামটা দিয়ে গেলে না?' বাধা দেন হর্ষবর্ধন।—'আসল কাজই ভুলে যাচ্ছো যে!'

হাসির ফোয়ারা

'কিসের দাম?' চুবড়ি হাতে ফিরে দাঁড়ালো ছেলেটা।

'সন্দেশের দামটা?'

'সন্দেশের দাম দিতে যাব কেন? সন্দেশ তো আমি রসগোল্লার বদলে নিলাম।'

'বেশ, রসগোল্লার দামটাই দাও তাহলে।'

'রসগোল্লা তো আমি পান্তুয়ার বদলেই নিয়েছি।'

'আহা, পান্তুয়ার দামটাই দাও না গো।'

'পান্তুয়ার দাম দিতে হবে কেন শুনি?' ছেলেটি ভারী বিরক্ত হয় এবার ঃ 'পান্তুয়া আমি নিলাম কখন? ও তো আমি নিই-ই-নি! যা নিলাম না, তার আবার দাম দেব কেন? যা নিইনি, তারও কি দাম দিতে হয় না কি?'

ছেলেটি চলে যায় দেখে হর্ষবর্ধন তাকে ফিরে ডাক দেন আবার—

'ওহে, শোনো শোনো। দাম চাচ্ছিনে, একটা কথা কেবল জানতে চাইছি। একটু আগে যারা মশা মাছির ছদ্মবেশে এসে খেয়ে গেছে তাদের নাম কি হোঁৎকা আর...?'

'আর ঘোঁৎকা। ধরেছেন ঠিক।' ছেলেটি ফিক করে হেসে ফ্যালে।

'আর তোমার নামটা?'

'আজ্ঞে, আমি হচ্ছি কোঁৎকা।' যেতে যেতে চুবড়ির থেকে সন্দেশ খেতে খেতে চলে যায় ছেলেটা। কোঁৎকোঁৎ করে গিলতে গিলতে চলে যায়।

হর্ষবর্ধন হতবাক হয়ে থাকেন!

'গেছে গেছে, তার জন্য আর মন খারাপ কোরো না দাদা।' গোবর্ধন সান্ত্বনা দেয় দাদাকে— 'তোমাকে তো আমার মতন তেমন ল্যাজে গোবরে হতে হয় নি। তাহলেও বলতে হয় দাদা, তোমার এই কোঁৎকাটাই ভারী জব্বর হয়েছে। তাই না দাদা?'

নিজের ল্যাজের গোবরটাই যেন দাদার মুখের ওপর লেপে দেয় গোবরা।

'কোঁৎকা দিয়ে গেল বলছিস কিরে! কোঁৎকার ওপর আরো কোঁৎকা লাগিয়ে গেল আমায়!' হা-হুতাশ করেন দাদা ঃ 'আধ খোরা সন্দেশ নিয়ে গেল ছোঁড়াটা। আমার একবেলার খোরাক!'